অখণ্ড সংহিতা

বা

অষ্টম খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

Title - Akhanda-Samhita,Khanda.8
Author - SRI SRI SWAMI SWARUPANANDA PARAMHANSA DEVA
Language - bengali
Pages - 272
Publication Year - 1945

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

অষ্টম খণ্ড

(প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৩৫২)

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

সম্পাদিত

১০৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and Published, on behalf of
Messrs. Swarupananda Grantha-Sadan Ltd.
Narayanganj,
by Digambar Debnath Akhanda,
Publication Manager of
the above-mentioned company,
at **Silpasram Press,**
4, Fordyce Lane,
Calcutta.

অষ্টম খণ্ডের নিবেদন

এই মহাদুর্দ্দিনেও যে এই পুণ্যময় মহাগ্রন্থের ক্রমে ক্রমে সাতটী খণ্ড প্রকাশিত হইয়া গেল, ইহা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসেই সম্ভবতঃ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। "অখণ্ড-সহিতা" বা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন। এই কারণেই "নিবেদনে" আমাদের অধিক কথা বলিবার নাই। যে কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, দ্বিধা ও আশঙ্কা লইয়া আমরা গ্রন্থ-প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলাম, তাহা আমাদের সম্পূর্ণই অপগত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশ মাত্রই গ্রন্থের লোক-প্রিয়তা অনুধাবন করা গিয়াছিল। পরবর্ত্তী খণ্ড-সমূহে সেই লোক-প্রিয়তা উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা পরমকরুণাময় পরমেশ্বরকেই বারংবার সকৃতজ্ঞ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

তবে একটী বিষয়ে যে আমাদের মনে সঙ্কোচ নাই, তাহা নহে। মহাগ্রন্থ "অখণ্ড-সংহিতা" প্রকাশের জন্যই "স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেড" রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছিল। শুধু প্রকাশই নহে, অংশীদারদের টাকার দ্বারা যে পরিমাণ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারে, তাহাতে অংশীদারদিগকে সহজে অধিকারী করিবার জন্যই এই কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে। কিন্তু আপনাদের গৃহীত তিন শেয়ারের টাকায় আমরা "অখণ্ড-সংহিতা" অষ্টম খণ্ডের পরে আর মুদ্রণ করিতে সমর্থ হইব না। কেননা, কাগজ কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। উপরন্তু সম্প্রতি ছাপা-খরচ সর্ব্বত্র বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ যে ফর্ম্মা ১০৲ টাকাতে ছাপা হইতেছিল, এখন তাহার জন্য ২৪৲ প্রতি ফর্ম্মায় চার্জ্জ দিতে হইতেছে। ন্যূনাধিক সাত শত অংশীদারের সহযোগিতায় এমন কার্য্য সুসম্ভব হইয়াছে, যাহা এই যুদ্ধের বাজারে কোনও গ্রন্থ-প্রকাশকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এজন্য অংশীদাররা আমাদের ধন্যবাদার্হ, কেননা, আমরা কোনও প্রকারে এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ-মাত্রই চাহিতেছিলাম, আর্থিক লভ্য চাহি নাই। কিন্তু যাঁহার অমূল্য উপদেশ-বাণী বাহির করিয়া অংশীদারদিগকে এক এক খানা করিয়া এই মহাগ্রন্থের সুকৌশলে অধিকারী করা হইল, কোম্পানী হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও প্রদান করা হয় নাই। প্রদান করা কোম্পানীর কর্ত্তব্য ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সকল প্রকাশকেরা ইহা করিতে আইনতঃ বাধ্য; ন্যায়ের খাতিরে, ধর্ম্মের খাতিরে, এমনকি লজ্জার অনুরোধেও কোম্পানীর তরফ হইতে ইহা করা কর্ত্তব্য ছিল। কোম্পানীর তরফ হইতে ইহা করার প্রকৃত অর্থ হইতেছে অংশীদারদের প্রদত্ত টাকা হইতে দেওয়া। কিন্তু শ্রীবাবাও তাহা চাহেন নাই, আশ্রমও তাহা নেন নাই, কোম্পানীও তাহা সাধেন নাই। কোম্পানীর সাধিবার ক্ষমতাও নাই। কেন না, প্রুফ-রীডার, কাগজের বিক্রেতা, কেরাণী, দারোয়ানী, দপ্তরী, ছাপাখানা, বাড়ীভাড়ার মালিক প্রভৃতি সকলকেই অত্যধিক টাকা দিতে হইতেছে। এই দিকে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আয়ের উপরে অংশীদারদের লভ্যাংশ দাবী

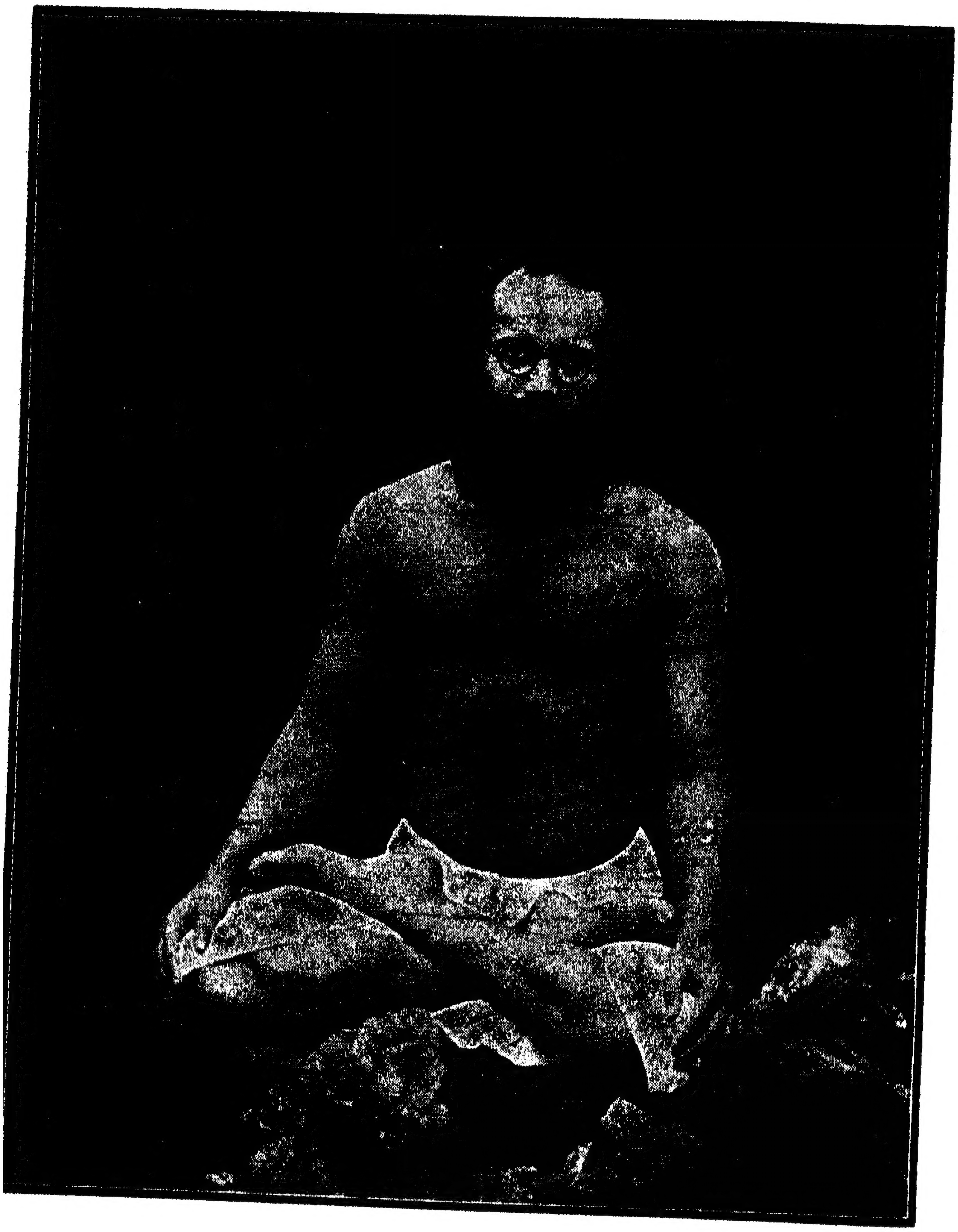
করিবার অধিকারটীও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাজ করিতে হইতেছে। এই কারণে অংশীদারদের প্রদত্ত তিন শেয়ারের টাকা অষ্টমখণ্ড ছাপাইতে ছাপাইতে প্রায় শেষ হইয়া যাইবে ।

অতএব তিন অংশের মালিকেরা যদি আরও তিনটী করিয়া অংশ খরিদ না করেন তাহা হইলে অষ্টম খণ্ডের পরে "অখণ্ড-সংহিতা প্রকাশের সহিত স্বভাবতঃই এই কোম্পানীর কোনও সংশ্রব থাকিবে না। গ্রন্থ-সদনের অংশীদারদের মধ্যে অধিকাংশই বিবেচক, সজ্জন এবং বর্ত্তমান দেশ-কালের অবস্থার সহিত সুপরিচিত। এজন্য আমরা পুনরায় নূতন করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা প্রত্যাশাতীত বলিয়া জ্ঞান করি না। তবে বিবেচনা-শক্তি-বর্জ্জিত অংশীদারও যে কেহ নাই, এমত নহে। কেন না, ইতিমধ্যেই কেহ কেহ জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, ১০৲ টাকা মূল্যের তিনটী শেয়ারের অর্থাৎ মোট ৩০৲ টাকার শেয়ারের বিনিময়েই তাঁহাদিগকে ৬০ খণ্ড পর্য্যন্ত "অখণ্ড-সংহিতা" দিতে হইবে। তাঁহারা কেহই স্মরণ রাখেন না যে, (১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাল বাঁধাই চলে না বলিয়া পাণ্ডুলিপির চারি হইতে ছয় খণ্ডকে একত্র করিয়া হাফ-জিল বাঁধাই দিবার জন্য এক এক খণ্ডে প্রকাশ করা হইয়াছে, সুতরাং ৮ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ৩৮ খণ্ড পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, (২) যে সময় গ্রন্থ-সদন সম্পর্কিত প্রথম বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়, তখন কাগজের এবং ছাপার বাজারদর বর্ত্তমানের মত অসম্ভব চড়া ছিল না, (৩) গ্রন্থ-সদন সম্পর্কিত প্রথম বা দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি বাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের টাকা নিয়া আসেন নাই, একাদিক্রমে দেড় বৎসর কাল বিজ্ঞপ্তির পর বিজ্ঞপ্তি দিয়া প্রায় আড়াই হাজার টাকা বিজ্ঞাপন-ব্যয় করিবার পরে অংশীদার মহোদয়গণের অধিকাংশের মন "অখণ্ড-সংহিতা"র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এভাবে সময় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে ফর্ম্মার দর ১০৲ হইতে বাড়িয়া ২৪৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং তিন শেয়ারের অংশীদাররা যদি প্রত্যেকে আরও তিন শেয়ার করিয়া ক্রয় না করেন, তাহা হইলে নবম খণ্ড হইতে সুরু করিয়া "অখণ্ড-সংহিতা"র পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহের প্রকাশের প্রত্যাশা সঙ্গত হইবে না। কিমধিকমিতি

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম

বিনীত—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

অখণ্ড-সংহিতা—



অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(অষ্টম খণ্ড)

রহিমপুর (ত্রিপুরা)

৬ই আষাঢ়, ১৩৩৯

"প্রভাত-ভবন" হইতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ী শত চারি হস্ত ব্যবধান হইবে। অদ্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব জরাক্লান্তিক দুর্ব্বল শরীরেই ধীরে ধীরে হাটিতে হাটিতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন। কিছুকাল পরে ফিরিয়া আবার প্রভাতভবনে আসিলেন। গ্রামের ভক্ত যুবক রেবতী সাহা, যোগেন্দ্র সাহা ও হোসেনতলার ব্রজেন্দ্র সাহা শ্রীশ্রীবাবার হাত-পা আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রিয়-সংযমের সংজ্ঞা

শ্রীশ্রীবাবা কথায় কথায় উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়গুলিকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া কারো উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়কে প্রাণপণ যত্নে সবল, সতেজ, সক্ষম রাখতে হবে, কিন্তু তারা যাতে কোনও প্রকারে অপব্যবহৃত না হয়, তার দিকে রাখবে খরদৃষ্টি। ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে দোষ নেই, অপব্যবহারেই দোষ।

ইন্দ্রিয়নিচয়কে অপব্যবহার থেকে বিরত রেখে সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত করাই প্রকৃত সংযম।

আত্ম-শাসন

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—মন হচ্ছে সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। আবার মন নিজেকে প্রধাবিত করে প্রবৃত্তি নিচয়ের পৃষ্ঠারোহণ ক'রে। আরোহী ঘোড়ার উপর আরোহণ ক'রেই পথ চলে। কিন্তু অশ্বকে নিজ ইচ্ছার অধীন রাখতে পার্‌লে তবে আরোহীর মঙ্গল। অশ্ব যদি নিজের ইচ্ছায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে আরোহীকে পরিচালিত করে, তা হ'লে যে-কোনও সময়ে আরোহীর বিপদ ঘট্‌তে পারে। ঘোড়া নিজের খোশখেয়ালে চল্লে আরোহী কখনো তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। এই জন্যই মনকে শক্তিশালী ক'রে প্রবৃত্তিগুলিকে তার অধীন ক'রে রাখতে হয়, অধীন ক'রে চালাতে হয়। উন্নত অবস্থার প্রতিই তোমার লালসা থাকা আবশ্যক, লালসার রথে চ'ড়েই তোমাকে আত্মোন্নতির সাধনায় অগ্রসর হ'তে হবে, কিন্তু এ রথ পঙ্কময় গভীর গর্ত্তের দিকে ধাবিত হ'লে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য, সুতরাং এর গতিকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের প্রতি অব্যাহত রাখবার জন্য কঠোর সাধনা চাই। প্রবৃত্তিকে ভয় পাবার প্রয়োজন কি? প্রবৃত্তির বিপথগমনকেই ভয় পেয়ো। প্রবৃত্তি-নিচয়কে সত্য, শিব, সুন্দরের পানে প্রধাবিত কত্তেই প্রাণান্ত যত্ন নিও। এরই নাম আত্মশাসন।

মহাশক্তির উৎস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মশাসনের সুফল চিন্তা কর। প্রবৃত্তির দাসের দুঃখ কত, তা ভেবে দেখ। এভাবে আত্মশাসনের রুচি আসবে। কিন্তু রুচি এলেই হ'ল না, রুচি অনুযায়ী কাজ কর্ব্বার বলও আসা চাই। তার উপায় হচ্ছে ভগবানের নামে নিষ্ঠাযুক্ত হ'য়ে লগ্ন হওয়া। ভগবানের অমৃতমধুর নাম যেন মহাশক্তির খনি। এই খনিতে যে শাবল হাতে নামে, এই খনিতে যে প্রবল বিক্রমে শাবল চালায়, চতুর্দ্দিকের অন্ধকারে অথবা জন-বিরলতায় নিরুৎসাহ না হ'য়ে যে মহাবীর্য্যে পরিশ্রম করে, সে মহাশক্তির ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মহা-

ঐশ্বর্য্যশালী হয়। তার পক্ষে প্রবৃত্তির তাড়নার উপরে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। ভগবানের নামই যে মহাশক্তির উৎস, একথা তোরা নিমেষের জন্যও ভুলিস্ না।

বাল্য সাধনের অভ্যাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নাম সাধনের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই আয়ত্ত হওয়া উচিত। বাল্যের হিতকর অভ্যাস জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কাজ দেয়। এই জন্যই বালকদের আমি অত ভালবাসি, অত স্নেহ করি। আজকের অভ্যাস কাল তাকে বিশেষ সহায়তা কর্ব্বে। বৃদ্ধকালে মানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ, বড় অবিশ্বাসী হয়। সংসারে সহস্রবার সহস্র স্থানে সহস্র ব্যাপারে ঠ'কে ঠ'কে তার মন মঙ্গলকেও অমঙ্গল ব'লে শঙ্কিত হয়। বিশেষতঃ অভ্যাসের দোষে অমৃতও বিষের মতন অরুচিপ্রদ হয়। এই জন্য নাম-সেবার অভ্যাসকে বাল্যকালেই চরিত্র মধ্যে সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নেওয়া আবশ্যক।

প্রতিযোগিতায় সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাল্যের সুখময়ী স্মৃতি মনে পড়ে রে! প্রতিযোগিতা ক'রে নামজপে বড় কল্যাণ, বড় আনন্দ। সমসাধকেরা সব প্রতিযোগিতা ক'রে নাম জপ্‌বি। তুই যদি জপিস পাঁচ-শ'বার, তোর বন্ধু করুক জপ হাজার বার। আবার তাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য তুই পরদিন জপ কর্ পাঁচ হাজার বার। এভাবে প্রতিযোগিতায় সাধন-পথে বড় দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। অবশ্য সংখ্যাটীর উপরে নজর দিলেই হবে না, প্রতিবার জপের সাথে মনের গভীর একাগ্রতা রাখার চেষ্টাও কত্তে হবে।

সৎকার্য্যেই প্রতিযোগিতা সুশোভন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে প্রায় সব কাজেই মানুষকে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা কত্তে দেখা যায়। আমি যদি বিড়ালের বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করি, তুমি করবে বানরের বিয়েতে দশ হাজার খরচ। আমি যদি রায়-সাহেব খেতাব পাবার জন্য দশ হাজার খরচ করি, তুমি কর্‌বে রায়-বাহাদুর খেতাবের জন্য বিশ হাজার খরচ। রাম যদি তার ছেলের বিয়েতে

নিয়ে আসে উমানাথ ঘোষালের যাত্রার দল, শ্যাম তার ছেলের বিয়েতে বায়না ক'রে আস্‌বে কল্‌কাতার মিনার্ভা বা ষ্টার থিয়েটারের। এ রকম প্রতিযোগিতা সমাজের সকল স্তরেই অল্পাধিক দেখা যায়। পাট বিক্রী ক'রে এক মধ্যবিত্ত মুসলমান একখানা বাইচের নৌকা কিন্‌ল ত্রিশ হাত লম্বা, আর অমনি আর একটী মুসলমান তার বাড়ী-ঘর বন্ধক রেখে ঋণ ক'রে এক বাইচের নৌকা কিন্‌ল চল্লিশ হাত লম্বা। এসব নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা অহরহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কৈ? ভাল কাজেই প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। তাতেই নিজের হিত এবং জগতের হিত। একজন যদি সৎকাজে করেন নিজের কটিতটের শেষ বস্ত্রখণ্ড দান, প্রতিযোগিতায় আমার করা উচিত আমার ক্ষুধার্ত্ত জঠরের একমাত্র সম্বল মুখের গ্রাসটি দান। কেউ যদি পরার্থে দিয়ে দেন তাঁর চক্ষু উৎপাটন ক'রে, প্রতিযোগিতায় আমার দিয়ে দেওয়া উচিত হৃৎপিণ্ডটা উৎপাটন ক'রে। ভগবানের কাজে কেউ যদি করেন দেহ দান, প্রতিযোগিতায় আমার করা উচিত দেহ, মন, প্রাণ সব সমর্পণ।

ননীলাল ও মাখনলাল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—আমার বাল্যকালের বন্ধু ননীলাল আর মাখনলাল। সৎসঙ্গের ফলে এবং পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে তাঁদের প্রাণে বাল্যেই নামের হাওয়া লেগেছিল। জিদ্ ক'রে নাম জপ চল্‌ত। আমি যদি জপেছি পাঁচ শত, তাঁরা জপ্‌তেন হাজার। আমি জপেছি হাজার ত' তাঁরা জপতেন দেড় হাজার। আমি জপেছি দেড় হাজার ত' তাঁরা জপতেন দু-হাজার। অবশ্য বালক ত' আমরা! সংখ্যাটীর উপরই দৃষ্টি থাক্‌ত বেশী, ভাবের গভীরতার দিকে নয়। পরে বুঝতে পেরেছি যে, সংখ্যার চেয়ে ভাবের গভীরতার মূল্যও বেশী, মর্য্যাদাও বেশী, মহত্ত্বও বেশী। কিন্তু তখন সংখ্যাই ছিল বেশী লক্ষ্যের জিনিষ। এতে যে গৌণভাবে হিত হয় নি, তা নয়। কুকুরী-সা'র বাগানে জম্বুরা গাছের গোড়ায় শিয়ালের তৈরী ভূগর্ভস্থ গর্ত্তে ছিল জপের প্রধান স্থান, আর বাকীটা হ'ত ঘরের কারে কিম্বা তুলসীমঞ্চের কাছে আমলকী গাছতলায় প্রকাশ্য স্থানে। ননীলাল আজ জাগতিক দেহে নেই, মাখনলাল তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা,

মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়ে সাধু-গৃহস্থের জীবন যাপন কচ্ছেন। এঁদের কথা ভাব্‌তে প্রাণে কত আনন্দ হয়, কত তৃপ্তি হয়।

বীতিহোত্র ও প্রভঞ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অল্প কিছু লেখাপড়া শিখ্‌লেই অনেক লোকের কেমন একটা পণ্ডিতম্মন্য ভাব হয়। যেমন ধর, পল্লীগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে যারা সহরে যায় কলেজে পড়্‌তে, তারা লেখাপড়া শিখুক আর না শিখুক, প্রক্‌সি (proxy) দেওয়াটা শিখেই যখন প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসে, তখন তাদের বিদ্যার গরমে গ্রামের লোক কাছ ঘেঁষ্‌তে পারে না। সাধন-ভজনেরও কতকটা তাই। কিছুদিন জপ-ধ্যান ক'রেই ভিতরে যখন একটু অসাধারণত্ব অনুভব কত্তে লাগ্‌লাম, তখন পাকড়াও কর্ল্লাম দুটি ছেলেকে। একটির নাম তারাপদ, আর একটীর নাম বঙ্কিম। কায়স্থের ছেলে জেনেও তাদের আমি গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে দিলাম। তারাপদের দেশ ছিল বর্দ্ধমান, বঙ্কিমের দেশ ছিল ত্রিপুরা। তারাপদের নাম রাখলাম বীতিহোত্র মানে অগ্নি, আর বঙ্কিমের নাম রাখলাম প্রভঞ্জন মানে বায়ু। ভাবটা ছিল এই যে, অগ্নি আর বায়ু একত্র মিল্‌লে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ ক'রে দিতে পারে। বায়ু দেবে অগ্নির মুখে খাদ্য, আর অগ্নি দেবে বায়ুর হাতে তাপ,—দুইজনের সহযোগে জগতের পাপ ধ্বংস হবে। দু'জনেই জপ-ধ্যানে খুব অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। বীতিহোত্রের ভিতরে যেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লাম। একদিন সে সাইবেরিয়ার পারদের খনির এক দুর্ঘটনার কথা বল্‌ল, আর একদিন সে উত্তর-আসামের সীমান্তে আবর জাতির সম্পর্কে এক খবর বল্‌ল। কিছুকাল পরে সংবাদপত্রে অনুরূপ সংবাদ দেখা গেল। প্রভঞ্জনের হ'তে লাগ্‌ল সাহসের আর সেবা-বুদ্ধির প্রকাশ। শ্মশানে মশানে ভয় নেই, কলেরার রোগীর নাম শুন্‌লে ছুটে গিয়ে তার শুশ্রূষায় রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দিতে কুণ্ঠা নেই। আর তার আদেশানুবর্ত্তিতার কথা কি বল্‌ব, তার কোনো তুলনাই হ'তে পারে না। এ দু'জনের একজনও আজ জড় দেহে নেই, কিন্তু গুরুগিরির তাড়নায়

আমি যে একদিন তাদের সঙ্গ ক'রেছিলাম, এক সাথে ব'সে নিভৃত বাঁশঝাড়ে নামজপ করেছিলাম, সে স্মৃতি কত মধুর, কত প্রিয়।

গুরুগিরির তাড়না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুগিরির তাড়না জিনিষটা বাস্তবিকই বড় ক্ষতিকর। অবশ্য ততক্ষণ তা লাভজনক, যতক্ষণ এর ফলে নিজের ভিতরেও যোগ্যতা সঞ্চয়ের স্পৃহা জন্মে। কিন্তু যখন নিজের ভিতরে যোগ্যতা বর্দ্ধনের চেষ্টা ক'মে গিয়ে গুরুগিরির্ সুযোগ নিয়ে বাহ্যতঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জাহির করার প্রবৃত্তি আসে, তখন এ জিনিষটা অতীব মারাত্মক। আমার ১৩১৯এর কাছাকাছি সময়ের গুরুগিরির তাড়নাটা এই হিসাবে লাভজনক। কিন্তু ১৩২৯এর কাছাকাছি সময়ের গুরুগিরির তাড়নাটা এই হিসাবে ক্ষতিজনক।

ব্রজেন্দ্র সাহা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার ১৩৩৯এর কাছাকাছি সময়ের গুরুগিরির তাড়নাটা?

শ্রীশ্রীবাবাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁ, এখন গুরুগিরিটা আছে বটে, কিন্তু তাড়নাটা টের পাচ্ছি না।

রহিমপুর
৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯

স্ত্রী কি ভয়ের বস্তু?

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গার একটী বিহারী যুবককে ইংরাজিতে একখানা পত্র লিখিলেন—,

"Your confessions have not startled me. Such is the history of thousands of young men of India to-day and I assure you that there are sure means of safety against these evils and rescue from their bad effects. You can once again become a man, a man virile and strong enough both in body and mind to combat successfully against innumerable odds. You can once again stand

erect and claim the world's best presents by steadiness and perseverance. Don't despair, my son, of success, be not despondent. Hang not down your head in utter hopelessness.

"Whatever may you have lost through mistake and unwisdom, the secret of regaining them is PRAYER. Accept a life of PRAYER,—prayer while at work and at rest, and this will raise you to the glorious heights of the worthy man who has nothing to fear on earth. PRAYER will make you the master of yourself.

"Do not fear your wife in the least though she is young and charming. Do not believe her to be your foe. All her youth is to lend you help, all her charms are to give you strength. She is here not to suck your blood, she is neither a source of eternal evil nor a spring of poisonous draughts. Her bosom is not the abode of venomous snakes. Her sweet voice is not the Siren's song nor is she the doors of eternal hell. Conquer fear by earnest prayer, and convert her into your helping hand. Energise her with your own faith and inspire her with your spiritual urge. Falter not in your noble task and believe not yourselves to be weakling."

(বঙ্গানুবাদ)

"তোমার আত্মস্বীকৃতিতে আমি চমকিত হই নাই। আজিকার ভারতে সহস্র সহস্র যুবকের ইহাই ত' ইতিহাস। আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি যে, এই সকল অমঙ্গলের প্রতিষেধ আছে, ইহাদের কুফল হইতে পরিত্রাণের নিশ্চিত

উপায় আছে। পুনরায় তুমি মানুষ হইতে পার, এমন মানুষ হইতে পার, দেহে মনে যে প্রচণ্ড বিঘ্নের সাথে সকল সংগ্রাম পরিচালনের পক্ষে যথেষ্ট বীর্য্যবান ও শক্তিশালী। পুনরায় তুমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পার এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে জগতের শ্রেষ্ঠ উপহারসমূহ দাবী করিতে পার। হতাশ হইও না, হে পুত্র, সাহস হারাইও না। গভীর নিরাশায় মস্তক অবনত করিও না।

"অবিবেচনা ও ভ্রান্তিবশতঃ যাহা কিছু হারাইয়াছ সব কিছু ফিরিয়া পাইবার নিগূঢ় কৌশল হইল প্রার্থনা। ভগবদুপাসনাময় জীবন বরণ কর,—কাজেও উপাসনা, বিশ্রামেও উপাসনা,—এবং ইহাই তোমাকে সেই সার্থক মানবের গৌরবান্বিত মহিমায় উন্নীত করিবে, জগতে যাহার ভয় করিবার কিছু নাই। উপাসনা তোমায় আত্মজয়ী করিবে।

"যদিও সে যুবতী, যদিও সে সুন্দরী, তথাপি তুমি তোমার স্ত্রীকে কণামাত্রও ভয় করিও না। তাহাকে তোমার শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিও না। তার যৌবন তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য, তার সৌন্দর্য্য তোমাকে বল দিবার জন্য। সে তোমার রক্ত শোষণের জন্য আসে নাই। অনন্ত অমঙ্গলের সে আকর নহে, বিষাক্ত পানীয়ের সে উৎস নহে। তার বক্ষ বিষধর সর্পের আবাসভূমি নহে। তার সুমধুর কণ্ঠ মায়াবিনীর সঙ্গীত নহে, অনন্ত নরকের দ্বারও সে নহে। ভয়কে জয় কর গভীর প্রার্থনার বলে, আর, স্ত্রীকে পরিণত কর সহায়িকা রূপে। তোমার নিজের বিশ্বাসের শক্তিতে তাহাকে শক্তিমতী কর, তোমার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তাহাকে অভিভূত কর। সুমহৎ ব্রতে স্খলিত-পদ হইও না, নিজেদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করিও না"

পূর্ণ-ব্রহ্মচর্য্যের পথ

বরিশাল কাষ্ঠপট্টির একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"তোমার দেহ মন তোমার নহে, পরমেশ্বরের,—এইরূপ ভাবনা নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা স্বভাবে মজ্জাগত করিবার চেষ্টা কর। ইহার মধ্য দিয়াই তোমার জন্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা আসিবে। একবিন্দু হতাশাকেও অন্তরে ঠাঁই দিওনা।"

দেশ ও জগতের সার্ব্বাঙ্গিক অভ্যুন্নতি

ফরিদপুর-কণেশ্বর নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভারতের অভ্যুন্নত ভবিষ্যতে বিশ্বাসী হও। সেই অভ্যুদয় দেশ ও জাতির প্রত্যেকটী স্তরে সঞ্চারিত হইবে। কোনও একটী স্তর-বিশেষের বিপুল শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াই সেই অভ্যুদয় স্বকীয় গতিবেগ সম্বরণ করিয়া লইবে না। উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, ছাত্র-অভিভাবক, ধনি-নির্ধন, শ্রমজীবি-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে সেই অভ্যুদয় নিজেকে প্রসারিত করিবে। এই কারণেই কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উন্নতি-সাধনের চেষ্টার মধ্যে দীর্ঘকাল তুমি নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে পার না। একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টার ভিত্তিমূলে মহাশক্তির জাগরণ আবশ্যকীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে হইতে হইবে অপরের অবিরোধিনী কল্যাণশক্তি, ভেদবিরোধ-সাধিকা আত্মকলহবিলসিতা মদমত্ততা নহে। ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সম্প্রদায় যেখানে আসিয়া সমস্বার্থ ও সমকল্যাণ, সেইখানে তুমি হাতুড়ীর আঘাত দাও, সেইখানে তুমি তোমার সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত কর, সেইখানে তুমি আত্মোৎসর্গ করিয়া সকলের জন্য সমভাবে নিজেকে বণ্টন করিয়া দাও। গণ্ডী না থাকিলে বিশাল জগৎও থাকিত না, সীমাকে লইয়াই অসীমের লীলা, তাই গণ্ডী পরিত্যাগের অসম্ভব উপদেশ দিব না, কিন্তু গণ্ডীকে নির্গণ্ডিক করিয়া সীমাকে অসীম করিয়াই যে তোমাকে কাজ করিতে হইবে, একথা ভুলিলে চলিবে কেন? নিজের ব্যক্তিগত অভ্যুন্নতিকে স্বকীয় সমাজের ব্যাপক অভ্যুন্নতির সহিত এক করিয়া যদি দেখিতে পার, তবে তাহাকে বহু সমাজ, বহু সম্প্রদায়, ও বহু দল লইয়া যে বিরাট দেশ, তাহার সর্ব্বজনীন অভ্যুন্নতির সহিতই বা এক করিয়া দেখিতে কেন সমর্থ হবে না? অবশ্য, আমার দাবী শুধু এইটুকুই নহে। আমি ত বলিতে চাহি যে, সেই অভ্যুন্নতিকে নিখিল জগতের অভ্যুন্নতির সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিতেই বা সমর্থ না হইবার কারণ কি আছে?"

প্রিয় বস্তু দান

হুগলী জেলান্তর্গত আকুনি নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মহৎ কার্য্যে দান করিতে হইলে প্রিয় বস্তুই দান করিতে হয়। 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করিলে দানের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। কাহারও ধন প্রিয়, কাহারও জন প্রিয়, কিন্তু প্রত্যেকেরই জীবন পরমপ্রিয়। এই জন্যই ধনদান বা জনদান অপেক্ষা জীবন দান শ্রেয়ঃ। নিতান্তই যে ব্যক্তি মহৎ কার্য্যে জীবন দানে সমর্থ হইবে না, অগত্যা সে তদপেক্ষা অল্পতর প্রিয় কিন্তু অপর সকল বস্তুর তুলনায় প্রিয়তম বস্তু দান করিবে। দানের কৌলীন্য অটুট রাখিতে হইলে এই নীতি-সূত্রটুকু অবশ্যই অবিস্মরণীয়। এমন দিন আসিতেছে, যেদিন বাঙ্গালী পিতা-মাতার কাছে আমি শত সহস্র পুত্র কন্যা দান স্বরূপে চাহিব। মুখ ফুটিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ না করি, আমার কার্য্য আমার দাবীকে বিজ্ঞাপিত করিবে। বিত্ত বা সম্পত্তি আমার প্রয়োজন হইবে না, চাহিব পুত্র আর কন্যা,—বলিষ্ঠ ও তেজস্বী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সাহসী, বিশ্বাসী ও বীর্য্যবান্ পুত্র আর কন্যা। কন্যা দলে দলে পাইব, কারণ, 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' মন্ত্রটা কি সবাই সহজে ভুলিয়া যাইবে? বিবাহদানে অসমর্থ পিতামাতারা যাচিয়া আনিয়া কন্যার পাল পায়ের কাছে ফেলিয়া যাইবে, নিতে অস্বীকার করিলেও তাহা মানিবে না, কোনও সুব্যবস্থা ইহাদের জন্য করিতে পারিব না বলিয়া বারংবার সতর্ক করিলেও গ্রাহ্যে আনিবে না, কারণ, আপদ তাহাদের বিদায় করা চাই, প্রিয়বস্তু ত' আর তাহারা দান করিতে পারিবে না। আর স্বেচ্ছায় যদি পুত্রকে কেহ দানার্থে লইয়া আসে, তবে আনিবে রুগ্ন, দুর্ব্বল, জীবিতাশাহীন, অবাধ্য, অশিষ্ট, বংশের অঙ্গার। সমাজ-মনের এই ভঙ্গীটুকুকে আমি জানি বলিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াকেই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গণনা করিয়াছি।"

ত্যাগেই সুখ

বগুড়া-খঞ্জনপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

কথা বলেন, যার দিকে তিনি ফিরে তাকান, সে-ই মধুরতায় আপ্লুত হ'য়ে যায়। মধুর ধ্বনিতে যে নামে, তার জীবনের সকল তিক্ত, কটু, কষায় একমাত্র মধুর রসেই পূর্ণ হয়।

ভক্তের মর্য্যাদা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভক্তদিগকে পূজা কর্ব্বে, ভক্তদিগকে ভালবাসবে, জাতি-লিঙ্গের বিচার ক'রো না, মতামতের পার্থক্য দেখো না। ভগবানের যে ভক্ত, সে তোমার বন্দনীয়। গৃহী হলেও পূজনীয়, ত্যাগী হলেও পূজনীয়। ভক্তকে মর্য্যাদা দিলে ভগবান প্রীত হন।

অভক্তের মর্য্যাদা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিচিত্র সংসার! কতজন কতভাবে এতে বাস করেন, কেউ জানো না। কত ভক্ত অভক্তের সাজ নিয়ে থাকেন। কত বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর ছদ্মবেশ পরেন। কত প্রেমিক অপ্রেমিকের অভিনয় করেন। তুমি কি তাদের সবাইকে চেন? তুমি সকলের অন্তর জান? জানা কঠিন এবং জানার প্রয়োজনও নেই। নিজের অন্তরকে জানাই তোমার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। সুতরাং অপরের মনকে জানার চেষ্টা না ক'রে, অভক্ত, অবিশ্বাসী অপ্রেমিককেও ছদ্মবেশী ভক্ত জ্ঞান ক'রে মর্য্যাদা দেবে। কারো অমর্য্যাদা ক'রো না। কাউকে তুচ্ছ ক'রো না। চোরকে দেখেও যে সাধু জ্ঞান করে, সেই ত' সাধু চিনেছে!

নিজের দিকে তাকাও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার লক্ষ্য হোক্, তুমি যেন ভক্ত হ'তে পার, তুমি যেন প্রেমিক হ'তে পার। নিজের অন্তর অনুসন্ধান কর, খুঁজে দেখ, এক যুগ পরে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে হঠাৎ অঙ্কুরিত হবার আশায় অবিশ্বাসের কঠিন বীজ মনের মাটির অন্তরালে গোপনে কোথায় লুকিয়ে আছে। জগতের সকলকে ভক্ত ব'লে জ্ঞান ক'রে প্রাণপণ যত্নে নিজের ভিতরের অভক্তিকে সমূলে উচ্ছিন্ন কর্ব্বার চেষ্টা কর। পুরুষকারে যখন ব্যর্থকাম হবে, নামের উপরে নির্ভর কর। নামে যখন নিষ্ঠা কমবে, পুরুষকারকে তার

সঙ্গে যুক্ত কর। মোট কথা কোনো অবস্থাতেই তুমি অলস হ'তে পার্ব্বে না।

সোনার দেশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কবে জগৎ তেমন সোনার দেশ হবে রে! পরের দোষে দৃষ্টি না দিয়ে, কবে তোরা নিজের দিকে তাকাবি রে! নিজের প্রাণের প্রেমের জোয়ারে কবে তোরা জগৎকে ভাসিয়ে দিবি রে! কবে তোদের তপস্যা তোদের পূর্ণতার সাথে সাথে নিখিল জগতে পূর্ণতা বিতরণ কর্ব্বে রে! আমি তৃষিত নয়নে তাকিয়ে আছি, আমি পিপাসিত প্রাণে প্রতীক্ষা কচ্ছি। এ যেন শবরীর প্রতীক্ষা রে! "আসিবে শ্রীরাম, আসিবে।"

সোনার দিন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই দিন হবে সোনার দিন। যত জীব আছে, সেই দিন সবে প্রেমের গাথাই গাইবে। হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ সবাই ভুলে যাবে।

রহিমপুর
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৯

ধর্ম্মপ্রচারের নিভৃত পন্থা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা হাজার দুই গজ ভ্রমণ করিলেন। ভ্রমণান্তে যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকাশ্য জনসভা ক'রে আমাদের ধর্ম্মপ্রচার করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের ধর্ম্ম-গ্রহণ কর্ব্বার জন্য যারা জন্ম পেয়েছে, তারা নিজ নিজ প্রাণের তাগিদেই এসে কাছে দাঁড়াবে। আমার গত মৌনের সময়ে তা আমি বিশেষভাবেই অনুভব করেছি। বহু ছেলে বহু মেয়ে তখন স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছে। এমন লোকেও পেয়েছে, যে আমাকে পূর্ব্বে কখনও পার্থিব দেহে দেখে নি। এর মানে কি জানো? এর মানে হচ্ছে এই যে, নিভৃত নীরব প্রাণের আহ্বান প্রকাশ্যে উচ্চারিত ঘোষণা-বাণীর চেয়ে বহুগুণে অধিক শক্তিশালী।

প্রচারশীলতার অসম্পূর্ণতার দিক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যা করা সব চাইতে বেশী দরকার, তা হ'চ্ছে অন্তরের শক্তি সংগ্রহ করা। বাহিরের প্রচারশীলতা (proselytism) প্রকৃত প্রস্তাবে ভিতরের শক্তি-চয়ন চেষ্টাকে প্রভূত পরিমাণে খর্ব্ব করে। প্রচারশীলতা সমধর্ম্মীর সংখ্যা-বৃদ্ধিকারক হ'তে পারে, কিন্তু তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত কত্তে সমর্থ না-ও হ'তে পারে। কারণ মেরুদণ্ড শক্ত করার উপায় হচ্ছে সত্য, তপঃ ও ত্যাগ। প্রচারশীল হবার আগে প্রচারশীলতার এই অসম্পূর্ণতার দিকটাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না।

নীরব আহ্বানের পথে

শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রচারকার্য্যের সুফলে আংশিক বিশ্বাসী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোনও প্রয়োজনেই কি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে নিজের মনোভাব প্রচার কর্ব্বেন না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনও প্রয়োজনেই কর্ব্ব না, এমন কথা বলি না। গত এক বছরের মধ্যেই বোধ হয় আট দশটা বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু তাতে আমি আমার ধর্ম্মমত বলি নি, আমার ধর্ম্মপথের দিকে কাউকে আকৃষ্ট করি নি। ধর্ম্ম নিজের শক্তিতে অব্যাহত গতিতে মানুষের ভিতরে পথ ক'রে নেবেন, বাহ্য প্রয়াসের প্রয়োজন তাতে হবে না। কিন্তু যেখানে ধর্ম্মমতের ভেদ-বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্য যুগপৎ কাজ করা যায়, এমন ক্ষেত্রে কণ্ঠের শ্রম কত্তে পারি। কিন্তু আমার প্রাণের কথা জানো? আমার প্রাণ বক্তৃতায় তৃপ্তি পায় না, চিত্ত আমার আর এক দিকে টানে। বক্তৃতায় আমি অরুচি বোধ করি, বক্তৃতা দান আমার কাছে আলুনি আলুনি লাগে। হয়ত ঘটনার পট-পরিবর্ত্তনে অদূর ভবিষ্যতে আমাকে অবিশ্রান্ত বক্তৃতাতেই দিনের পর দিন কাটাতে হ'তে পারে, প্রাণ যেদিকে অবিরাম টান্‌ছে ঠিক্ তার বিপরীত কর্ম্মজীবনের দিকেই হয় ত আমাকে ছুটে দেখতে হ'তে পারে, কিন্তু তবু আমি জানি, আমার কাজ বাক্যের পথে নয়, আমার কাজ অন্তরের নীরব আহ্বানের পথে।

জীবনের অপূর্ব্ব রহস্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাল্যকালের সহজাত সাধন-লিপ্সাটুকু যদি বাদ দাও তা হ'লে দেখতে পাবে, আমার মনের গায়ে সহস্র সহস্র পার্থিবতার সংস্কার ছিল। আধ্যাত্মিকতা-বার্জ্জতভাবেই জগৎটাকে নিয়ে নানা ছবি এঁকেছি। কিন্তু সেই ছবি লক্ষ লক্ষ ভক্তি-প্রণত নর-মুণ্ডের নয়, সেই ছবি লক্ষ লক্ষ ধ্যাননিরত পার্ব্বত্য পাদপের। পাহাড়, নদী, বন—এই তিনটি দৃশ্য নিয়ে আমি কল্পনার জাল বুনেছি। আকাশের গায়ে অগণিত মেঘপুঞ্জকে চ'খের সামনে রেখে তার মাঝে আমার মনের আঁকা চিত্রগুলিকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। কেউ কি জানে, তার কি সার্থকতা ? জীবন এক অপূর্ব্ব রহস্য। অনন্ত-প্রসারিণী দৃষ্টি যার, মাত্র সেই এর নিগূঢ় গতি বুঝ্‌তে পারে।

বন-পাহাড়ের নেশা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উড়িষ্যার সুখিন্দা রাজ্যের গভীর বন, আর বাঁকুড়ার পিয়ার-ডোবায় গুল্ম-ঘেরা জনবিরল গ্রাম ধবনী, বাল্যের সে কল্পনাকে মূর্ত্তি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দিতে পারল না। পুপুন্‌কীর শালের জঙ্গল চিত্তে যেন তৃপ্তি দিয়ে উঠল না, শ্রম ক'রে আত্মপ্রসাদ এল না, এল দারুণ শ্রান্তি, দারুণ ক্লান্তি, আর এল দেহের অপটুতা। কিন্তু তবু বন-পাহাড়ের নেশা আমাকে ছেড়ে যেতে ত' চাচ্ছে না!

বেকার সমস্যা সমাধানের একটী দিক্

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সবাই বলে, বেকার-সমস্যা। সমস্যা কি বেকারের ? সমস্যা হচ্ছে স্বপ্নঘেরা চক্ষু-যুগের অভাবের। বাস্তববাদীর দল, ক্ষুদ্রকেই সত্য মনে করে, তুচ্ছকেই শেষ ব'লে জ্ঞান করে, তাই তারা ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে বিরাটকে, তুচ্ছের ভিতর দিয়ে মহৎকে অর্জ্জন ক'রে নেবার না পায় সাহস, না পায় রুচি। সত্যিকথা বলতে হ'লে এই না হচ্ছে গৃহে গৃহে যুবক-কণ্ঠের হাহাকারের মূল ? বাংলা ২৯ সালের শেষ দিক দিয়ে একজনকে পত্র লিখেছিলাম যে, বন-পর্ব্বতের অসভ্য জাতিরা আমার প্রাণ, আমি নিজেও জংলী। দলে দলে বেকার ছেলেরা কি সেই দিকে চ'খ মেলতে পারে না ?

বন-পাহাড়ের নেশায় কি তাদের ধর্‌তে পারে না? সহরে সহরে বড়মানুষের উচ্ছিষ্ট-কণা নিয়ে ক্ষুধিত কুক্কুরের মত হানাহানি না ক'রে দলে দলে ছেলের পাল কি নেশার ঝোঁকে পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে দুর্গম গিরিকান্তারে গিয়ে সভ্যতার দীপশিখা ধারণ কর্ব্বার ব্রত গ্রহণ কত্তে পারে না? আজও সেকথা ভাবি রে, আজও সেকথা ভাবি। অথচ প্রাণটা অনুক্ষণ নিভৃত তপস্যার দিকে টান্‌ছে।

রহিমপুর
৯ই আষাঢ়, ১৩৩৯

তিল তিল করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর

কলিকাতা টালা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"সৎপথে সহস্র বাধা, সাধনের পথেও তাহাই। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রবল প্রযত্নে নিয়মিত নিষ্ঠায় নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। মঙ্গলময় নামের অফুরন্ত শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া প্রতিদিন তিল তিল করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর। একদিনও যেন বাদ না যায়, একবারও যেন ভুল না হয়। নিষ্ঠা যাহার দৃঢ়, জয়লক্ষ্মী তারই বশীভূতা।"

অসুবিধার মধ্যেই সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লও

কলিকাতা-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভবিষ্যতের মহৎ মঙ্গলের মুখ তাকাইয়া নিজেকে সুগঠিত করিবার জন্য সহস্র বাধা, সহস্র বিঘ্ন ও সহস্র অসুবিধার মধ্যেই নাম-সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইও। সাধন ব্যতীত কাহারও চিত্ত স্থির হয় না এবং অস্থির চিত্ত কখনও কোনও প্রলোভনকে বা কোনও আত্মিক অকল্যাণকে নির্জ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। সাধক হও, তপস্বী হও এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় বৈষয়িক বিদ্যার্জ্জনও কর।"

সদা-জাগ্রত অনলস সাধন

কলিকাতা-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভিতরের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার যে সহজ অথচ অব্যর্থ পন্থার তুমি

সন্ধান পাইয়াছ, সেই পন্থার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। একটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকেও অলক্ষিতে নিঃশেষিত হইতে দিও না,—প্রত্যেকটীকে নামের বীর্য্যে বীর্য্যবান্ করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত থাক। সদাজাগ্রত অনলস সাধনই জগতে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকে জন্মদান করে।"

হাতে কাজ, শ্বাসে নাম

ত্রিপুরা বাঘাউড়ার কলিকাতা-প্রবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বৈষয়িক কর্ম্মের চাপ যদি সাধন-নিষ্ঠা বা তপস্যার অনুরাগকে হরণ করে, তবে তোমাকে 'সাধক' সংজ্ঞা প্রদান করিতে পারি না। হাতে কাজ চলুক, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম চলুক, ইহাই হইবে এই যুগের উদ্বেগসঙ্কুল কর্ম্মজীবনে সাধন-ভজন চালাইবার প্রকৃষ্ট সঙ্কেত।"

সাধন, ভজন ও অখণ্ড-নাম

কলিকাতা-প্রবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার নিয়মিত ও নিষ্ঠাপূত অনুশীলনের নাম 'সাধন' এবং এই ক্রিয়ানুশীলন-কালে প্রাণময় মনোময় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দদায়ক প্রেমময় বিগ্রহের কল্পনা দ্বারা বা মানসিক অনুভূতি দ্বারা চিত্তমধ্যে ভক্তিরসের সঞ্চারণার প্রয়াসের নাম 'ভজন'। 'সাধন' পুরুষকারমুখী আত্মপ্রত্যয়ী কর্ম্মযোগীর বা জ্ঞানীর স্বভাবের সন্নিকট, 'ভজন' নির্ভরশীল হৃদয়-সর্ব্বস্ব সমর্পণ-প্রকৃতি ভক্তের স্বভাবের অনুকূল। কিন্তু অখণ্ড-নামের একমাত্র স্মরণ একটী চিত্তের মধ্যে সহস্র প্রকারের বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান করে। এই জন্যই একজন অখণ্ড শুধু জ্ঞানীও নহে, শুধু কর্ম্মীও নহে, শুধু ভক্তও নহে—পরন্তু একাধারে সে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির চরমোৎকর্ষের উপাসক।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন—

"পরমাত্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তিকে একটী হইতে অপরটীকে পৃথক্‌রূপে কল্পনা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা আমাদের

সাধনে নিষ্প্রয়োজন। এমন কোনও সৃষ্টি নাই, যাহা প্রকারান্তরে প্রলয় নহে। এমন কোনও ধ্বংস নাই, যাহা সৃষ্টিরই রূপান্তর নহে। সৃষ্টিকে প্রলয় বা স্থিতি হইতে পৃথক করিয়া কিম্বা প্রলয়কে সৃষ্টি বা স্থিতি হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবনামাত্র করা যাইতে পারে, কিন্তু বাস্তবে পাওয়া অসম্ভব। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় পরস্পরের সহিত পরস্পর ওতঃপ্রোত সম্বন্ধে, অঙ্গাঙ্গিভাবে, অবিচ্ছিন্ন প্রসক্তিতে সম্বন্ধ রহিয়াছে। পৃথক্ করিয়া উপাসনা করিতে গিয়া অধিকাংশ হিন্দুর মন হইতে পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বের ধারণাটা কতকটা আল্‌গা হইয়া উঠিয়া যাইতে চাহিয়াছে মাত্র এবং সেই শৈথিল্যের ফাঁকে ফাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বহু কোটি দেবতা ও উপদেবতা আপন প্রতিষ্ঠা রচিয়া যাইবার সফল, অর্দ্ধ-সফল ও বিফল প্রয়াস পাইয়াছে,—উল্লেখযোগ্য অন্য ফল কিছু হয় নাই। আমি আমার সাধন-পদ্ধতিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রভুর বিভিন্ন ক্ষমতানুসারী পৃথকীকরণের দায়িত্ব, প্রয়োজন বা উপযোগিতাকে স্বীকার করি না। তুমি যখন সাধনে বসিবে, নাম জপিবে, তখন একই নামকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বিধাতা পরমাত্মার জ্ঞাপক বলিয়া ধারণা করিতে প্রয়াস পাইবে। আচার্য্য শঙ্কর এই পরমাত্মাকে 'বিধি-বিষ্ণু-শিব-স্তুত-পাদযুগং' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বিধি (ব্রহ্মা), বিষ্ণু ও শিব অখণ্ড-পরমাত্মার খণ্ডিত কল্পনা বা খণ্ডিত অনুভূতি মাত্র। এই তিনটী খণ্ডিত ভাব-বিগ্রহ যাঁহার অখণ্ড অস্তিত্বের চরণ-নখর-কোণে ঠেকিয়া নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন, সেই অনির্ব্বচনীয় মহান্ পরমাত্মাই তোমার উপাস্য।"

সংসারকে ডরাইও না

চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক উপদেশপ্রার্থী যুবকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবন-তরণীর নির্ভুল পরিচালনা সত্যই এক সুজটিল সমস্যা। আমি একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু বাবা, এ সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যিকার আবেগ ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহার জাগ্রত হইয়াছে, সমাধান তাহার হাতের

তালুর উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এরূপ মনে করা চলে। ব্যাকুল হও, অধীর হও,— রুদ্ধ পন্থা খুলিয়া যাইবে, কাণ্ডারীহীন নৌকায় অকূলের কূলদাতা স্বয়ং আসিয়া হাল ধরিয়া বসিবেন।

"সংসারে থাকিতে তোমার ভাল লাগে না, কোনও একটা 'মিশনে' যোগ দিতে চাও। এই আকাঙ্ক্ষাটা মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, সংসারই কি একটা মস্ত বড় 'মিশন' নয়? এক একটী মঠ বা মিশন বহু অগঠিত-চেতা তপ-উন্মুখ যুবককে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া জগৎ-কল্যাণ-তরে আত্মোৎসর্গ করাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই সব যুবকেরা অথবা শুধু ইহারাই নয়, শঙ্করাচার্য্য, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির মত যুগ-বিপ্লাবক ও মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা ঋষিরা জন্ম নেন কার ঘরে? নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর ঘরে নহে। সংসারীরই ঘরে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনানক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যদি কোনও সংসার সহস্র বৎসরের মধ্যেও এই রকম একটী-দুইটী পুরুষের জন্ম দিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সংসারটীকে একশত বড় বড় মঠ বা মিশনের চেয়েও বৃহত্তর ও মহত্তর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিব।

"সংসারকে ডরাইবারও প্রয়োজন নাই, ঘৃণা করিয়াও লাভ নাই। তোমার নিকটে সংসারের যতটুকু প্রাপ্য আছে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। বাহ্য-বৈষয়িক প্রাপ্যের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি তোমার মনের সূক্ষ্ম সংস্কারের দাবীর কথা, যাহার দুশ্ছেদ্যতার প্রকৃত পরিমাণটুকু একমাত্র গভীর তপঃ-সাধনা দ্বারাই পরিচয়-পথে আসিয়া দাঁড়ায়। তোমাকে বাবা আগে তপস্বী হইতে হইবে, নিজের অন্তর্নিহিত ভাল ও মন্দ সকল শক্তির অনুকূল ও পরীপন্থী সকল গূঢ় প্রবণতার স্বরূপ চিনিতে হইবে। তারপরে স্থির করিবে, সংসারেই থাকিবে, না, দূর হইতে প্রাণ-কানুয়ার মোহন-বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া বাহির হইবে।

"যে জন শুনেছে তাঁর মধুমুরলী
সে কি রে রহিতে পারে আপন ঘরে?

পরেরে সঁপিয়া প্রাণ, বহিলে আঁখির বান,
সে কিরে গোপনে থাকে সরম-ভরে ?

"সে কি রে শুনিয়া ডাক নীরবে রহে,
সে কি রে বুকের বোঝা সভয়ে বহে ?
প্রাণের ও যে প্রিয়, তারে
কাছে পেয়ে বারে বারে
সে কি রে ফিরায় লোক-লাজের তরে ?

"ইহকাল পরকাল করে কি বিচার ?
অমল কমল-দলে
সাদরে পড়িতে গলে
সে কি রে চাহিয়া দেখে, কাঁটা আছে তার ?
ছুটি সে বাহিরে ধায়
কারো পানে নাহি চায়,
(প্রাণ)-প্রিয়ের চরণ-তলে লুটিয়া পড়ে।

"তাঁর ডাক যে শোনে, সে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যায়। কিন্তু তপস্যার দ্বারা যার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, তার কর্ণে সে অমোঘ বাণী আসিয়া পৌঁছে না, অর্থাৎ পৌঁছিলেও সে তাহা শোনে না। সংসার-সাগরের উত্তাল ঊর্ম্মিমালার অন্তরালে লুক্কায়িত হাঙ্গর-কুমীরের ভয়ই সংসার ছাড়িবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, ভয়কে জয় করিয়াও ক্ষণ সুখের আসক্তি তোমাকে সেখানেই আটক করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু পরম প্রেমময়ের মধুর বাঁশরী যদি কখনও শোন, তবেই উহা ছাড়িয়া আসিতে পারিবে। তাই বলি বাবা, তপস্বী হও, তপস্যার বলে শ্রবণশক্তিকে বিকশিত কর। ভয়হেতু সংসার ছাড়িও না, প্রাণ-কানুয়ার প্রাণের টানে সংসার ছাড়িতে সমর্থ হও।"

তপস্বী হও

চট্টগ্রাম-কলেজিয়েট স্কুলের জনৈক ছাত্রের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বৃথাই তুমি জীবনে হতাশ হইয়াছ। এমন কোনও দুরবস্থা নাই, যাহা হইতে মানুষ পুনরভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা, শ্রম-শীলতা এবং স্বকীয় সাফল্যে পূর্ণ আস্থা তোমাকে দিয়া অচিন্তিত-পূর্ব্ব সম্পদ অর্জ্জন করাইয়া লইবে। নিজের শক্তিতে এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস কর।

"অনুতাপ করিওনা, কারণ, তোমার পক্ষে অনুতাপ হতাশারই বাহন। যেস্থলে অনুতাপ পূর্ব্বানুষ্ঠিত ভ্রমকে সংশোধিত করিবার জন্য অসামান্য কর্ম্মোদ্যমের সৃষ্টি করে, সেখানে উহা চরিত্রের পরিপুষ্টির পক্ষে শুভানুধ্যায়ী সর্ব্বত্যাগী বন্ধুর ন্যায় স্পৃহনীয়। কিন্তু তোমাকে আজ অনুতাপ করা ভুলিয়া যাইতে হইবে, অতীতের দুঃখময় আত্ম-অপচয়ের কলুষিত ইতিহাস বিস্মৃত হইতে হইবে এবং অধঃপতিত বর্ত্তমানকে উন্নতি-সমুজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক ভবিষ্যতে পরিণত করিবার জন্য শার্দ্দূল-বিক্রমে তপঃসাধন করিতে হইবে।

"ব্রহ্মচারী যাহারা হইতে চাহে, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার এই একটীমাত্র উপদেশ,—'তপস্বী হও।' তপস্যা করিবার জন্য বনে যাইতে হইবে না, গৃহত্যাগ করিতে হইবে না, যার যার গৃহীত কর্ত্তব্যের কলরব-মুখর সহস্র দাবী পূরণ করিতে করিতেই শ্বাসে প্রশ্বাসে পরমেশ্বরের পরম পবিত্রতা-ময় মহানাম নিরন্তর স্মরণ কর, তাঁহার সহিত নিজেকে যুক্ত কর, নিজের পানে তাঁহাকে টানিয়া আন। ছাত্র বিদ্যালয়ের পাঠে উপেক্ষা না করিয়া, অধ্যাপক অধ্যাপনার ত্রুটী না ঘটাইয়া, স্বাদেশিক কর্ম্মী নিজ কর্ম্মবহুলতার হ্রাস না করিয়া, যোদ্ধা স্কন্ধের বন্দুক না নামাইয়া, প্রত্যেকে যার যার বিধি-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াই অবিরত তপস্যার অন্তরঙ্গ অনুশীলন চালাইতে থাক। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, ইহার মধ্য দিয়াই নবভারত তার অভূতপূর্ব্ব মহাজন্ম লাভ করিবে।

"আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত' একটা অতি নিকৃষ্ট রকমের বোকামি। আত্মহত্যা করিলেই কি অসংযম তোমাকে ছাড়িবে? দেহটার ধ্বংস হইলেই কি তোমার মনের সমস্ত কদর্য্য কামনা ও অসুন্দর সংস্কার তোমাকে ফেলিয়া পলাইবে?

দেহ যদি অগ্নিতে দগ্ধ হয় বা জলে পচে, তবু মনের সংস্কার মনেই লাগিয়া থাকিবে, জন্মে জন্মে তোমাকে সহস্র দুর্ভোগ ভোগাইবে, নবপরিগৃহীত প্রত্যেকটী দেহে গিয়া তার বিষময় প্রভাব প্রসারিত করিতে চেষ্টা পাইবে। কিন্তু তপস্যার দ্বারা মনের সংস্কার-গ্রাহিত্বকে যে দগ্ধ করিয়াছে, পূর্ব্বাভ্যাসের কোনও প্রভাব আর তাহার উপরে প্রভুতা বিস্তার করিতে পারে না। আজ তুমি সর্ব্বসংস্কারের মুক্তি-প্রদাতা সর্ব্বকলুষহারী শ্রীভগবানের নিকটে আকুল ক্রন্দনে প্রার্থনা জানাও,—

"মিথ্যারে আমি ক'রে উপাসনা
কুড়ায়েছি যত বেদনা,
আজিকে পরাণ চাহিছে মুক্তি,
আর মায়া-ডোরে বেঁধ না।
"রূপের ধাঁধাঁয় দগ্ধ নয়ন
নিয়ত দুঃখ করেছে চয়ন,
আজিকে জাগাও অন্তরে মোর
তব কল্যাণ-চেতনা।

"তোমারি অভয়-চরণ প্রান্তে
ঠাঁই দাও প্রভো এ মতি-ভ্রান্তে
নাও স্নেহ-ভরে তব স্নেহ-ক্রোড়ে
বলে, 'বাছা আর কেঁদনা'।

"প্রার্থনার শক্তি তোমাকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিবে, ভগবানকে তোমার নিকটবর্ত্তী করিবে। ইহাই শুদ্ধাত্মা হইবার পন্থা। পেটেণ্ট ঔষধে রোগ সারিবে না, রোগ সারিবে ভগবদুপাসনায়। আত্মহত্যায় পাপ মরিবে না, মরিবে ভগবদুপাসনায়। একথায় বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের বলে আশাশীল হও, আশার বলে উৎসাহী হও, উৎসাহের প্রেরণায় তপশ্চারী হও। ইহাই পন্থা,—বাঁচিবার এবং বাঁচাইবার। ইহাই পন্থা,—অভয় পাইবার এবং অভয় দিবার।"

নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা ঘণ্টাখানেকের জন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভবনে আসিয়াছেন।

রামকৃষ্ণপুর হইতে আগত জনৈক ভদ্রলোকের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—One doctor, please, not a throng of them (চিকিৎসক লাগাবেন একটী, শত শত নয়)। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, বহু কবিরাজে রোগীর যমালয়ে গতি। সাধন যারা কর্ব্বে, নিষ্ঠা তাদের চাই-ই। তপস্যার অভিধানে 'নিষ্ঠা'র চেয়ে দামী কথা আর কিছুই নেই।

নিষ্ঠার রক্ষক ও বর্দ্ধক

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—নিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য নিষ্ঠাবান্ সাধকদের চরিতকথা শোনা আবশ্যক। নিষ্ঠার মাহাত্ম্য চিন্তা করা আবশ্যক। যাদের জীবনে নিষ্ঠার মহিমা রূপ পেয়েছে, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ আবশ্যক। নিষ্ঠাহীন, বিপ্রলাপী, অসাধক ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ আবশ্যক। ধর্ম্ম-জগতের কুলটাদের চরিত্রালোচনা থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক। প্রথমোক্তগুলি নিষ্ঠার বর্দ্ধক, শেষোক্তগুলি নিষ্ঠার রক্ষক।

জ্বরের প্রতাপ

আশ্রমে (অর্থাৎ প্রভাত-ভবনে) ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা দেখিলেন, আশ্রমের যে ব্রহ্মচারীটী শ্রীশ্রীবাবার চিঠিপত্রের অনুলিপি রাখেন, তাঁহার শরীরে প্রবল জ্বরের প্রকাশ হইয়াছে। তাহার মাথায় জল ঢালিবার জন্য শ্রীমান জীবন ও অপর এক ব্রহ্মচারী নিকটবর্ত্তী পুকুর হইতে অবিশ্রান্ত জল টানিতেছেন। জীবন সদ্যঃজ্বর হইতে উঠিয়াছে, এমতাবস্থায় এইসব অনিয়ম তাহার স্বাস্থ্যকে আরও বিপন্ন করিবে জ্ঞান করিয়া জীবনকে দুই একদিন মধ্যে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ হইল।

রহিমপুর
১০ই আষাঢ়, ১৩৩৯

নামের শক্তি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক ভক্তকে পত্র লিখিলেন,—

"আপনার-জনদিগকে খুঁজিতে হয় না, তাহারা নিজ প্রেমবশে আসিয়া নিজেরাই ধরা দেয়। বস্তুতঃ আমার ধর্ম্মসাধনায় বা ধর্ম্মপ্রচারের মধ্যে জোগাড়-যন্ত্র আয়োজনাদি করিয়া কাহারও সহিত সম্বন্ধ পাতাইবাব কৃত্রিম পদ্ধতির স্থান নাই। আমি নীরবে ও নিভৃতে আমার অন্তরের ভাব-নিচয়কে পরমেশ্বরের পবিত্র নামের স্পর্শ দিয়া স্বচ্ছ, অনাবিলও কুশাগ্রবৎ একমুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার ফলে যে আমার আপন অদৃশ্য আকর্ষণে সে সত্য :সত্যই আমার নিকটে আপনি আসিয়া দাঁড়াইবে, দাঁড়াইতেছে এবং দাঁড়াইয়াছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নামের অলঙ্ঘনীয় অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে,—বাগ্বিলাসে, বহুভাষে বা লোকপ্রতিষ্ঠায় নহে।

"আমি যে বাবা তোমাদিগকে অনেক সময়ে মৌখিক কোনও উপদেশাদি দেই না, তাহারও প্রধানতম কারণ আমার এই নামের শক্তিতে বিশ্বাস। নাম যখন সর্ব্বশক্তিমানের, তখন ইহার স্মরণ-মননের দ্বারা তোমার ভিতরের সর্ব্বশক্তির সূক্ষ্মপ্রবাহ স্বতঃসঞ্চারিত হইবেই এবং সেই সঞ্চারণা চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে রহিয়া তোমার সকল মানসিক প্রতিবেশীকে প্রভাবিত করিবেই। নাম যখন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার, তখন ইহার সেবা তোমার মনকে অজ্ঞাতসারে সর্ব্বভূতের উপরে অলক্ষ্যপ্রভাবী করিবেই। সমগ্র প্রাণ দিয়া মন দিয়া যে নাম-সাধনা করে, ইতিহাসে তার জীবন-কাহিনী সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী প্রশংসা-সুভাষে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত না হইতে.পারে কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম ইচ্ছার তরঙ্গ-সমূহ লক্ষ লক্ষ যুগবিপ্লবকারী ইতিহাসের গতিনির্ণায়ক মহাকর্ম্মী প্রবুদ্ধাত্মার উপরে জগদ্ধিতমূলক শুভশক্তির লীলা কিছু না কিছু বিস্তার করিবেই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্বের প্রার্থনা আমার নাই (যাহা তরুণ কৈশোরে অনেক সময় সত্যই অনুভব করিতাম) কিন্তু এক একটা অধঃপতিত জাতির ভবিষ্যৎকে যাহারা ভাঙ্গিবে গড়িবে, তাহাদের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে প্রকাশশীল করিবার জন্য আমার সমগ্র চিত্তকে তাহাদের মঙ্গলময় প্রয়াসের পশ্চাতে সফলতার সহিত ও সাধুতার সহিত সংযুক্ত রাখিতে আমি চির-আকাঙ্ক্ষিত। এই জন্যই আমি জগতের সকল শক্তির উপাসনা পরিহার করিয়া একমাত্র নামের শক্তিরই শরণাপন্ন হইয়াছি।

"তোমরা যাহারা নিজের প্রাণের ব্যাকুল প্রেরণায় আসিয়া আমার কাছে আপনার আপন হইয়া ধরা দিয়াছ, তাহাদিগকেও আমি নামের শক্তিতে অবিচলিত আস্থাশীল দেখিতে চাহি।

"কিন্তু নামে আস্থা কি বাবা অমনি আসিবে? যে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, যে যাহার শক্তির পরিচয় পায় নাই, সে তাহার উপরে প্রকৃত বিশ্বাসী কখনই হইতে পারে না। পরমেশ্বরের নামের সত্যই কোনও শক্তি আছে কি না, এ নাম বজ্রবীর্য্য বা শূন্যগর্ভ, তাহার পরীক্ষা তোমাকে লইতে হইবে, তাহার পরিচয় তোমাকে পাইতে হইবে। তারই জন্য বাবা কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হও। যতখানি শ্রম ও কঠোরতা স্বীকার করিলে পরীক্ষা লওয়া যায়, যতখানি দৃঢ়-সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ী হইলে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, ততখানি করিবার ও ততখানি হইবার সাধনা তোমাকে করিতে হইবে। প্রত্যহ যে একটু একটু করিয়া নামের সেবা পদ্ধতিবদ্ধভাবে না করে, নামের পরীক্ষা সে পাইতে পারে না, নামের শক্তি সে প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম হয়। জলের তৃষ্ণা-নিবারণী শক্তি আছে কি না, জানিতে হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ জল পান করিয়া দেখিতে হইবে, অন্নের ক্ষুধা-বিদূরণী শক্তি আছে কি না, বুঝিতে হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন গলাধঃকরণ করিতে হইবে। নামের শক্তিও প্রত্যক্ষ হইবে তখন, যখন উপযুক্ত পরিমাণে তাহাকে সেবা করা হইবে।"

মনের উপর বলপ্রয়োগ কর

চট্টগ্রাম-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"মন যদি বসি বসি করিয়াও নামে বসিতে না চাহে, তবে তাহাকে জোর করিয়া বসাইও। কথায় বলে,—'জোর যার মুল্লুক তার'। কথাটা সর্ব্বত্র না খাটিলেও সাধনকালে তোমাকে খাটাইতে বইবে। কৈশোর হইতেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, এই সময়টার শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই ভবিষ্যৎ জীবনকে শ্রেষ্ঠতা-মণ্ডিত করিবার প্রকৃত আয়োজন। এই মহাসুযোগকে মনঃশাসনের জন্য, মনঃসংযমের জন্য, প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার করিয়া লও। চির-মঙ্গলময় ব্রহ্মনাম তোমার শাসন-দণ্ড, ইহা দৃঢ়হস্তে ধারণ কর।"

"সহস্র বাধা আসিতে চাহিবে, কিন্তু টলিও না। সাধন কর এবং নামের শক্তিকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। প্রলোভনের গুঞ্জনে ভুলিও না। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরত প্রেমময় পরম-মধুর নাম স্মরণ করিতে থাক।"

সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক হও

চট্টগ্রাম-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"অপর কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, অপর কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠা-লিপ্সু ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়া, অপরে যাঁহাকে সাধু-সজ্জন বলিয়া বহুমানন করে, যাঁহার চিন্তা, বাক্য বা আচরণের ভিতরে দোষ, ত্রুটী ও অসঙ্গতি অনুসন্ধানে নিজেকে লিপ্ত না করিয়া যে ব্যক্তি নিজের সাধন নিজের মনে করিয়া যায়, সে হইতেছে, সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক। তোমরা সবাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক হইও। নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যামূলক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের দিকে এক কণা চিন্তা-শক্তিকেও অপব্যয়িত না করিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অভ্রচুম্বী মহত্ত্বের মহাভাণ্ডারে পরিণত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই দেখিও তোমাদের ক্ষুদ্র সাধন-সম্প্রদায়টীকে একটা মহাশক্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিবে। তোমরা, যাহারা আমার প্রাণের প্রাণ হইয়া বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, তাহাদের সংখ্যা কত? বাহিরের লোকের কাছে কত বড় বড় সংখ্যাই শুনিবে, কিন্তু যত লোক পঙ্গপালের মত আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কয়জনকে আমি সাধন-দীক্ষা দিয়াছি? এক একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থায় যতগুলি লোকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়জনকে আমি আমার কাছ হইতে সাধন গ্রহণের ইঙ্গিত-টুকু মাত্র দিয়াছি? যাহাদিগকে সাধন দিয়াছি, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছি, তাহাদের সংখ্যা কম, না বেশী? লোক-প্রতিষ্ঠার সঙ্গত কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও লোক-রসনায় আমার এক রকম একটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহাই বহুশিষ্যশালী বলিয়া একটা জনরব রটাইয়াছে। তোমরা কি সেই জনরব শুনিয়াই আমার কাছে আসিয়াছ?

আমি অবশ্য তাহাই মনে করি না। কিন্তু তাহা শুনিয়াই যদি আসিয়া থাক, তবে, একথা শুনিয়া তোমাকে হতাশ হইতে হইবে যে, তোমাদের শ্রুত-কাহিনী সত্য নহে, অলীক। *শিষ্য-সংখ্যা* আমার অতি অল্প। তন্মধ্যে আবার আরও অল্প লোকে আমাকে আমৃত্যু অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী। যাহারা তদ্রূপ ইচ্ছুক বা সাহসী, তন্মধ্যে আবার অতি অল্প জনই নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তাহাদের ইচ্ছা বা যোগ্যতার অনুকূলরূপে পাইতেছে। * * * সংখ্যাবৃদ্ধির হট্টগোলের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া লভ্যই বা কি পাইবে? অগঠিতচেতাদের মিলন-ক্ষেত্র ত' ঘোরতর আত্মকলহের রঙ্গভূমি হইবে, অসাধক তরুণের দল দিবারাত্রি ism-(মতবাদ)-এর কচায়নে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে নিষ্পেষিত করিবে। * * * শুনিয়া স্তম্ভিত হইবে যে, কোন্‌খানে কাহারা বসিয়া কোন্ ism-এর কল টিপিতেছে, আর গত ৬ই বৈশাখ হইতে রহিমপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের কর্ম্মী যুবকেরা আশ্রমের কর্ম্মকে যে বয়কট করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহাতে দাঁড়ি টানে নাই। দেখা গিয়াছিল, উহা বালক ও বৃদ্ধদের পারস্পরিক কলহ, এখন দেখিতে পাইতেছি যে, তাহা উপলক্ষ বটে, প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ধূম নির্গত হইয়াছে যেই বহ্নিকুণ্ড হইতে, সেই কুণ্ড জ্বলিতেছে কোনও কোনও ism-এর প্রচারকদের ঘরে। চারি পাঁচটী যুবক ব্যতীত সকলে ism-এর নেশায় মজ্‌গুল। এই সব ছেলেরাই কি সম্মিলিত হইয়া তোমাদের সাধন-গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করিবে? আমি বলি, তাহা নহে। কথক বা প্রচারকের সম্মেলন নহে, অসহিষ্ণু উদ্ধতের সম্মেলনও নহে, বহির্ম্মুখতায় অনাস্থাকারী অন্তর্ম্মুখসাধনে নিষ্ঠাশীল তপস্বীদেরই সম্মেলন কাম্য। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা চিরকালই ত' অল্প থাকিবে। * * * তোমরা মহাশক্তির উপাসক, দলবৃদ্ধি তোমাদের বলবৃদ্ধি করিবে না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমাদিগকে সাত্ত্বিক সাধকের উপযুক্ত নিষ্ঠায় লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। তপস্বী মন অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তপস্যাই তোমাদের চরম লক্ষ্য হউক, তপোলব্ধ মহাবীর্য্যই তোমাদের কর্ম্ম-সংগ্রামের পাশুপত অস্ত্র হউক।"

দল ও শত-দল

ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে লিখিত একখানা পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"দল গড়িবার শক্তি আছে, তবু দল গড়ি না, ইহা কি অপরাধ ? তোমাদের ত' তপস্যা করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে, কিন্তু তপস্যা কর না কেন ? তোমাদের ত' স্থির বুদ্ধিতে চলিবার শক্তি আছে, তবু স্থির হইতেছ না কেন ? বলিতে পার, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের অভাব, তাই তপস্যা করিবে না, স্থির হইবে না, প্লাবনের মুখে ভাসিবে, ঝড়ের বাতাসে উড়িবে। আমিও তখন বলিতে পারি, দল গড়িবার শক্তিকে আমি বল বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত রাখিয়াছি, আমিও তোমাদিগকে বলিতে পারি যে, দল গড়িবার উপাদানের অভাব। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমি যে মন্দিরের পূজারী, সেই মন্দিরের দেবতার জন্য একটী মাত্র দল চাই না, চাই শত-দল এবং সেই শতদল কৃত্রিম উপায়কে উপেক্ষা করিয়া স্বভাবের ধর্ম্মে ফোটে।"

জগজ্জয়ের উপায় মায়া-জয়

জনৈক রহিমপুরবাসীর সহিত শ্রীশ্রীবাবার কতকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারের মায়া আর বৈষয়িক প্রলোভন, এই দুই বস্তু যে ত্যাগ কত্তে পারে, সমগ্র জগৎ তার পায়ে লুটে পড়ে। কিন্তু দুটী কাজই সমান কঠিন। সংসারকে যতক্ষণ 'আমার' 'আমার' মনে হবে, ততক্ষণ মায়া কাটাবার উপায় নেই। সংসারের মালিক আমি নই, মালিক ভগবান, এই ভাব নিয়ে যে সংসারকে সেবা দেয়, মায়া তাকে এঁটে উঠতে পারে না। যেমন হাসপাতালের ডাক্তার দৈনিক শত শত রোগী দেখ্‌ছে, কাউকে উপদেশ দিচ্ছে, কাউকে ঔষধ দিচ্ছে, কাউকে অস্ত্রোপচার কচ্ছে, কারো মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য কাজ সে কচ্ছে, যার জন্য যতটুকু দরদ তার থাকা উচিত তা তার আছে, কিন্তু কারো জন্যেই উদ্বেগ নেই, অধীরতা নেই, মত্ততা নেই।

সুখলিপ্সার স্তরভেদ

অপর একজনের সহিত কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে সবাই সুখের লোভী। তবে সুখেরও আবার প্রকার-ভেদ আছে। সকলের সুখ একই রকমে হয় না। যার অনুভবের শক্তি যত সূক্ষ্ম, তার সুখপ্রদ বস্তুটীও তত সূক্ষ্ম। পশুর সুখ ভোজ্যপানীয়ে আর ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে। মানুষের সুখ যশ, মান, প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব অর্জ্জনে। দেবতার সুখ পরহিত-সাধনার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনে। পূর্ণ মানবের সুখ ভগবৎ-প্রেমে। যে নিজে যত উচ্চতর স্তরে বাস করে, তার সুখোপলব্ধির প্রকৃতি এবং বিষয় তত উচ্চস্তরের হবে।

মানুষের প্রকার ভেদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যার যার সুখলিপ্সার স্তরকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। "খাও, দাও, সম্ভোগ কর,"—এই যার মূলমন্ত্র, সে পশুমানব। "যাতে নাম হয়, যাতে যশ হয়, তাই কর, যে কয়দিন বেঁচে আছ, প্রতিপত্তি নিয়ে বাস কর, যে কাজে মান-সম্মান বাড়ে না, লোক-প্রশংসা মিলে না, করতালি-ধ্বনি হয় না, তা ভাল হ'লেও করার গরজ নিরর্থক"—এই যার মূলমন্ত্র, সে পশুমানবের চেয়ে কিছু ঊর্দ্ধে, মানে, সে হচ্ছে সাধারণ মানব। "মান-সম্মান চুলোয় যাক্, প্রশংসা-গুঞ্জন স্তব্ধ হোক্,—দেশ, জাতি, জগৎ—এদের নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার সেবাই আমার জীবনের ব্রত,"—এই যার মূলমন্ত্র, সে দেব-মানব। পূর্ণ মানবের কথা কি আর বল্‌ব, ভগবদ্‌ভক্তির মহিমায় ধ্রুব নক্ষত্রের মতন তাঁরা চির-উজ্জ্বল, অনন্ত কোটি জীব তাঁদের জীবনের ভাগবতী স্থিতির কথা আলোচনা ক'রে জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত মহাপাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। ভগবানই তাঁদের ধ্যান, ভগবানই তাঁদের জ্ঞান, ভগবানই তাঁদের সর্ব্বস্বধন।

মানবের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ চিরকালই কখনো পশু থাকৃতে পারে না। তার অন্তরে ব্রহ্মজ্যোতি জল্‌ছে, সে তা' দেখতে পায় না, তারই জন্য তার এ আত্মবিস্মৃতি। তাই সে ভাবে শূকরের মত বিষ্ঠার স্তূপে মুখ গুঁজে থাকাতেই

বুঝি তার জীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু বিষ্ঠার স্তূপে যত সুখই খোঁজ, কয়েকদিন পরে মন অন্যদিকে মুখ ফিরাবেই। স্বভাবের পথেই এভাবে মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হ'তে বাধ্য। কিন্তু সাধুসঙ্গ ও মহৎ-কৃপায় এ ক্রমোন্নতি দ্রুত হয়। মহতের সংসর্গে ও অনুগ্রহে পশুমানব সাধারণ মানুষ হয়, সাধারণ মানব দেব-মানব হয়, দেব-মানব পূর্ণমানব হয়। যখনি মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, তার এই ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস রেখ।

রহিমপুর

১১ই আষাঢ়, ১৩৩৯

রহিমপুর ত্যাগের কল্পনা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গাস্থিত তাঁহার কোনও প্রিয় কর্ম্মীকে একখানা পত্র লিখিলেন। তাহাতে রহিমপুর আশ্রম সম্পর্কে অনেক তাৎকালিক বর্ণনা আছে। তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। সাধারণ পাঠকের এই পত্রাংশ পাঠে কোনও হিত হইবে মনে করি না। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার সন্তানদের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে না জ্ঞান করিয়াই উদ্ধৃত হইল। শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়াছেন,—

"বিপদে আপদে অভাবে অনটনে আশ্রমকে সংরক্ষা করিবার জন্য কি করা যায়, তদ্বিষয়ে বিগত দশদিন ধরিয়া রহিমপুরের বিপিন রায়, সূর্য্য রায়, মহেন্দ্র রায়, অশ্বিনী পোদ্দার প্রভৃতি, নবীপুরের গুরুচরণ পণ্ডিত, সুরেন্দ্র সাহা প্রমুখ, হোসেনতলার কেহ কেহ এবং মালিসাইরের সুরেন্দ্র সাহা নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন পরামর্শ করিতেছেন। * * * মোটকথা, এখানকার আশ্রম ছাড়িয়া যাইব, একথা শুনার পরে আজ দেড় বৎসরান্তে অনেকে মনে করিতেছেন যে, আশ্রমটী গ্রামবাসিগণেরই হিতার্থে। * * * আশ্রম হইবার পরে এই গ্রামের বহু ভীরু যুবক সাহসী হইয়াছে,—হয়ত ইহা সাহসী লোকের সঙ্গলাভের ফল,—যদিও সাহস সঞ্চারণার জন্য কোনও প্রচারকর্ম্ম বা উপদেশাদির প্রয়োগ হয় নাই। গ্রামের বহু যুবকের স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যেহেতু ইহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে যত্নবান্ হইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে প্রচুর সদুপদেশ ইহারা পাইয়াছে।

গ্রামের যুবকদের কর্ম্মশক্তি বাড়িয়াছে, আশ্রমের মাটির বোঝা টানিতে টানিতে তাহাদের আত্মাভিমান কমিয়াছে। আমি চলিয়া যাইব শুনিয়া গ্রামবাসিগণ বোধ হয় এই সব মঙ্গল অনুভব করিতেছেন। * * * অজানা দুষ্ট লোকে বারবার গৃহদাহ করিতেছে, আশ্রমের বৃক্ষাদি নির্ম্মমভাবে ছেদন বা উৎপাটন করিতেছে, এসব নৈশ অত্যাচারের প্রতিরোধ বা প্রতিষেধের জন্য রহিমপুরের মনু ও নবীপুরের যোগেশ সাহার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর কল্পনা হইতেছে। গুরুচরণ পণ্ডিতের নেতৃত্বে আশ্রমের কাঁচা গাঁথুনি দেওয়া গৃহখানার আচ্ছাদনের জন্য সওয়া শত টাকা চাঁদা তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। * * * এই সব চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক, ইহা সত্য যে, আমি ইহাদের আন্তরিকতাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, গুরুচরণ পণ্ডিত, রহিমপুরের মহিম-শরৎ এবং সূর্য্য রায় আশ্রমের জন্য স্বতঃ-পরতঃ প্রথমাবধিই প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ধনী বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি নাই, কিন্তু ইঁহাদের অন্তরের ধনবত্তার পরিচয় বহুশঃ পাইয়াছি। সূর্য্য রায় ত' হাঁড়ি খুঁজিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন যে, আশ্রমে চাউল আছে কিনা। নিজ ঘর হইতে তিনি কত চাউল, কত দুগ্ধ, আর কত জ্বালানি-কাষ্ঠ যে আশ্রমে দিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। আমার অসুখের সময়ে আগাগোড়া এবং ছেলেদের অসুখের সময়ে মাঝে মাঝে মাঠা, ছানার জল, সাবু প্রভৃতি যে সূর্য্য-বাবুর স্ত্রী কত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। * * * সূর্য্যবাবু প্রায় প্রতিদিন, মহিম-শরৎ সপ্তাহে একদিন, দেবেন্দ্র পোদ্দারের মাতা মাসে দুইদিন আশ্রমের ভোজনাদি ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ত্যাগ স্বীকার কিছু না কিছু দীর্ঘকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। এইভাবে আমি গ্রামবাসিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবার শত শত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি। তথাপি ইহা সত্য যে, অন্যতর কর্ম্ম এবং অন্যতর ক্ষেত্র আমাকে ডাকিতেছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। আগ্রহহীন দৃষ্টিতে আমি গ্রামিণবর্গের প্রশংসনীয় উদ্যমকে লক্ষ্য করিতেছি। * * * আরও কয়টী উদ্ধতপ্রকৃতি ছেলের সহিত শ্রীযুক্ত বি—বাবুর ছেলেও জেদ্ করিয়া আশ্রমের কোনও কাজে যোগ দেয় না। এই

সব ছেলেদের ভিতরে উৎকৃষ্ট উপাদান সুপ্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও কেন ইহারা এইরূপ অকারণ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহা বুঝিতে যুক্তি-শক্তির উপরে উৎপীড়ন প্রয়োজন। কিন্তু বি—বাবু আজ দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি নিজে গিয়া আশ্রমের মাটি টানিব, দেখি ছেলেরা না গিয়া কেমনে পারে এবং না গেলে কাজ চলে কিনা।" বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য বি—বাবুর এই তেজোদৃপ্ত কথা শুনিয়া আনন্দ হইল। মেবারের রাজপুত-বৃদ্ধদের ভিতরে এই তারুণ্য দেখা যাইত। এই বৃদ্ধ কার্য্যকালে আশ্রমের মাঠে গিয়া সত্য সত্য মাটির ঝুড়ি কাঁধে যে লইবেনও, ইহা আমি বিশ্বাস করি। * * * যাক্, আমি চলিয়া যাইব, একথা শুনিয়া যে গ্রামে প্রাণবত্তার পরিচয় একটু স্ফুটতর হইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। অবশ্য জোর করিয়া ত' চলিয়া যাইব না, ঘটনায় টানিয়া নিলে এখান হইতে ছুট দিব। যিনি অঘটন ঘটান, তিনি হয়ত অন্য দিকে তাঁর চক্রব্যূহ রচনা সুরু করিয়াছেন।"

সাধক দেখিতে চাহি

কলিকাতা-প্রবাসী বাঘাউড়ার জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখি-লেন,—

"সাধনহীন জীবন, আর চক্ষুহীন মস্তক, সমান কথা। অন্ধ সহস্র যোগ্যতা সত্ত্বেও পথ চলিতে অক্ষম, অসাধক সহস্র প্রতিভা সত্ত্বেও সত্য লাভে অসমর্থ। পত্রহীন বৃক্ষ আর ধর্ম্মহীন জীবন তুল্য কথা। আমি তোমাদিগকে সাধক দেখিতে চাহি। জানি, কর্ম্ম-কোলাহলে ডুবিয়া আছ, কিন্তু কর্ম্মের মাঝেই নৈষ্কর্ম্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যুগের দাবী ইহাই। অভিসম্পাতের মত থাকিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞান জীবনের সরলতাকে বজ্রদগ্ধ করিয়াছে, জটিলতাকে বড় বড় সহরের শত সহস্র গলিঘুঁজির ন্যায়ই বাড়াইয়াছে, উদারতাকে কল-কারখানার চিম্নির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। তথাপি তোমাকে সাধক হইতে হইবে। প্রতিযোগিতার উদ্দাম রথে নির্ভীক চিত্তে সারথ্য করিতে করিতে সর্ব্বমঙ্গলময় নিত্যকুশল নামের সেবা করিতে হইবে। পরিণামে নামের সেবাই জয়যুক্ত হইবে।"

চরিত্র গঠনের মূলসূত্র

ময়মনসিংহ-প্রবাসী ত্রিপুরা-বিদ্যাকূটের জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"অন্যে যাহা বলুক বা বুঝুক, আমি কিন্তু বুঝি, চরিত্রগঠনের মূলসূত্র হইতেছে ভগবানের নামের সাধন। ইহা বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করে, মনকে নিষ্কলুষ করে, চিত্তকে নিস্তরঙ্গ করে এবং বাক্যকে সত্যনিষ্ঠ করে। তোমরা এই মহাবস্তুর সেবায় কখনও আলস্য করিও না।"

কর্ম্মের ভিতরে সাধন

ময়মনসিংহ-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"আমার ধর্ম্ম অলসের ধর্ম্ম নহে, দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে, আত্ম-অবিশ্বাসীর ধর্ম্ম নহে, এ ধর্ম্ম কর্ম্ম-সাধনার সহিত অন্তরঙ্গ ভগবৎ-সাধনার সামঞ্জস্য সংস্থাপনে সমর্থ। এজন্যই আমি এ ধর্ম্মকে তোমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া ধরিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। কর্ম্মোন্মাদনার প্রাবল্যের সহিত ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুপম আনন্দকে যুগপৎ উপলব্ধি করিবার সাধনা করিয়া তোমার তরুণ কিশোর সিদ্ধত্ব অর্জ্জন করুক। তোমার প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রেমময় পরমাত্মার কমনীয় স্পর্শলাভে সার্থক ও পবিত্র হউক। কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া নহে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহস্র কঠোরতার মধ্য দিয়াই তোমাদের জন্য চিরানন্দময় পরমধামের রাজরথ্যা প্রসারিত।"

অনুরাগ ও সম্যক্ আত্ম-সমর্পণ

বরিশাল-নিবাসী একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সুগভীর প্রেম-সহকারে মঙ্গলময় নামের সেবা করিবে। নামটী যে তোমার কত আদরের সামগ্রী, কত সোহাগের বস্তু, প্রতিনিয়ত সেই বিষয় চিন্তা করিবে। চিন্তার একমুখতা হৃদয়ের সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগরিত করিবে,— তখন নামের প্রতি এক অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ উন্মেষিত হইবে। অনুরাগ সাধনকে সহজ, সরল ও সুখপ্রদ করিয়া তোলে।

"নিজেকে প্রেমময় পরমপ্রভুর পাদপদ্মে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দাও।

নিজেকে তাঁর ইচ্ছার দাস করিয়া দেহ-মন-প্রাণ কর্ম্মযোগে নিয়োজিত রাখ। নিজের সকল শক্তিকে তাঁর ভ্রূভঙ্গীর অধীন রাখিয়া সহস্র দুঃখের মধ্যেও জগতে নির্ভয়ে বিচরণ কর। তাঁর যে দাস, জগতের সে প্রভু।"

চক্ষুতে মধুর অঞ্জন দাও

বরিশাল-নিবাসিনী একটী কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে ফুটাইয়া তুলিবার, শ্রেষ্ঠ সত্যকে প্রকটিত করিবার প্রকৃত সাধনা কি, তাহা কি জানো মা ? তাহা হইতেছে, শ্রীভগবানের পবিত্র নামের সুখময় সঙ্গকে অহর্নিশ অন্তরে জাগ্রত করিয়া রাখা। মন যদি অভ্যাসের মোহে ঘুমাইয়া পড়িতে চাহে, তাহাকে অধ্যবসায়ের বলে অঙ্কুশের তাড়না দিয়া অতন্দ্রিত করিতে হইবে। তাঁর পরমমধুময় নামকে জীবনের সার-লভ্য বলিয়া আলিঙ্গন কর মা, তোমার চক্ষুতে মধুর অঞ্জন বসিয়া যাইবে, ত্রিজগতে যাহা-কিছু তোমার নেত্র-পথে পতিত হইবে, সবই মধুময় বলিয়া অনুভূত হইবে। পুরুষের জাতি তখন তোমার চিত্তের উদ্বেগ, উন্মাদনা বা চপলতা সৃষ্টির কারণ বলিয়া নিমেষের তরেও অনুভূত হইবে না, কুচক্রী নরনারীর অশুভপ্রসূ চেষ্টা বা ইঙ্গিত তোমার কাছে আসিয়া ব্যর্থতার লজ্জা লইয়া মলিন মুখে ফিরিয়া যাইবে, মানুষের সহস্র গঞ্জনার মধ্যেও তুমি তখন পরম মঙ্গলময় বিশ্বপ্রভুর স্নেহ, আদর ও ভালবাসার অনুপম রসাস্বাদন পাইবে।

"এমন যে সুন্দর জীবন, তার প্রতি কি তোমার লোভ হয় না ? লোভ হইলে তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে আমার আনন্দ আছে। কারণ, এ লোভ যাহার আছে, তাহার স্তনেই অমৃতরসের সঞ্চার হয়, অপরের স্তনে সঞ্চিত হয় বিষ। মা যদি না মায়ের মতন হয়, সন্তান ত' স্তন্যরসের অভাবেই মরিয়া যাইবে !"

সাধুদের অসুখ হয় কেন ?

ফরিদপুর জেলা হইতে একটী যুবক আশ্রম দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। কি কারণে বুঝা গেল না, যুবকটী অতিমাত্রায় কুতর্ক করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা খুব প্রসন্নভাবে তাহার সকল কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। উক্ত

যুবকের কথাবার্ত্তাগুলি সবিস্তারে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তৎকার্য্য হইতে বিরত রহিলাম। মাত্র সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। শ্রীশ্রীবাবার উপদেশগুলি লোকের কাজে আসিবে মনে করিয়া যথাসম্ভব বিবৃত হইল।

যুবক আসিয়া দেখিয়াছেন যে, আশ্রমের দুইজন ব্রহ্মচারী জ্বরে কষ্ট পাইতেছেন। সুতরাং প্রথম প্রশ্নই হইল—সাধুদের অসুখ হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বল্‌তে পারো বাবা, সাধুদের জন্ম হয় কেন, মৃত্যু হয় কেন, ক্ষুধা পায় কেন, তৃষ্ণা লাগে কেন? যার জন্য ওসব হয়, তার জন্যই অসুখও হয়। ক্ষণভঙ্গুর দেহের অসুস্থতাও একটী অনিবার্য্য অবস্থা। যে পরিবর্ত্তনশীল, তার পরিবর্ত্তন হবে না?

সাধুর পরিচয়

প্রশ্ন ঃ—সাধুরা কি রোগ নিবারণ কত্তে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবা।—কেউ পারেন, কেউ পারেন না। কেউ বেশী পারেন, কেউ কম পারেন। কেউ পেরেও তা করেন না। কিন্তু বাবা, এর সঙ্গে ত' সাধুত্বের সম্পর্ক বেশী নয়। সাধন করেন যিনি, তিনিই সাধু। তেমন ব্যক্তি যদি রুগ্ন হন, তবু তিনি সাধু, যদি নীরোগ থাকেন, তবু তিনি সাধু। সাধনশীলতা দিয়ে সাধুর পরিচয়।

ফোঁটা-তিলক কি দোষ, না গুণ?

প্রশ্ন ঃ—আপনারা ফোঁটা-তিলক কাটেন না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কাটি না ব'লেই কাটি না। এর আর কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ—কেন, ফোঁটা-তিলক কাটা কি দোষ?

শ্রীশ্রীবাবা।—দোষ বল্‌ব কেন গো! সর্ব্বজনীনভাবে ফোঁটা-তিলক দোষও নয়, গুণও নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কারো পক্ষে গুণ, কারো পক্ষে দোষ। ফোঁটা-তিলক না কাটলে যার ঈশ্বরানুরাগ খর্ব্ব হওয়ার সম্ভাবনা, তার পক্ষে হবে গুণ। ফোঁটা-তিলক কাটলে যার পরপ্রবঞ্চনার সুবিধা গ্রহণে রুচি বাড়্‌বে, তার পক্ষে দোষ।

কীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ সাধন

প্রশ্ন।—আপনার আশ্রমে অবিরাম হরিনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা নাই কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নেই ব'লেই নেই। এর আর অন্য কোনও কারণ নেই। যখন হবার,তখন আবার হ'তেই বা বাধা কি?

প্রশ্ন।—অমুক অমুক আশ্রমে দেখেছি অনুক্ষণ কীর্ত্তন চলেছে। আপনারা সে ব্যবস্থা করেন না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁর নাম কীর্ত্তন, তাঁর যখন ইচ্ছা হবে, তখন সে সব হ'তেই বা কতক্ষণ লাগবে বল?—তবে, কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ, ভজন-গান এই সব সম্বন্ধে আমার সাধারণ ধারণা কি জান? এসব হচ্ছে মনকে অন্তরঙ্গ নাম-সাধনে বসাবার সহায়ক মাত্র। স্তোত্র-কীর্ত্তনাদি কত্তে কত্তে মনে যখন একটু আবেশ এল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সাধনে ডুবে যাওয়া ভাল।

এত চিঠি লিখেন কেন?

প্রশ্ন।—আপনি এত চিঠি লেখেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত' কত প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছ বাপ্। বল্‌তে পার, জবাব দিচ্ছি কেন? জবাব না দিলে তোমার প্রাণে কষ্ট হ'ত। অকারণে হয়ত' তোমার চিত্ত এমন বৃত্তির চর্চ্চা কর্ত্ত, যার চর্চ্চার মানেই হচ্ছে সর্ব্বনাশ। তাই তোমার উদ্ধত প্রশ্নগুলিরও জবাব বিনীতভাবে দিচ্ছি। আরো একটী কথা আছে। তুমি যে এসে আমাকে এতগুলি প্রশ্ন কচ্ছ, তাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে কচ্ছি। তোমার ভিতর দিয়ে ভগবান আমার সাথে কথা বল্‌ছেন। জিজ্ঞাসু ভগবানকে অর্চ্চনা কত্তে হ'লে ত' ভক্তরূপী পুষ্প দিয়েই কত্তে হবে। কেমন তাই নয়? তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্পর্কে যে যুক্তি, দূর দূরান্তরের পত্রলেখকদের পত্রের জবাব দেওয়া সম্পর্কেও সেই যুক্তি।

কোলাহল-সঙ্কুল কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের মধ্যে শান্তিময় ভগবান

প্রশ্ন।—এত পত্র না লিখে, ব'সে ব'সে ভগবানের নাম কর্ল্লেই ত পারেন!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক সময় আমার সেইরূপ ইচ্ছাই হয়। ইচ্ছা

প্রবল হ'লে তা করিও। ইচ্ছা প্রবল না হ'লে করি না। কিন্তু বাবা, আরেকটা দিক্ও আছে। এই যে মানুষ চলে, পশু চলে, গাড়ী চলে, ষ্টীমার চলে, নৌকা চলে, পাখী চলে,—এসব কি চল্‌তে পারত, যদি ভগবান্ না চালাতেন? আমার ঈশ্বর স্থবির হ'য়ে একটী স্থানে ব'সে নেই। কামানের মুখে তাঁরই গর্জ্জন, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁরই নির্ঘোষ, সব কিছু তিনিই গড়েন, তিনিই ভাঙ্গেন। জগতের সকল কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপাত-বিরোধী সহস্র কোলাহলের ভিতরেও সামঞ্জস্যময় শান্তিধাম রচনা ক'রে কোথায় তিনি রয়েছেন, তা আমি স্পষ্ট অনুভব কচ্ছি। এ রহস্য যদি না জান্‌তাম, নিশ্চয়ই আমি ঘরের কোণে ব'সে অবিরাম নামই জপ্‌তাম।

কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য

ইহার পরেও প্রশ্ন চলিতে লাগিল। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা প্রসন্ন মুখে বলিতে লাগিলেন,—কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অবিরাম ভগবৎস্মরণের কথা বল্‌ছ ত? তা' যে সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবা, সেটীও ত' এক প্রকারের কর্ম্ম। কোনও না কোনও প্রকারের কর্ম্ম ত' তোমাকে কত্তেই হচ্ছে। কর্ম্ম ছাড়া ত' থাক্‌তে পাচ্ছ না! একজন হয় ত' আমার মত কোদাল মার্‌তে চান না, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ে সারাদিন উদ্দীপনা যোগাতে চান। কিন্তু তিনি যা কর্লেন, তা-ও ত' কর্ম্মই বটে। আর একজন হয় ত লোকের কাছে নিয়ে ধর্ম্মোপদেশ পরিবেশন করাকেও নিতান্তই নিরর্থক ব্যাপার ব'লে মনে কর্ব্বেন। তিনি সমগ্র দিন স্বাধ্যায় নিয়ে প'ড়ে রইলেন। কিন্তু এটাও কর্ম্ম। আর একজন এটাকেও বাহ্য ব্যাপার জ্ঞান ক'রে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ভগবদ্‌ধ্যান কত্তে লাগ্‌লেন। উত্তম কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্ম্মই করা হ'ল। যতক্ষণ জীবাবস্থা আছে, ততক্ষণ স্থূল হউক সূক্ষ্ম হউক, কাজ কিছু কত্তেই হবে। সুতরাং—"কর্ম্মহীন হও", "কর্ম্মহীন হও",—ব'লে উপদেশ দিলেও পালন কর্ব্বে কে?

ভগবৎ-তৃপ্ত্যর্থে কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং উপদেশ এই হওয়াই উচিত যে, যে নিজেকে যে কার্য্যের উপযুক্ত ব'লে মনে কর, সেই কাজই কর, কিন্তু কাজটী ভগবল্লক্ষ্যে সম্পাদন কর। তোমার অখিল কর্ম্ম-চেষ্টাকে ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের জন্যই পরিচালিত কর। কোদালও মার তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে, পুঁথিও পড় তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে, ধ্যান-জপাদিও কর তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে, মজুরিও কর তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে, হুজুরিও কর তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে। সযত্নে জীবন ধারণ কর তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে, অক্লেশে মৃত্যু-বরণ কর তাঁরই তৃপ্ত্যর্থে। তাঁর তৃপ্তিই যে তোমার লক্ষ্য, এইটাই যেন বিশেষ কথা হয়, কার্য্যটী যে কি, তা তিনিই ঘটনা সন্নিবেশের দ্বারা ঠিক্ ক'রে দেবেন। সেই কর্ত্তৃত্ব আর কর্ত্তৃত্বাভিমান নিজের হাতে না-ই রাখ্‌লে। আমার ধর্ম্মে পৃথিবীর কোলাহলকে ভয় পাবার কিছু নেই। যখন যেমন হাতিয়ার হাতের কাছে আস্‌বে, তখন তাকে ভগবৎ-তৃপ্ত্যর্থে প্রয়োগ করাই আমার ধর্ম্ম। আমার ধর্ম্মে কথারও স্থান আছে, মৌনেরও স্থান আছে, জন-সংসর্গেরও স্থান আছে, সংসর্গ-বিরতিরও স্থান আছে, বাহ্যানুষ্ঠানেরও স্থান আছে, অন্তরঙ্গ তপস্যারও স্থান আছে, সংগ্রাম-পরিচালনারও স্থান আছে, শান্তি-স্থাপনেরও স্থান আছে, কিন্তু যখন যাই কর, করবে তোমার নিজের তৃপ্তির জন্যে নয়, তাঁরই তৃপ্তির জন্য।

রহিমপুর

১২ই আষাঢ়, ১৩৩৯

কদভ্যাস-ত্যাগের দৃঢ়তা

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের মাঠে বসিয়া আছেন। গ্রামের একটী যুবক আসিয়া জানাইল যে, কোনও কাজ থাকিলে সে কাজ করিতে চাহে। এই যুবকটী অনেক দিন যাবৎ আশ্রমের কাজে যোগ দেয় না। কিন্তু আজ খুব সকালেই আসিয়াছে। এখনও আর কোনও কর্ম্মী আশ্রমে আসেন নাই।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুই কি তামাক খাওয়া ছেড়েছিস্?

যুবক কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—অনেকটা কমাইয়াছি।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আচ্ছা ছেলে যা-হোক! আধ-খানা বিয়ে, আধ-খানা পৈতে, আধ-খানা শ্রাদ্ধ, আধ-খানা ভোজ! আমি ত ভাবছিলুম, সোণারচাঁদ ছেলে এতদিন পরে অভিমান ভেঙ্গে যখন আশ্রমের কাজে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই একটা পূরা সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। তামাক কিন্তু তুই একদিনেই ছাড়্‌তে পারিস্। লাহোরের দয়ানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাস গ্রহণের পর নানা দেশ পর্য্যটনকালে সঙ্গগুণে ভাং-এর নেশাটী অভ্যাস কল্লেন। একদিন তিনি ভাং খেয়ে, নেশায় অভিভূত হ'য়ে এক শিব-মন্দিরে শুয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, মন্দিরের মহাদেব আর পার্ব্বতীর মূর্ত্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা যেন দীর্ঘকাল ধ'রে দয়ানন্দের বিবাহের প্রস্তাব আলোচনা কচ্ছেন। দয়ানন্দ এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ, সর্ব্বত্যাগীর জীবন তাঁর, তাঁর আবার বিবাহ? নেশা যখন ভাঙ্গল, শয্যা থেকে উঠলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন যে, আর তিনি জীবনে ভাং খাবেন না। যেমন প্রতিজ্ঞা, তেমন কাজ,—সত্য সত্যই তিনি আর সমগ্র জীবনে ভাং স্পর্শও করেন নি। এই রকম জিদ চাই।—আকুবপুরে কৃ—কে আমি কখনো তামাক ছাড়তে বলিনি। কিন্তু একদিন সে স্বপ্নে দেখ্‌ল যে, সে তামাক খায় ব'লে আমি অসন্তুষ্ট। ঘুম থেকে উঠেই সে তামাক ত্যাগ কল্ল। আজ কয় বছর যাচ্ছে, সে একদিনের জন্যও আর হুকা বা কল্কী স্পর্শ করে নি,—প্রলোভনে প'ড়েও না, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধেও না। জান্‌লে? এই রকম দৃঢ়তা চাই।

ক্ষুদ্র কদভ্যাসকে তুচ্ছ করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি তোমাকে দিনের পর দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছি। আমি তোমাকে ভালবেসেছি এবং দেখতেও পাচ্ছি, তোমার আচরণ ক্রমশঃ সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষার দিকে অগ্রসরও হচ্ছে। উপদেশ আমি কমই দিয়েছি, আমার কাছে এলে আমি তোমাকে কোনও একটা শ্রমবহুল কাজেই নিয়োজিত ক'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি বেশী এবং মনে মনে অনুক্ষণ তোমার মঙ্গল কামনা করেছি। লক্ষ্য কচ্ছি, তোমার চলা, বলা, চাউনি সবই ভালর দিকে গতি ফিরিয়েছে। এতে আমি কত না উল্লসিত। কিন্তু যখন

দেখ্‌তে পাই, ধূমপান আর তাস-খেলার মত সামান্য কদভ্যাসকেই এখন পর্য্যন্ত দমন ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছ না, তখন কি ক'রে আশ্বাস পাব যে, এর চেয়ে মারাত্মক যে সকল কদভ্যাস তোমার ভিতরে আছে বা থাকা সম্ভব, সেইগুলিকেও তুমি দমন করেছ বা কত্তে পার্ব্বে ? একটা সিকি পয়সার লোভকে যে সম্বরণ কত্তে পারে না, সে একটা কাঁচা টাকার লোভ সম্বরণ কর্ব্বে কি ক'রে ? ধূমপানে আর তাসখেলায় যে আকর্ষণ, এমন অনেক গুপ্ত কদভ্যাস আছে, যাতে এর চেয়ে শতগুণ আকর্ষণ। ক্ষুদ্রটাকেই দমন কত্তে পাল্লে না, বড়টাকে পার্ব্বে, তার ভরসা কি বাবা ? ক্ষুদ্র ব'লেই কি কদভ্যাসকে তুচ্ছ কত্তে পার ? ক্ষুদ্র একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কি গ্রামকে গ্রাম, বাজারকে বাজার দগ্ধ ক'রে দিতে পারে না ? ক্ষুদ্র এক কণা সাপের বিষ কি মহাবলবান্ ভীমকায় পুরুষকেও মৃত্যুমুখে নিয়ে যেতে পারে না ? ক্ষুদ্র শত্রুও শত্রু, তাকেও উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়।

ক্ষুদ্র শত্রুকে দ্রুত ধ্বংস কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্ষুদ্র শত্রুকে জয় করাও সহজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধজয় মহাযুদ্ধ-জয়ে গিয়ে পরিণত হয়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বড় রণ-নেতার জীবন পর্য্যালোচনা কর, দেখ্‌বে, ছোট ছোট শত্রুকেই সাফল্যের সহিত দমন করেছেন তারা আগে। পৃথিবীর সব চাইতে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ক্ষুদ্র শত্রুকেই আগে দলন কর্ব্বার চেষ্টা করেছেন। ক্ষুদ্র শত্রুর সাথে যুদ্ধ ক'রে তারা প্রত্যেকে শক্তিসঞ্চয় করেছেন। ক্ষুদ্র শত্রুগুলি ধ্বংস করার পথেই সকলের মহাযুদ্ধের সামর্থ্য অর্জ্জিত হয়েছে। তোমরাও সেই দিকে দৃষ্টি দাও। বড় বড় কাজে হাত দেবার আগে ছোট ছোট কাজ গুলিকেই সুসম্পাদিত কর।

কৈশোরের আত্মরক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাদের কাছে বড় বড় কাজ, বড় বড় ত্যাগ দাবী কচ্ছি না। যে বীজগুলি বপন করেছি, আমি চাই, সেইগুলি ভালভাবে অঙ্কুরিত হোক, আর, অঙ্কুরিত শাখা-পল্লবগুলি দৃঢ় হোক, সবল হোক, গরু-ছাগলের মুখ থেকে দূরে থাকুক। জগতের সহস্র সহস্র সন্তপ্তচিত্তের ছায়া-প্রদানকারী মহাবৃক্ষের বিকাশ ত' এই অঙ্কুরটী থেকেই হবে! এখন তোরা

প্রাণপণে আত্মরক্ষা কর। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অসৎসংসর্গে নষ্ট করে দিস্ না।

ভবিষ্যতের পানে তাকাও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি চিরকাল কি এই শরীরটা নিয়ে এইখানে থাক্‌ব ? চিরকালই কি এই শরীর থাক্‌বে ? যতকাল থাক্‌বে, ততকালই কি এক জায়গায় ব'সে থাক্‌বে ? আজ এখানে আছে, কাল অন্যতর কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটে যেতে হবে। ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে ভ্রমণ ক'রে বেড়াব। তোরা করবি, কাকে অবলম্বন ? আমার উন্নত চিন্তাগুলিকেই কি নয় ? আমি ত' চাই, যে চিন্তাগুলি তোদের দেবার জন্য পাগলের মত দুর্ব্বোধ্য জীবন যাপন ক'র্‌লাম, সেই চিন্তাগুলি তোদের কাছে এসেই ম'রে না যায়। The ideas I implant in you are to be radiated throughout the eternal future and to be infused in the ever-coming younger generations. তোরা কি তার জন্য তৈরী হচ্ছিস্ ? ভবিষ্যতের দিকে কি তোরা তাকাস্ ? ভবিষ্যৎ নামে যে একটা কাল আছে, তার কথা কি তোরা ভাবিস্ ? ভবিষ্যৎকে কি তোরা বিশ্বাস করিস্ ?

আত্মমঙ্গলে অমনোযোগী শিষ্য গুরুতর ভারস্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি কখনো ভাবি, আমার শিষ্য-সংখ্যা কম, কখনো ভাবি শিষ্য-সংখ্যা বেশী। যখন জগৎকল্যাণে আত্মাহুতি দানের জন্য কোটি কোটি নির্ম্মল নিষ্পাপ পবিত্র জীবনের প্রয়োজন বোধ করি, তখন ভাবি আমার শিষ্য-সংখ্যা অত্যল্প। যখন শিষ্যদের বহির্ম্মুখতা, ব্রতনিষ্ঠাহীনতা, আত্মাদর ও ঈশ্বরানুরাগের অভাব লক্ষ্য করি, তখন দেখি আমার শিষ্য-সংখ্যা অত্যধিক। জীবকল্যাণের প্রয়োজনে বলিদান দিতে হ'লে কোটি সংখ্যাও অধিক নয়। সংশোধিত ক'রে মানুষ ক'রে তুল্‌তে হ'লে আমার পক্ষে একটী শিষ্যই অত্যধিক। যে শিষ্য আত্মমঙ্গলে যত্ন নেবে না, জীবনের মূল্যকে বুঝ্‌বে না, মনুষ্যজন্মের গুরুত্বকে হেসে উড়িয়ে দেবে, তেমন শিষ্য ত' গুরুর স্কন্ধের গুরুভার। তোদের ভারে আমি ক্লান্তি বোধ করি, তাকি তোরা জানিস্ ? অথচ ব্রহ্মাণ্ডের ভার

বইবার জোর আমার স্কন্ধেই আছে। সে জোর মঙ্গলময় নিজে আমাকে দিয়েছেন।

শিষ্য-পরিচয় দিবার অধিকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার কর্ম্মজীবনের স্বাবলম্বন নিয়ে তোরা কতজন কত গর্ব্ব করিস্, তোদের মধ্যে কতজন আমার সম্বন্ধে কত গল্প গেয়ে গেয়ে বেড়াস্। যে সব কাহিনী আমিও জানিনা, এমন কত কাহিনী তোরা লোককে শুনাস্। কিন্তু আমার আদর্শ অনুসরণ করিস্ না। আমার সাধন-জীবনের কত নিগূঢ় রহস্যের কথা তোদের মুখ থেকে বেরিয়ে সরলস্বভাব সাধারণ লোককে চমকিত ক'রে দেয়। তোরা মহাজনের শিষ্য ব'লে আত্মপরিচয় দেবার জন্য কেউ কেউ মিথ্যা কাহিনী পর্য্যন্ত রচনা কত্তে কুণ্ঠিত হস্ না। অথচ আমার সাধ-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিজ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাস্ না। সেই পরিশ্রমটুকু কত্তে তোরা পরাঙ্মুখ। বল্ দেখি, আমার শিষ্য ব'লে পরিচয় দেবার তোদের অধিকার কতটুকু ?

শিষ্য, কুশিষ্য ও অশিষ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুর আদেশের প্রতীক্ষা না ক'রে যে তার মনের অভিপ্রায় বু'ঝে তদনুযায়ী চলে, সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। আদেশ দানের পরে, যে তা সম্যক্ পালন করে, সে অত্যুত্তম শিষ্য। আদেশ পেয়ে পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়, হ'য়েও আবার চেষ্টা করে, উদ্যম কিছুতেই ছাড়ে না, সে হচ্ছে উত্তম শিষ্য। আদেশ পালনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হয়ে পুনরাদেশের জন্য চুপ ক'রে ব'সে থাকে, কিন্তু পুনরাদেশ পেলে আবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে মধ্যম শিষ্য। আদেশ পেলে পালন কত্তে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হ'লে আর চেষ্টা করে না, সে হচ্ছে অধম শিষ্য। আদেশটা কাণ পেতে শোনে, কিন্তু পালনের বেলাই দুনিয়ার আলস্য ঘাড় চেপে ধরে, তালবাহানা ক'রে ক'রে শুধু কালক্ষয় করে, সে হচ্ছে কুশিষ্য। আর আদেশ পালনেও যত্নহীন, অথচ গুরুর নামে বড় বড় বক্তৃতা ঝেড়ে নিজ লৌকিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কত্তে তৎপর,—সে একেবারে অশিষ্য।

জগৎ ও স্বদেশ

অপরাহ্নে ঢাকা-জেলা নিবাসী একজন ডাক্তার আশ্রম দেখিতে আসিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানবমাত্রেরই ভাবা উচিত, ত্রিভুবনই তার স্বদেশ, জগদ্বাসী সকলেই তার ভ্রাতা-ভগ্নী, কেউ তার দূর নয়, কেউ তার পর নয়। কিন্তু তার মনটী যতক্ষণ প্রৌঢ়ত্ব অর্জ্জন করে নি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ উচ্চ ভাব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। তাই স্বজাতি ও স্বদেশকে তার ভালবাসাই প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ, এই ভালবাসাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'তে হ'তে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়।

বিপজ্জনক স্বাদেশিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বাদেশিকতারও যে একটা বিপজ্জনক অবস্থা আছে, সেই বিষয়ে সকলেরই সচেতন থাকা উচিত। স্বদেশ-সেবার নাম ক'রে পরদেশ-গ্রাসের আমার অধিকার নেই, পররক্তপান, অত্যাচার, অবিচার, এসব কর্ব্বার আমার অধিকার নেই।

দেশাত্মবোধের মহিমময়ী মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিনেন,—বিশাল ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ। অতীতের ঋষি এই স্বদেশকে অখণ্ডরূপেই দেখেছিলেন। তখন সংস্কৃত ছিল আসমুদ্র হিমাচলে সম্ভ্রান্ত জনমাত্রেরই পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা। তাতেই এক সংস্কৃতিগত অখণ্ড ভারত গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশাত্মবোধের দিক দিয়ে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মোগল-পাঠানের আমলেও সেই অভাবের পূরণ হ'তে পারে নি। সেইটুকু সম্পূর্ণ হয়েছে ইংরেজের রাজত্বে। কিন্তু রাজা রামমোহন সংস্কৃত ভাষার বিরোধিতা ক'রে ইংরাজি ভাষাকে রাজপাট দিলেন। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত জন-মাত্রেরই ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা ইংরিজিই হ'য়ে পড়ল। এরই মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রসার ঘ'টে গঙ্গা-গোদাবরীর, সিন্ধু-কাবেরীর পুণ্য-সলিলের প্রতি অনুরক্ত আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী ভারতবাসীর ধার্ম্মিক একত্ববোধ, এসে রাষ্ট্রিক একত্ববোধে পৌছুল। এই যে একত্ববোধ, তার প্রথম

মন্ত্র উচ্চারণ কল্লেন বাংলার ঋষি বঙ্কিম, ক্রমে তারই ভাব তারই প্রতিধ্বনি মারাঠী-পাঞ্জাবী ত্যাগীর কণ্ঠে বাঙ্গালী কণ্ঠের সমস্বরে নিখিল ভারতে ছড়িয়ে পড়্‌ল। ভারতবাসী ভাব্‌তে সুরু কর্‌ল যে, নীচ হীন জঘন্য ভারতবাসীও আমার প্রাণের প্রাণ ;—সিন্ধী আর বর্ম্মী, গাড়োয়ালী আর কানাড়ী, নেপালী আর মারাঠী, আসামী আর গুজরাটি, ভাটিয়া আর কাশ্মীরী, মণিপুরী আর মহিশুরী, কাছাড়ী আর সুরাটী, বাঙ্গালী আর পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী আর বেলুচি, সবাই আমরা এক মায়ের সন্তান,—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ব'লে কোনো ভেদ নেই, আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোল, দ্রাবিড় ব'লে ভেদ নেই, কোল, ভিল, খাসিয়া, সাঁওতাল, নাগা, গারো, রিয়াং, কুকী ব'লে ভেদ নেই। স্বাদেশিকতার কি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি! বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী গায়ক, বাঙ্গালী ভাবুক, বাঙ্গালী প্রচারক স্বাদেশিকতার এই মহিমময়ী মূর্ত্তির পূজা কর্ল্লেন, আর ইরাবতীর তীর থেকে সিন্ধুর তটদেশ পর্য্যন্ত এ পূজার অনুকৃতি হল।

প্রাদেশিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু স্বাদেশিকতারও একটা খণ্ডিত রূপ আছে। প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোধ থেকে এক সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার কুফল অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। প্রদেশে প্রদেশে স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। তবে, "আমি বাঙ্গালী" এ রকম ভাব্‌লে যদি কোনও বাঙ্গালীর আত্মোৎকর্ষের সহায়তা হয়, তবে তার পক্ষে সেরূপ ভাব পোষণ করায় দোষ নেই। রামকৃষ্ণ, রামমোহন আমার ভ্রাতা, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ আমার ভ্রাতা, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমার ভ্রাতা, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন আমার ভ্রাতা, বিপিনচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধব আমার ভ্রাতা, এই জাতীয় চিন্তা পরপীড়নের সহায়ক না হ'য়ে আত্মোন্নতির দিকেই সহায়তা করে। একে প্রাদেশিকতা নাম দেওয়াও চলে না।

প্রাদেশিকতা বিদূরণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রাদেশিকতা-বোধকে দূর কর্ব্বার জন্য অনেকে অনেক রকম ঔষধের ব্যবস্থা কচ্ছেন। সকল প্রদেশ একই ভাষা গ্রহণ কর্লে কি প্রাদেশিকতা যাবে? সমভাষীদের মধ্যে কি আত্মবিরোধ নেই? সকলে একই রকম বেশভূষা ধারণ কর্লেই কি প্রাদেশিকতা যাবে? সমবেশ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কি আত্মবিরোধ নেই? সবাই মিলে একই ধর্ম্ম গ্রহণ কর্লে কি প্রাদেশিকতা যাবে? সমধর্ম্মীদের ভিতরে কি আত্মবিরোধ নেই? আর সকলকে সমভাষী, সমবেশ, সমধর্ম্মী করাও যায়না। নিজ ভাষা, নিজ বেশ, নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে সমুৎসুক ব্যক্তির সংখ্যা জগতে চিরকালই কম থাক্‌বে। সুতরাং প্রাদেশিকতা দূর করার জন্য যত চেষ্টাই হোক্, প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব বৈচিত্র্যকে স্বীকার ক'রে এবং মর্য্যাদা দিয়ে তা' কত্তে হবে। সকল বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট্যকে গলা টিপে মেরে প্রাদেশিকতা দূর করার চেষ্টায় প্রাদেশিকতা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না।

অখণ্ড-জাতীয়ত্ব-বাদের সিদ্ধির দিন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাঙ্গালী যেদিন বাঙ্গালী থেকেই ভারতবাসী হবে, মাদ্রাজী যেদিন মাদ্রাজী থেকেই ভারতবাসী হবে, পাঞ্জাবী যেদিন পাঞ্জাবী থেকেই ভারতবাসী হবে, অনাদি-কালাগত নিজ নিজ প্রাদেশিক সংস্কৃতি রক্ষা ক'রেই যেদিন সকল প্রদেশের লোক পরস্পরকে শ্রদ্ধা নিবেদন কত্তে সমর্থ হবে, ভারতীয় অখণ্ড-জাতীয়ত্ব-বাদ সেই দিন সিদ্ধি অর্জ্জন কর্ব্বে। স্বদেশ-মন্ত্রের ত্রিকালদর্শী ঋষি যাঁরা, তাঁরা সেই দিনটীর পানেই সাগ্রহ নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যেও একত্ব-বোধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু প্রত্যেককে নিজ নিজ অতীতাগত সংস্কৃতির মূলে পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে সকলের সাথে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হতে হলে, যে উদার দৃষ্টির প্রয়োজন, তা বিনা-সাধনে আসে না। প্রত্যেক মানবকে ভগবানের সন্তান ব'লে ভাব্‌তে না শিখ্‌লে এ উদারতা আসে না। জগতে শত ভাষা

শত ধর্ম্ম, শত মতামত থাক্‌বেই। সকলের বিভিন্ন অস্তিত্ব, বিভিন্ন মর্য্যাদা, বিভিন্ন অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়ে তার মধ্যে একত্বের অনুভূতিকে জাগাবার জন্য চাই সকলের প্রতি সমপরিমাণ মমত্ব-বোধ। আমিও ভগবানের, এঁরাও ভগবানের, এই বোধ আগে না এলে এ মমত্ব-বোধ আসে না।

রহিমপুর
১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৯

ভক্তকে ভালবাসা

কুমিল্লার জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্রে লিখিলেন,—

"ভগবানকে যে ভালবাসে, তার সেই ভালবাসা বাহিরের আচরণেও প্রমাণিত হয়। আমাকে ভালবাসিবে আর আমার নিজ-জনকে অবজ্ঞা করিবে, ইহা কি প্রকারের ভালবাসা ?"

চাওয়া ও পাওয়া

মুঙ্গের-বেগুসরাই নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মানুষের মত মানুষ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা পোষণ করিবে। বড় হইতে যে চায় না, বড় হইতে সে পায় না। সত্যিকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে সত্যিকার উচ্চতা দান করে।"

মানুষ কয়জন ?

মুঙ্গের-বেগুসরাই নিবাসী অপর এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমাকে চরিত্রবান্, বীর্য্যবান্, শক্তিমান্ হইতে হইবে, তোমাকে মনুষ্যত্বের প্রদীপ্ত কিরণে জ্যোতির্ম্ময় হইতে হইবে, তোমাকে অসামান্য পুরুষকার-প্রভাবে জগতের সকল দিব্য সম্পদের অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রথমে হইবে দেহে শুদ্ধ, তৎপরে হইবে মনে পবিত্র, তারপরে হইবে দেহে মনে প্রাণে আত্মায় সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পিত-সর্ব্বস্ব। তাঁহাকে ভালবাসিয়া যে সুখ, তাঁহাকে সর্ব্বসুখ দিয়া যে ভালবাসা, সেই অতুল সম্পদ তোমাকে লাভ করিতে হইবে।

"মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া কত কোটি কোটি জীবই ত' জগতে ভূমিষ্ঠ

হইল এবং পশুপক্ষী হইতে নিজেদিগকে পৃথক বলিয়া কত গর্ব্ব করিল, কিন্তু সত্য সত্য মানুষ হইল কয় জন ? মানুষ নামের যোগ্য হইতে হইলে যে তীব্র তপস্যা, যে একাগ্র সাধনা, যে অনুপম আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, কয়জন তাহার জন্য প্রস্তুত হইল, কয়জনই বা তাহার পথ অন্বেষণ করিল ? যে দুই চারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ইহা করিলেন, তাঁহারা ত' মুষ্টিমেয় !

"খাঁটি মানুষ পৃথিবীতে অল্পই হন এবং সেই অতি-দুর্লভ মানব-বরিষ্ঠগণের সমাজে পংক্তিভুক্তরূপে আমি তোমাকেও দেখিতে চাহি। ব্রহ্মচর্য্যের প্রচণ্ড শক্তিতে বিশ্বাসী হও, ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ জীবনে পালন কর, সঙ্গীদের মধ্য হইতে তোমাকে নীচে টানিয়া নামাইবার শক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য তাহাদিগকেও ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ বীর্য্যে বিশ্বাসী করিয়া গড়িয়া তোল, তোমার সমপাঠি-মণ্ডলে পবিত্রতা-স্নিগ্ধ একটা নূতন জগতের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া লইতে যত্নশীল হও। মনুষ্যত্ব বীর্য্যবান্‌কে আশ্রয় করে, পুরুষকার বীর্য্যবানেরই ইচ্ছা পালন করে. ভগবদ্-ভক্তিই যে জীবনের চরম সার্থকতা, একথা বীর্য্যবানেই উপলব্ধি করিতে পারে। হে তপস্বি, বীর্য্যবান্ হও।"

ভগবান্‌কে ডাকিয়া কি লাভ ?

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ভগবানকে ডাকিয়া কি লাভ ? আমি বলিব,—লাভ ভগবদ্‌ভক্তি। পুনরায় প্রশ্ন করিতে পার,—ভক্তি দিয়া কোন্ প্রয়োজন ? আমার উত্তর,—তোমার সকল প্রয়োজনকে তুমি জান না। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছ যে, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, সম্পদ এই গুলিই তোমার প্রয়োজনীয়। এই গুলি যে বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়, তাহা আমি অস্বীকার করি না। এই সকল প্রয়োজনের দাবী তোমাকে পূরণ করিতে হইবে। জগৎটা মায়া, অথবা পরকালের সুখই প্রকৃত সুখ, অথবা, ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের চরম চরিতার্থতা, এই যুক্তিতে অন্নবস্ত্রাদির প্রয়োজনের দাবীকে উপেক্ষা করা

যায় না। যাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের ক্ষতি কিছু হউক আর না হউক, সমগ্র জাতি ও সমাজের ধর্ম্মাচরণের সুযোগগুলিকে পরোক্ষভাবে তাহারা সঙ্কীর্ণতর করিয়াছেন। কারণ, অন্নহীন জঠরে ঈশ্বর-চিন্তা সুকঠিন, স্বাস্থ্যহীন দেহে ঈশ্বর-চিন্তা দুঃসাধ্য। সর্ব্বজনীনভাবে পার্থিব প্রয়োজনের দাবী সমূহের প্রতি অন্যায্য উপেক্ষার ফলে জাতির তথাকথিত ধর্ম্মবোধের বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য আর দারিদ্র্যানুষঙ্গী নানা সামাজিক অকুশল প্রবর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের স্থলে ভণ্ড ধার্ম্মিকের সংখ্যা বাড়াইয়াছে, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি বলিব, এত সব সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তি মানবের প্রাণের সূক্ষ্মতম প্রয়োজন। স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিরা স্থূল লইয়া মজ্জমান রহিয়াছে বলিয়া সূক্ষ্মের এই প্রয়োজনকে অনুভবে আনিতে পারে না। তোমরাও সেই জন্যই পার না।”

আশ্রমে পীড়া

আশ্রমে বর্ত্তমানে খুবই অন্নাভাব চলিয়াছে। তদুপরি আশ্রমী শ—জ্বরে শয্যাগত। ত—আবার জ্বরে পড়িল। অনাহার ও অনিয়মে পুনরাক্রান্ত হইয়া পড়িবে ভয়ে জ—কে······স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। র—কাল আসিয়াছেন, তাঁর রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষা করিয়া অতিশ্রমজাত ক্লান্তি লইয়া। গ্রামের ছেলেদের স্কুল খুলিয়া গিয়াছে, তাহারা পড়া নিয়া ব্যস্ত, রোগীদের কাছে আসিবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ জ্বর এইবার মহামারীর রূপ নিয়াছে, ঘরে ঘরে নরনারী জ্বরে শয্যাশ্রয় লইয়াছে, কে কাহাকে দেখিবে। শ্রীশ্রীবাবা তাঁর দুর্ব্বল শরীর লইয়া রোগীদের অতি সামান্য শুশ্রূষা করিতে পারিতেছেন। তাহাই তিনি কত স্নেহসহকারে করিতেছেন। কিন্তু সমগ্র শ্রমের চোটটা র—এর উপর গিয়া পড়িয়াছে।

রন্ধন-গৃহের সামান্য কার্য্য সারিয়া র—ফিরিয়া আসিয়া রোগীদের শিয়রে বসিলে শ্রীশ্রীবাবা রোগীদের ছাড়িয়া পাট-শোলার কলম লইয়া বসিলেন ”মন্ত্রবাণী” লিখিতে। প্রত্যেকটী মটো স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এক পয়সা করিয়া বিক্রয় হইবে, তারপরে বাজার করা হইবে।

কয়েকটী মন্ত্রবাণী

দুঃখের বিষয়, আশ্রমের স্থাপনাবধি শ্রীশ্রীবাবা নিত্য নূতন বিষয়ে কত মূল্যবান বাণী লিখিয়াছেন, কিন্তু আমরা কেহ তাহার অনুলিপি রাখি নাই। দৈবক্রমে আজিকার লিখিত পঁচিশ-ত্রিশখানা মন্ত্রবাণীর মধ্যে মাত্র কয়েকখানির অনুলিপি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল। যথা,—

১। দাসত্বই দুর্ব্বলতার জনক।

২। দুর্ব্বলতাই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে।

৩। এক দাস অপরকে দাসই করিতে চাহে।

৪। দাসত্বের প্রধানতম লক্ষণ আত্মশ্রদ্ধার অভাব।

৫। ভগবানের দাসত্বই যথার্থ প্রভুত্ব।

৬। সদিচ্ছার সূক্ষ্ম শক্তি বিশাল অমঙ্গলকেও পরাহত করে।

৭। চোরেরাই মিথ্যার সহিত মিত্রতা করে।

স্বপ্নের জের

মন্ত্রবাণীগুলি লিখিয়া শেষ করিয়াছেন, পাট-কাঠির কলম ও রংয়ের পাত্র-যথাস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক-পিয়ন আসিল। ঢাকা হইতে একটী যুবক মণিঅর্ডার করিয়াছেন। কুপনে লেখা আছে যে, ছেলেটী স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহার কঠিন রোগ শ্রীশ্রীবাবা গিয়া সারাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। স্বপ্ন দেখার কতকদিন মধ্যেই ছেলেটী সত্য সত্য আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য দুইটী টাকা পাঠাইয়াছেন।

আর একবার নাকি ইনি স্বপ্ন দেখিয়াই ঢাকা ষ্টেশনে আসেন এবং তাহার ফলে দৃষ্ট স্বপ্নানুসারে তাঁহার দীক্ষাও হয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

রুগ্ন ত—এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা ব্যাখ্যা স্বরূপে বলিলেন,—এই যে তার স্বপ্নদর্শন, এটাকে অলৌকিক ঘটনা ব'লে মনে ক'রো না। আমার দিক্ দিয়ে ত' নয়ই, কারণ, আমি নিজের কোনও যোগশক্তির দ্বারা

এসব স্বপ্ন তাকে দেখাই নি, পরন্তু ছেলেটীর দিক্ দিয়েও নয়। এসব স্বপ্ন তার নিজের ভিতরের সুপ্ত ব্রহ্মশক্তিরই খেলা। কস্তূরীমৃগের মত তার নিজের নাভিতেই মৃগনাভি রয়েছে, তারই গন্ধে সে বারংবার ব্যাকুল হয়, কিন্তু সে তা জানে না ব'লে মনে করে যে, আমিই সব কচ্ছি বা করাচ্ছি।

মদনমোহন বণিক

অপরাহ্নে গ্রামের দুই-একটী যুবক রোগীদের শুশ্রূষার জন্য আসিলেন। কিন্তু তাঁদের পড়াশুনা আছে বলিয়া সন্ধ্যার পরেই চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবাবা নিজেও প্রায় ঘণ্টা আড়াই কাল রোগীদের শুশ্রূষা করিলেন। রাত্রে শুশ্রূষাকারী কেহ নাই দেখিয়া, শ্রীযুক্ত র—মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে ঢাকা জেলান্তর্গত সদাসদি গ্রামের ডাক্তার মদনমোহন বণিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোথা হইতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কেহ ডাকে নাই, কেহ অনুরোধ করে নাই, কিন্তু ভদ্রলোক নিজে হইতে গরজ করিয়া আশ্রমে রহিলেন এবং সারারাত্রি রোগীদের পরিচর্য্যা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবারই একটী কথা,

পরের লাগিয়া যার পরাণ কাঁদে,
প্রেম-ফুল-হারে মোরে সেই ত' বাঁধে!

রহিমপুর

১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৯

চরিত্রের বলই শ্রেষ্ঠ বল

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক যুবককে এক পত্রে লিখিলেন,—

"চরিত্রের দৃঢ়তা ও মধুরতা, এই দুইটী সম্পদই যুগপৎ বাঞ্ছনীয় ও অর্জ্জনীয়। অসত্যের বিরুদ্ধে তুমি অনমনীয় হও এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ ও অনুরক্ত হও।

"চরিত্রের বলই শ্রেষ্ঠ বল, তারপরে বাহুবল। বাহুবলকে জগৎ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা বৃথা, কিন্তু ইহাকে চরিত্র-বলের অধীন ও আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিতে হইবে। চরিত্রের শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহুবল যেখানে

মাথা তুলিয়া একা একা দাঁড়াইতে চাহিয়াছে, সেখানেই জগদ্বাসীর জন্য নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা, ত্রাস, আতঙ্ক ও অসহনীয় ক্লেশ-পরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছে।

"বলশালী হও, বীর্য্যশালী হও, নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী হও, নিজের ভবিষ্যতে আস্থাবান হও। ব্রহ্মচর্য্যকে সকল বলের উৎস জানিয়া, আত্ম-বিশ্বাসের মূল জানিয়া, চরিত্রের ভিত্তি জানিয়া বীর্য্যরক্ষণের পরম সাধনায় দীক্ষিত হও। আবার, ভগবানের মঙ্গলমধুময় নামকে বীর্য্যরক্ষণের মূল জান।

"ভগবৎ-সাধনে সমগ্র চিত্তকে প্রত্যহ সমাহিত করিবার অভ্যাস করিবে। ভগবৎ-সাধনাই সকল প্রতিভার গুপ্ত উৎস খুলিয়া দিবে। ভগবানের নামই সুপ্ত শক্তির পুনর্জ্জাগরণের গুপ্ত মন্ত্র এবং লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের অব্যর্থ কৌশল।"

সুগঠিত দেহ ও সুগঠিত মন

মুঙ্গের-বেগুসরাই-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার দেহ তুমি ভগবানের কাজের জন্য পাইয়াছ। এই দেহটীকে সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবানের কাজের উপযুক্ত রাখিতে হইবে। দেহের স্বাস্থ্য, দেহের কর্ম্মঠতা, দেহের পবিত্রতা অটুট অক্ষত রাখিতে হইবে। মহৎ মঙ্গল সাধনের জন্য যে সকল বিশিষ্ট গুণ ও শক্তির আবশ্যকতা পড়িবে, দেহমধ্যে যদি সে গুলির অসম্পূর্ণতা বা অভাব থাকে, তবে সেই গুলিকে ক্রমবিকশিত বা উদ্বোধিত করিয়া লইতে হইবে।

"মন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। মনটীও পাইয়াছ, শ্রীভগবানের কার্য্য-সাধনের সহায়তারই জন্য। দুষ্ট, অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র চিন্তার দ্বারা কলুষ-জর্জ্জরিত ও দুর্ব্বল করিবার জন্য মনটীকে পাও নাই। পুণ্যময় চিন্তার দ্বারা তাহাকে শক্তিমান ও দুর্জ্জয় করিয়া তোলাও তোমার এক বিশাল দায়িত্ব।"

সত্য, সরলতা, সদাচার

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী অপর এক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সত্য, সরলতা ও সদাচার চরিত্রের তিন শ্রেষ্ঠ ভূষণ। অসত্যের প্রতি অশ্রদ্ধার শক্তিতে সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে, কপটতার প্রতি ঘৃণার দ্বারা সরলতাকে সঞ্জীবিত করিবে এবং সৎ, সংযমী ও বিবেকবান্ পুরুষের

জীবন-পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা ও পর্য্যালোচনা দ্বারা মহাজন-সম্মত সদাচারের প্রতি চিত্তে অনুরাগ বৃদ্ধি করিবে।”

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও অসদ্‌গ্রন্থ বর্জ্জন

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

“যে সব গ্রন্থ পাঠ করিলে সত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, আত্মার মৃত্যুহীনতায় প্রত্যয় জন্মে, হীন স্বার্থপরতায় ও পরানিষ্টজনক কর্ম্মে অরুচি জন্মে, এই সব গ্রন্থকেই সৎগ্রন্থ বলিয়া জানিও এবং এই সব গ্রন্থই পড়িও। যে গ্রন্থ অধ্যয়নে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাড়িয়া যায়, ঈশ্বরানুরাগ হ্রাস পায়, সদ্ধর্ম্মে আস্থা নাশ হয়, অনাচারের প্রতি লোলুপতা জন্মে, অসত্যানুরাগ বাড়ে, ছল-চাতুরী-কপটতার প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টি পড়িতে চাহে, অপ্রেমিকতা, অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়হীনতা ও নিন্দা প্রভৃতি প্রাণের কোণে উঁকি মারিতে চাহে, সে সব গ্রন্থকে বর্জ্জন করিবে।”

সদ্‌গ্রন্থের প্রকার-ভেদ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

“সদ্‌গ্রন্থের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। কতকগুলি গ্রন্থ পাঠমাত্র মনের বড় বড় সমস্যার, বড় বড় প্রশ্নের যেন বিনা চেষ্টায় বিনা বিচার-বিতর্কে আপনা আপনি সমাধান হইয়া যায়, প্রবল অশান্তির সময়েও কিছুক্ষণ পাঠ করিলে প্রাণে শান্তি, সাহস, সরসতা ও আশাশীলতার উন্মেষ ঘটে, চিত্ত অল্প-কাল মধ্যেই নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হইয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থ সদ্‌গ্রন্থ-সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ সম্রাট-স্বরূপ। আমি শ্রীশ্রীগীতাকে এই শ্রেণীর গ্রন্থমধ্যে গণনা করি। বঙ্গভাষাতেও এমন দুই চারিখানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যাহা উৎকর্ষের তুলনায় গীতার অনেক পশ্চাতে থাকিলেও অশান্ত ও অবিশ্বাসী চিত্তকে ত্বরিত শান্তি ও বিশ্বাস প্রদান করিতে বহুলাংশে সমর্থ। যাঁহারা শান্তি-পথের যাত্রী, তাঁহাদের নিকট এ সব গ্রন্থের খোঁজ করিও।

“কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহা এক কথায় মনের মধ্যে শান্তি-রাজ্যের

স্নিগ্ধ-মলয় বহাইয়া দেয় না, কিন্তু নানা প্রকারে চিন্তার হিল্লোল তুলিয়া সদসদ্‌বিচারের এক সুখপ্রদ তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং পাঠকের নিজ বিচার-বুদ্ধিকে কৌশলে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে দিয়াই সংশয়-নিরশনের পথ খোলাইয়া লয়। সাধক-মহাপুরুষদের রচিত সদ্‌গ্রন্থসমূহ অধিকাংশই অল্প-বিস্তর এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থও তোমার পক্ষে অতি অবশ্য পঠনীয়।

"কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহা সদ্বিষয় লইয়াই রচিত, কিন্তু এক একটী মত বা সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে শত শত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যুক্তি-পরম্পরার অবতারণায় এমনি সমস্যা-সঙ্কুল যে, কণ্টকবহুল সুনিবিড় অরণ্য-মধ্যে অপরিচিত ক্লান্ত পথিকের ন্যায় বারংবার পথ হারাইয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এই সব গ্রন্থ অনেক স্থলে শাস্ত্র-পণ্ডিতগণেরই রচিত, সাধন-পণ্ডিতগণের ক্বচিৎ-কদাচিৎ। মাথাটা বেশ ঝুনা হইবার আগে এ সব গ্রন্থ, সদ্‌গ্রন্থ হইলেও, পড়িবার দরকার নাই।

ভগবৎ-সাধনের শক্তি

উক্ত পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"ভগবৎ-সাধন সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবেই অবহিত হইবে। চিত্তকে নিষ্কাম, নির্লোভ ও নিরুদ্বেগ করিতে হইলে ভগবৎ-সাধনের পন্থা ব্যতীত অপর কোনও সত্য পন্থা জগতে আছে কিনা, আমি জানি না। বুদ্ধির বলে কাম ও নিষ্কামতার গুণ-পার্থক্য বিচার করা চলে, কিন্তু কামজয়ী হওয়া যায় না। সঙ্কল্পের দ্বারা লোভের সঙ্গে লড়াই দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু লোভের জড় মারিয়া ফেলা যায় না। প্রবোধ-বাক্য দ্বারা উদ্বিগ্ন চিত্তকে সাময়িক ভাবে স্থির করা যাইতে পারে, কিন্তু তার উদ্বেগ-প্রবণতা ও অস্থির-প্রকৃতিত্বের ধ্বংস-সাধন করা সম্ভব নহে। তাহা করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার নাম ভগবৎ-সাধন। সহস্রবার আমি ভগবৎ-সাধনের এই অমোঘ মহিমার পরিচয় পাইয়া সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তেই এ বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ইহা মিথ্যা আশ্বাস নহে,

কল্পনা-বিলসিত আশার কুহক নহে।—ভগবৎ-সাধনার অসীম শক্তিতে তুমি বিশ্বাসী হও এবং প্রকৃত সাধক হও।"

মানব-জীবন ভগবৎ-পরিকল্পনা

দ্বারবঙ্গের একটী বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"I mean to insist on you that no true growth of life is possible without perfect cleanliness. Clean linen and clear conscience are the two most valuable prizes that you may pride in. You can't build yourself up without a thorough and careful cultivation of those good habits that invigorate the moral consciousness and strengthen the moral back-bone. Have high aspirations and materialise them through tenacity and perseverance [আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহি যে, জীবনের কোনও প্রকৃত বিকাশই সম্যক পবিত্রতা ব্যতীত সম্ভব নহে। শুভ্র বস্ত্র আর পবিত্র বিবেক এই দুই বস্তু হইতেছে গৌরব করিবার দুই মহামূল্য সামগ্রী। যাহা নৈতিক বোধকে উদ্দীপিত করে, নৈতিক মেরুদণ্ডকে সবলতা দেয়, এমন সদভ্যাস সমূহের অনুশীলন ব্যতীত তুমি নিজেকে সুগঠিত করিতে পার না। উচ্চ লক্ষ্য রাখ এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে তাহাকে বাস্তবে পরিণত কর।] Life is a serious business, fraught with the deepest meanings, transcending the highest speculation of the biggest philosopher. Life is God's design on earth. Believe that you are the gradual unfolding of the Divine Desire through all eternity and you must not lose an inch of ground in fully utilising yourself in His wonderful scheme. Rise equal to the occasion and prepare yourself for everything seemingly favourable or untoward. [জীবন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার। ইহা নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। বৃহত্তম দার্শনিকের গভীরতম গবেষণা সমূহ তাহার সন্ধান রাখে না। জীবন এই পৃথিবীতে ভগবানের পরিকল্পনা। বিশ্বাস কর যে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া ভগবদভিপ্রায়ের ক্রমাভিব্যক্তিই হইতেছ তুমি এবং নিজেকে তাঁহার বিস্ময়কর পরিকল্পনায় সম্যক্‌রূপে কাজে আনিবার চেষ্টায় তোমার এক কণাও হঠিলে চলিবে না। দৃশ্যতঃ যাহা অনুকূল বা প্রতিকূল, তাহার সব-কিছুর জন্য তৈরী হও, দাবীর উপযুক্ত সাড়া দাও]"

নির্ব্বুদ্ধিতার বীজ ও দুঃখের ফসল

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী অপর একটী বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"Man as you are, like a man you must live. You must do as your manhood bids you do and not follow the dictates of the brute in you. You can't sit idle and ponder over ephemiral joys. You can't squander away the very best materials of body and mind in fruitless persuits of empty pleasures. You must make the best of your life. You can't lead a worthless life sowing the seeds of foolishness and reaping the harvests of sorrow. [মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ, মানুষের মতই জীবন ধারণ করিতে হইবে। তোমার মনুষ্যত্ব তোমাকে যে আদেশ করে, তদনুসারেই তোমাকে চলিতে হইবে, ভিতরের পশুটার আদেশ তুমি পালন করিতে পার না। অলস হইয়া বসিয়া তুমি ক্ষণস্থায়ী সুখের কল্পনা করিতে পার না। দেহ ও মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে শূন্যগর্ভ সুখের, নিষ্ফল সুখের অনুসরণে অপব্যয়িত করিতে পার না। জীবনের প্রকৃষ্ট সদ্‌ব্যবহার তোমাকে করিতে হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার বীজ বপন করিয়া দুঃখের ফসল আহরণ করিবার অপদার্থ জীবন তুমি যাপন করিতে পার না।] Semen is a divine gift unto you, it is the essence and carrier of life. It is a sacred trust. Be not faithless to it: prove not

a traitor to your own salvation. [শুক্র তোমার প্রতি ভগবানের দান। ইহা জীবনের সার এবং বাহক। ইহা এক স্বর্গীয় ন্যস্ত ধন। ইহার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইও না। নিজের সর্ব্বদুঃখমুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।]"

নামের মহিমা ও জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী অপর একটী ভক্ত-যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবানের নাম সত্যজ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার। নাম অকৈতব প্রেমের অফুরন্ত আকর। নাম অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির অগাধ বারিধি। নামের সেবা তোমাকে পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণ প্রেমী ও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে। পূর্ণিমার গগনে যেমন পূর্ণচন্দ্র, নক্ষত্র-নিচয় ও শুভ্র মেঘমালার একত্র মিলন, তোমার জীবনে তেমন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির একত্র সমন্বয়। জ্ঞান স্থির অচঞ্চল, কর্ম্ম বহু-দিগ্‌-দেশ-বিস্তৃত এবং ভক্তি লীলা-চঞ্চল।"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মহত্ত্ব

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবা রুগ্ন ত—র শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শুশ্রূষার্থ বসিয়াছেন। থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখিলেন, জ্বর কতক কমিয়াছে। রোগীকে একটু আমোদ দিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবা তাহার নিকট নানাপ্রকার হাসির গল্প করিতে লাগিলেন। সামান্য কিছুকাল গল্প করিতেই রোগী রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা পণ্ডিতি বিচারের কথা তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"গুণগুলি যদি দেখ্‌তে যাও, তাহ'লে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। দশ বিশটী উপাধির অধিকারী দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু একখানা পাতলা চাদর ঘাড়ে ফেলে দুপুর রোদে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে আস্‌তে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এ সরলতা, এ অনাড়ম্বর ভাব, আর কোথাও পাবে না। নৈতিক চরিত্র যে অধিকাংশেরই অতি নির্ম্মল, এ বিষয়ে ত' মতদ্বৈধই নেই। শতকরা একশ জন হিন্দুই নিজ নিজ স্ত্রী-কন্যা সম্বন্ধে এঁদের একেবারে নিরাপদ ব'লে মনে করে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের একটী ত্রুটি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যত্র। যখনি কেউ ভারতবর্ষকে একথা শুনাবার জন্য দাঁড়িয়েছেন যে, জাতিভেদ বা মূর্ত্তিপূজা আদি-শাস্ত্র বেদের অনুমোদিত নয়, তখনি তাঁরা কোমর বেঁধে তর্ক কত্তে এসে যদি দেখেন যে জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজার খণ্ডনকারীকে সোজাপথে পরাজিত করা শক্ত, তা হ'লে মূল প্রকরণ পরিত্যাগ ক'রে বাজে ব্যাকরণের তর্ক জুড়ে দেবেন। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এলেন কাশী-ধামে সনাতনী পণ্ডিতগণের সাথে বেদ-বিষয়ে বিচার কত্তে। যুক্তি এবং প্রমাণ ঠিক্ ঠিক্ হচ্ছে কি না, তার সঙ্গে দেখা নেই, সনাতনী পণ্ডিত মশায়রা অন্য একটা বাজে কথা নিয়ে দারুণ হট্টগোল ক'রে সোর তুলে দিলেন,—"দয়ানন্দ হেরে গেছে, আরে দয়ানন্দ হেরে গেছে।" ব্যাস্, যুক্তি-বিচার তল্পীতে তোলা রইল, মেছোহাটার চীৎকারেরই জয় হ'ল। এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সম্মান অনেকটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে যে, ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধির ছুতা ধ'রে মূল বিষয় এঁরা পরিহার কর্ব্বেন। বড়-বাজারের পণ্ডিতেরা একবার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও এরূপ করেছিলেন। এসেছেন সবাই বেদান্ত-বিষয়ে তত্ত্ব-নির্ণয় কত্তে, কথাবার্ত্তা চলেছে দেবভাষায়, বহু বৎসর পাশ্চাত্য দেশে বাস ক'রে দিবারাত্রি বিদেশী ভাষায় ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান কত্তে অভ্যস্ত হয়ে বিবেকানন্দ ধর্ম্মের দিগ্বিজয় ক'রে সবে মাত্র দেশে ফিরেছেন, তার ভিতরেও অনর্গল বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা হচ্ছে। হঠাৎ জিহ্বার চ্যুতিতে স্বামী বিবেকানন্দের মুখ থেকে "স্বস্তি"র বদলে "অস্তি" না "অস্তি"র বদলে "স্বস্তি"র কথাটা বেরিয়ে গেল। আর যাও কোথা? বড় বড় টিকীধারীরা হৈ-চৈ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"দূর ছাই, বিবেকানন্দ একটা কিছুই না।" প্রকৃত লক্ষ্যে দৃষ্টিহীন এই যে নীচতা, এরই জন্য চরিত্রবান, দারিদ্র্যব্রতী, তেজস্বী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নব-ভারতের সংগঠনে শুধু বিদূষকের অভিনয় কচ্ছেন।

সত্যসন্ধের লক্ষণ

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সত্যসন্ধ ব্যক্তি মূল বিষয়টার দিকেই লক্ষ্য

দেবেন। শাখা-প্রশাখায় ভ্রমণ ক'রে তিনি আসল সিদ্ধান্তের কাছ থেকে দূরে স'রে পড়বেন না। এইটী পণ্ডিতের কাছেই আশা করা উচিত। মূর্খদের কাছে এ'র আশা কেউ করে না।

রহিমপুর

১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৯

দীক্ষা ও গুরু-দক্ষিণা

স্বাধীন-ত্রিপুরান্তর্গত আগরতলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ত্যাগী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইতে অর্থের আবার কি আবশ্যকতা? গৃহী গুরুগণের পরিবারবর্গের প্রতিপালনার্থ একটা সুব্যবস্থা প্রয়োজন। নতুবা তাঁহারা সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া অবিচ্ছেদ চেষ্টায় শিষ্যকুলের হিতসাধনে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের নানাবিধ অভাব ও অভিযোগ শিষ্য-কল্যাণ-প্রয়াসে বারংবার জটিল বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। এই জন্যই দীক্ষাকালীন গুরুবরণের বস্ত্রাদি ও অপরাপর ব্যয়ের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু সংসার-ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন গুরুর সহিত শিষ্যের কোনও ঐহিক স্বার্থের কণামাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি শিষ্যকে তার পরমকল্যাণের পথ জানাইয়াই নিরুদ্বেগ এবং নিত্য তার সাধন-পথ-পিচ্ছিলতা প্রশমন করিয়াই নিশ্চিন্ত, নিম্নতর জগতের অন্য কোনও প্রত্যাশার ধার তিনি ধারেন না। অর্থলোভ গুরুর গুরুত্বকে ম্লান করে, দীপ্তিহীন করে, নিবীর্য্য করে। প্রাপ্তির লালসা গুরুর কল্যাণ বিতরণের শক্তিকে খর্ব্ব করে, পঙ্গু করে, স্থূল করে। শক্তিমান নিঃস্বার্থ গুরুর সূক্ষ্ম ইচ্ছার অব্যাহত গতি শিষ্যের দেহ-মন-প্রাণে যে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, স্বার্থী গুরুর নিকট তাহা আশা করা বাতুলতা। এই জন্যই, যাঁহারা গুরু-পদাধিষ্ঠিত, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ নির্লোভতা, নিষ্কামতা ও অপ্রার্থিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

"অবশ্য আরও একটী দিক্ আছে। নির্লোভ গুরু শিষ্যের নিকটে অর্থ, বস্ত্র বা সম্পত্তি চাহিলেন না,—ইহা দ্বারা গুরুর মহিমা বর্দ্ধিত হইল।

কিন্তু বিনামূল্যে রত্ন পাইলে লোকে তাহার যত্ন করে কম। পৈত্রিক শালের দাম পুত্রকে দিতে হয় নাই, পিতাই তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ দিয়া শাল-নির্ম্মাতার দাবী পূরণ করিয়াছিলেন,—এরূপ ক্ষেত্রে পৈত্রিক মূল্যবান্ শাল দিয়া চটি-জুতার ধূলা ঝাড়িতে অনেক পুত্রকে দেখা যায়। সমগ্র সম্পত্তির বিনিময়ে শ্বশুর যে হীরকখণ্ড কিনিয়াছিলেন, বিবাহ-সূত্রে বিনামূল্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেই অমূল্য হীরকখণ্ড দ্বারা পায়ের নখ খুঁটিতে অনেক জামাতাকে দেখা যায়। দীক্ষা সম্পর্কেও এইরূপ ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। বক্ষের পঞ্জরাস্থি বিক্রয় করিয়া গুরু যে অমূল্য রত্ন অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে ত্যাগী গুরু অর্থ বা বস্ত্র গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ভাবী শিষ্যকে বারংবার বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এই বিষয় নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহার আছে যে, এই ব্যক্তি সাধন পাইলে কায়মনোবাক্যে তাহার অনুশীলন করিবে কিনা, দীক্ষার মর্য্যাদা সে রাখিবে কি না। দীক্ষার্থীর অশ্রু বা উপরোধের উপরে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপই তাহার অধিকতর আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, নিষ্ঠা-রূপ গুরু-দক্ষিণা দীক্ষার আগেই আদায় করিয়া লওয়া প্রয়োজন।”

ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের ত্রিবিধ উপায়

রাত্রে রহিমপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিলেন। সনাতন আশ্রমের মাঠে যখন যতটা পারেন, খাটেন। লোকটী কঠোর পরিশ্রমী। বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য সাধনের তিনটী উপায়। একটী স্থূল, একটী নাতিস্থূল, একঠী সূক্ষ্ম। অব্রহ্মচর্য্যের কুফল বিচার করা, ব্রহ্মচর্য্যের সুফল চিন্তা করা, বারংবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য সুতীব্র সঙ্কল্প করা, পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাবে সঙ্কল্পচ্যুত হ'য়ে হ'য়েও পুনরায় তীব্রতরভাবে সঙ্কল্প কত্তে বিরত না হওয়া,—এই হ'ল ব্রহ্মচর্য্য সাধনের স্থূল উপায়। অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, মহৎ হব, শ্রেষ্ঠ হব, মানুষের মত মানুষ হব, নিজের কল্যাণ কর্ব্ব, জগতের কল্যাণ কর্ব্ব, নিজের দুঃখ দূর কর্ব্ব, দেশ, জাতি ও জগতের দুঃখ দূর

কর্ব্ব, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা-মূলক চিন্তা করা এবং এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা-মূলক কর্ম্মে ডুবে যাওয়া,—এই হ'ল ব্রহ্মচর্য্যের নাতিস্থূল উপায়। ঈশ্বর-প্রেমে নিমজ্জিত হব, ভগবানকেই সারাৎসার ব'লে জান্‌ব, তাঁকেই ধ্যান, তাঁকেই জ্ঞান, তাঁকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ব'লে গণনা কর্ব্ব, তাঁর প্রীতির জন্যই জীবন ধারণ কর্ব্ব, তাঁর প্রীতির জন্যই মৃত্যু-বরণ কর্ব্ব, সংসারের সকল মায়া সকল মোহ তাঁরই তরে বর্জ্জন কর্ব্ব, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুর অস্তিত্ব বিস্মৃত হ'য়ে একমাত্র তাঁকেই পরম-দয়িত জ্ঞানে তাঁকে ভালবাস্‌ব এবং তৎফলস্বরূপে স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে,—এইটী হ'ল ব্রহ্মচর্য্যের সূক্ষ্ম উপায়।

রহিমপুর
১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৯

দাম্পত্য-প্রেম ও হীন-সুখ-ভোগ

অদ্য ত্রিপুরা-নিলখি নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"তোমরা স্বামি-স্ত্রী উভয়েই সাধন-বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবে। যৌবনের দুর্ব্বার তাড়নাকে অমৃতমধুর মঙ্গলময় নামের বলে পরাজিত করিয়া যথাসাধ্য পবিত্রতাময় সরস জীবন যাপনে চেষ্টা করিবে। ইন্দ্রিয়-সুখের দিক হইতে ভোগলুব্ধ মনটাকে টানিয়া আনিয়া ভগবানের পাদপদ্মে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে যে সুখ-সোহাগ-সুন্দর প্রেমময় মধুর জীবন আস্বাদিত হইয়া থাকে, তাহা দেবতা, দানব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্বলোকের সাধারণ অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। দাম্পত্য প্রেম হীন-সুখ-ভোগে মলিন হয়, সংযমের দ্বারা সমুজ্জ্বল হয়। কামার্ত্ত জীব-সমাজ ইহার পরীক্ষাটুকুও করিতে চাহিল না,—তোমরা করিয়া দেখ এবং অতুলন সুখ-শান্তির অধিকারী হও।"

ভগবানকেই মূল বলিয়া জান

নিলখি নিবাসী একটী মহিলা-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সংসার-মোহ ত্যাগ করা বা সংসার-সুখ ভোগ করা, এই দুইটীর একটীও তোমার নিজের ইচ্ছার আয়ত্ত বলিয়া মনে করিও না। কিন্তু এই দুইটীর

মধ্যে যখনই যেইটী তোমার প্রীতিপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখনই সেইটী সর্ব্বাগ্রে মনে মনে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তাঁর নিকটে প্রার্থনা জানাইবে, যেন তিনি তাঁর ইচ্ছামতই যেইটী তোমাকে দিবার তাহা দেন, তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মুখপানে না তাকান। তাঁহাকেই মূল বলিয়া জান এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে তাঁরই পায়ে প্রেমের শিকলে বাঁধিয়া রাখ। ত্যাগ বা ভোগ তাঁহার অমোঘ তর্জ্জনী-হেলনে থাকুক কিম্বা যাউক, তাহা লইয়া তুমি আর নিজেকে একটুও ব্যস্ত-সমস্ত করিও না। তাঁহাকেই তোমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, মন-প্রাণ তাঁর পায়ে ডালি দিয়া তুমি রিক্তা হও। সব যে দিয়া ফেলিয়াছে, সব যার প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাকে তিনি বড় ভালবাসেন। তোমার স্বামী তোমার সাথে সাথে তপোব্রত ধারণ করিবেন কি না করিবেন, ইহাও তুমি নিজের ইচ্ছা বা অভিরুচির উপরে দাঁড় না করাইয়া, তাঁরই ইচ্ছার উপরে ছাড়িয়া দাও। ধর্ম্মপথে আরোহণ করিতে তুমি স্বামীর অনুমোদন পাইয়াছ, আপাততঃ ইহাই ত' মা যথেষ্ট। স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রেম্‌সে ভগবানের মধুময় নাম স্মরণ কর। তাঁর নাম পরমমোক্ষদাতা, তাঁর নাম সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা।"

সত্য ধর্ম্ম প্রসারের ভঙ্গিমা

গয়া-নোয়াদা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবানের নাম জপিলে যে প্রাণে শান্তি আসে, এই কথা বুঝিবার জন্য মাহেশ-ব্যাকরণ পড়িতে হয় না, ইহার প্রমাণের জন্য সাংখ্য-বেদান্তও ঘাটিতে হয় না, এক মনে এক প্রাণে নিবিষ্ট চিত্তে কিছু দিন তাঁর মঙ্গলমধুময় প্রেমমাখা নাম জপিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে। মনে প্রাণে তোমরা সাধক হও, মনে প্রাণে তোমরা জাপক হও। "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, ন সংশয়ঃ।" নাম যখন তোমার মুখে মিঠা লাগিবে, তখন তোমার আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলে তোমার মত নামের মধুরস আস্বাদন করিতে ব্যাকুল হইবে, অন্যবিধ প্রচারের অপেক্ষা রাখিবে না। সত্য ধর্ম্ম এই ভাবেই প্রসারিত হয়।"

সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"The luckiest man in my opinion is he who can keep a clean conscience untroubled by any evil deed or thought. What a grand thing it is to remain pure and to help others in their glorious attempts at attaining perfect purity! Cleanliness is really next to godliness if it means the sanctity both of body and mind. A pure mind in a chaste body is the noblest acquisition on earth. [আমার মতে সেই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার বিবেককে কুকার্য্য ও কুচিন্তার দ্বারা অনুদ্বেজিত ও কলুষলেশহীন রাখিতে পারে। নিজে পবিত্র থাকা এবং অপরকে পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিবার গৌরবজনক প্রয়াসে সহায়তা করা, কিরূপ সুমহান ব্যাপার! পবিত্রতার কথা বলিতে যদি দেহ ও মন উভয়ের নিষ্কলুষতা বুঝায়, তবে নিশ্চয়ই পবিত্রতা দেবযোগ্য গুণ। নিষ্পাপ শরীরে অকলঙ্ক মন জগতের মহত্তম সম্পদ।"

রুগ্ন ত'—র জ্বর আজ অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাম নিয়াছে এবং দাস্ত প্রভৃতি উদ্বেগজনক উপসর্গ বন্ধ হইয়া পেট ভাল। মুরাদনগরের ডাক্তার কালীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া ইন্‌জেক্‌সান দিলেন। দিনমানে রোগীকে ঘুমাইতে নিষেধ করিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন।

সুতরাং শ্রীশ্রীবাবা নানারূপ কথা কহিয়া রোগীকে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজ দুপুরে শত শত বিষয়ে কথা হইল। একটী কথা কহিতে কহিতে একটু বেশী সময় নিলেই রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতে চাহেন। অমনি শ্রীশ্রীবাবা অধিকতর চমকপ্রদ আর একটী কথা পাড়েন। আজিকার দিনের সমগ্র কথা তুলিয়া রাখিতে পারিলে তাহা দিয়াই ছোটখাট একখানা পুস্তক হইয়া যাইতে পারিত। রহিমপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা আসিয়া দুইটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে যে কথা কয়টী হইয়াছিল, শুধু সেই কয়টীই লিখিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

ধর্ম্মের নামে কদাচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোথাও কোথাও বৈষ্ণবদের মধ্যে একটী সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়, যারা বিয়ের পরে স্ত্রীকে সকলের আগে গুরুদেবের হাতে সমর্পণ করে এবং তিনি তাকে গ্রহণ ক'রে প্রসাদী ক'রে দিলে পরে নিজেরা স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপন কত্তে পারে। এসব প্রথা অতি জঘন্য, অতি মারাত্মক। এই রকম জঘন্য কদাচার কিছুতেই চল্‌তে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় কদাচার করে, তখনই তা যথেষ্ট জঘন্য। মানুষ যখন বাহাদুরী দেখাবার জন্য কদাচার করে, তখন তা, আরো জঘন্য। কিন্তু যখন তা করে দেশ সেবার নাম ক'রে, কিম্বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, যখন তা করে বড় বড় আদর্শের নিশান উড়িয়ে, তখন তার জঘন্যতা বর্ণনার অতীত। যে-কোনও প্রকারে এইগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। সর্ব্বজনীন প্রচার, শুদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন, কদাচার সমর্থকদের কুযুক্তি খণ্ডন, সামাজিক শাসন, দলবদ্ধ বিরোধিতা এবং আইনের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সব রকম চেষ্টা যুগপৎ ক'রে, এই সব অনাচারের মূলোৎপাটন করা চাই।

স্ত্রীকে গুরুতে সমর্পণ-রূপ প্রথার মূল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুর হাতে স্ত্রীকে সঁপে দেওয়ার প্রথাটা এখন যতই কদর্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, একটা বিষয় লক্ষ্য কত্তে হবে যে, গোড়ায় এটা একটা অশ্লীল কদর্য্য ব্যাপার ছিল না। এর পশ্চাতে একটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এর সাথে একটা প্রাণবন্ত কর্ম্মনীতি ছিল। সেই উদ্দেশ্যটী ছিল, বিবাহিত জীবনের ভিতরে পবিত্রতা ও ভাগবতী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই কর্ম্মনীতিটী ছিল, নববিবাহিতা পত্নী বিবাহের পরেই এসে স্বামিগৃহে ঢুকে যাতে ইন্দ্রিয়-সেবায় নিজেকে না বিকিয়ে দেয়, পরন্তু গুরুগৃহে থেকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, সত্য, সদাচার, ভক্তি, বিনয়, পবিত্রতা প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত সৎশিক্ষা নিয়ে যেন পরমপ্রেমের আধার-রূপে এসে স্বামীর গৃহকে শুচিতায়, মঙ্গলে, আনন্দে ও প্রেমে পূর্ণ করে।

শিষ্যের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ব্যাপারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাবের দিক্ দিয়ে আরও একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সাধক সংসারের সকল বস্তুর উপর থেকে নিজের সকল দাবী তুলে নিয়ে গুরুদেবকেই সংসারের সব-কিছুর মালিক ব'লে জ্ঞান কত্তে চাইতেন। "ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি সবই গুরুদেবের, নিজের কিছুই নয়, কোনও বস্তুর প্রতি আমার কণামাত্র মমত্বও থাকা উচিত নয়, সবই তাঁর, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী হ'য়ে, তাঁর বিষয় তাঁর আশয় দেখছি",—অনেকে অন্তরে অন্তরে এই ভাবের অনুশীলন কত্তে চাইতেন। তাঁদের কাছে, "সব যাঁর, স্ত্রীও তাঁর,"—এই মতেরই প্রাধান্য হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীকে তাঁরা গুরুতে সমর্পণ কত্তেন, এই ভেবে নয় যে, গুরু তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা করুন, পরন্তু এই ভেবে যে, "গুরুকে যে জিনিষ দিয়ে দিয়েছি, সে জিনিষ আর আমার ভোগের বস্তু হ'তে পারে না, স্ত্রীটী আমৃত্যু আমার গৃহে অবস্থান কর্লেও আমি একদিনের জন্যও তাঁর প্রতি কোনও দৈহিক ব্যবহার কর্ব্ব না,—যেমন গয়াতে বা কাশীতে গিয়ে কোনো ফল দান ক'রে এলে, সেই ফল ঝুড়ি ঝুড়িও যদি ঘরে পচে, তবু কেউ একবারটীর জন্যও তা জিভ দিয়ে আস্বাদন ক'রে দেখে না।" সুতরাং বিচার ক'রে দেখ্‌লে, মূলের দিকে চাইতে গেলে, শিষ্যের উদ্দেশ্য ছিল অতীব পবিত্র, অতীব সুন্দর।

গুরুদেবদের বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু শিষ্যের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব যতই প্রশংসনীয় হোক্, গুরু যেখানে সংযমহীন, অবিদ্যাপরায়ণ, বিলাসী ও কামুক, গুরু যেখানে অসতর্ক, স্বার্থপর, অসাধক ও দুর্ব্বল, সেখানে শিষ্যাণীর দলে দুর্নীতি প্রবেশ কর্ব্বেই কর্ব্বে! এ'কে আটকে রাখবার ক্ষমতা কারো নেই। মূর্খ বা অল্প-শিক্ষিতা অল্পবয়স্কা মেয়েগুলিকে গুরুদেবরা যা-খুশী তাই শিখিয়ে দিলেন, সেই পাঠই মুখস্থ ক'রে মেয়েগুলি স্বামিগৃহে ফিরে এল। অধিকাংশেরই জীবনে তদ্বিরুদ্ধ কোনও হিতকর শিক্ষার সুযোগ ঘট্‌ল না। ফলে এই সব বউগুলিই পরে মা হ'য়ে, শ্বাশুড়ী হ'য়ে নিজেদের ঝি-বৌকে নিজেদের পড়া-বিদ্যাই শিখাতে

লাগ্‌ল। গুরুদেবদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল এই ভাবেই সমাজের অংশ বিশেষে একটা বদ্ধমূল কুপ্রথায় এসে পরিণত হয়েছে।

কদাচারের গোড়া স্ত্রী-সুশিক্ষার অভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সব কদাচারের গোড়া যে কোথায়, তা' তোমাদের খুঁজে বে'র কত্তে হবে। সেইটী হচ্ছে, স্ত্রীদের মধ্যে সুশিক্ষার অভাব। মন থাকে যার তৈরী, তার দেহকে স্পর্শ কর্ব্বে এমন সাধ্য কার? সতীত্ব-গৌরব যার ভাল ক'রে জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তার শরীর যে অজেয় দুর্গ। অনুরোধে উপরোধে নয়, শাসানি বা চ'খ-রাঙ্গানিতে নয়, কামান বন্দুক মেরে নয়,—কোনও প্রকারেই তা দখল করা যায় না। এই মূল সূত্রটী ধ'রে যদি আমরা কাজ করি, তবেই এই দুর্নীতির প্রকৃত প্রতিকার হ'তে পারে।

"আদেশ" ও মহাপুরুষগণ

শ্রীযুক্ত সনাতনের অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁদের চিত্ত নির্ম্মল, সম্যগ্‌রূপে যাঁরা ঈশ্বর-সমর্পিত, তাঁরা নিজের অন্তরে ভগবানের আদেশকে স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি কত্তে পারেন। একথা বিশ্বাস করায় তোমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কত সাধকই না দেখা যাচ্ছে, যাঁরা মুহুর্মুহু "আদেশ" পান। "আদেশ"-পাওয়া মহাপুরুষ পথে ঘাটে দেখা যাচ্ছে, গণ্‌লে হয়ত তাদের সংখ্যা অক্ষৌহিণীকেও পার হ'য়ে যাবে। এঁদের কি বিশ্বাস কর্ব্বে, না, অবিশ্বাস কর্ব্বে? মলিন মুকুরে বা চঞ্চল সলিলে ত' প্রতিবিম্ব পড়ে না! এঁদের মন মলিন না চঞ্চল, তা ত' তুমি জান না। কষ্ট ক'রে জানার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম। সে চেষ্টা, অনধিকার-চর্চ্চাও হবে। সে চেষ্টায় পরদোষ-দর্শন-জনিত ক্রটী তোমার চরিত্রে প্রবেশ কর্ব্বে। সুতরাং কর্ত্তব্য ত' সুস্পষ্ট! তোমার কর্ত্তব্য, এঁদের বিশ্বাসও না-করা, অবিশ্বাসও না-করা,—অর্থাৎ এই বিষয়ে এঁদের সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ও অনাগ্রহী হওয়া। এঁদের কাছে অন্য প্রয়োজন থাকে ত' সেই সব বিষয়ে সম্পর্ক রাখ। কিন্তু এঁদের নিকটে যে সকল ঈশ্বরাদেশ অবতীর্ণ হয়, তার ভাল-মন্দে, পালনে-অপালনে, শ্রদ্ধায়-অশ্রদ্ধায় যেও না। পরন্তু প্রাণপণ যত্ন ক'রে নিজে এমন হও,

যেন ভগবানের আদেশ অপরের ভিতর দিয়ে তোমার নিকটে না এসে, সোজা এসে তোমার নিকটে অবতীর্ণ হ'তে পারে। ভগবান পরমকারুণিক, ভগবান অসীমশক্তিধর। তিনি সবাইকে দয়া করেন, তিনি সকল কার্য্য কর্ত্তে পারেন। তাঁর দয়াও নিরঙ্কুশ, তাঁর শক্তিও নিরঙ্কুশ। তিনি ইচ্ছা কর্লেই তোমার অন্তরেও এসে বাণীরূপে আবির্ভূত হ'তে পারেন। মন প্রাণ এক ক'রে তাঁর পানেই তাকাও, "আদেশ"-ওয়ালা মহাপুরুষ খুঁজে খুঁজে সময় নষ্ট ক'রো না।

রহিমপুর

১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯

১৭ই আষাঢ় আশ্রমের অবশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত র—জ্বরে পড়িয়াছেন। সুতরাং আশ্রমের অন্তেবাসিদের শুশ্রূষা ও পথ্যাদি লইয়া শ্রীশ্রীবাবার অত্যন্ত শ্রম যাইতেছে। ১৭ই তারিখ মূলগ্রাম হইতে ডাক্তার সুধীর রায় আশ্রমে থাকিয়া একটী দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবার গৃহকর্ম্ম-জাতীয় কর্ম্মের আংশিক শ্রম অপনোদন করিতেছেন।

রহিমপুর

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৯

রুগ্নদের শুশ্রূষা লইয়া এই কয় দিন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা গিয়াছে। দ্রুতকর্ম্মা র—জ্বরে পড়াতে সকলের দায়িত্বই শ্রীশ্রীবাবার ঘাড়ে পড়িয়াছে। বহু পত্র আসিয়া জমিয়াছে। এত পত্রের উত্তর দেওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া অদ্য শ্রীশ্রীবাবা প্রায় পঞ্চাশখানা পত্র অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

আশ্রম ও তেলের ঘানি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটে কোনও এক পল্লীতে একজন মহাপ্রাণ দেশকর্ম্মী লোকহিতার্থে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। ভেজালবর্জ্জিত বিশুদ্ধ তেল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর আশ্রমে তেলের ঘানি স্থাপন করিতে চাহেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার লিখিত পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"এ সম্বন্ধে আমার অসম্মতি নাই। তবে স্থানীয় উপযোগিতা বা সুবিধা

বুঝিয়া কাজ করিও। সমাজের নিন্দা গ্রাহ্য করিও না,—বর্ত্তমান সমাজ একটা পচা কাঁথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

রহিমপুর
২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৯

আশ্রমের আভ্যন্তরীণ চিত্র

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গাতে তাঁহার জনৈক প্রিয় কর্ম্মীকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার সর্ব্বাংশ প্রকাশ সঙ্গত মনে করি না। তৎকালে রহিমপুর আশ্রমে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা ও তাঁহার ত্যাগব্রতী শিষ্যগণ কিরূপ কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ শুনিলে কাহারও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা জীব-কল্যাণের জন্য অশেষ কৃচ্ছ্র সহ্য করেন। পরবর্ত্তীরা সে কথা ভুলিয়া না গেলে সমাজের হিতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁর পত্রে লিখিলেন,—

"কাজের সুবিধার জন্য টাকা দশটী ত' তোমাকে পাঠাইলাম, কিন্তু এখন রোগীর পথ্য অচল। ত—কে গতকল্য অন্নপথ্য দিয়াছি। তার পথ্য কুলাইবার জন্য আমরা সকলে দুগ্ধপান বর্জ্জন করিয়াছি,—যদিও দুগ্ধ এখন এখানে প্রতি সের দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা। শুধু দুগ্ধ-পান নহে, তিন দিন ধরিয়া অর্দ্ধোদর ভোজন চলিতেছে। * * * র—অল্প ভুগিয়াছে, কিন্তু সকলের জন্য শুশ্রূষার খাটুনিতে আর অনিদ্রাতেই সে বেশী কাবু হইয়া পড়িয়াছে। র—ও শ— উভয়েই আমার মত অসুখ হইতে উঠিয়াছে। ক্ষুধায় কাতর হইয়া বসিয়া থাকে, মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। তবু উহাদের যে কতটা ক্লেশ, তাহার কতকটা অনুমান করিতে পারি, নিজের জঠরের জ্বালা দিয়া, কতক বুঝি উহাদের শুষ্ক মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া। প্রতিদিন ক্ষুধার্ত্ত জঠর লইয়া সকলে শয্যাগত হয়, ক্ষুধা লইয়া ঘুম হইতে জাগে। * * * গ্রামের অবস্থা জানিতে চাহিয়াছ। মানুষের অন্তর সহযোগিতার বুদ্ধিতে পূর্ণ, একথা আমি অস্বীকার করিব কি করিয়া? আমার শরীর অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া গ্রামীণ ভদ্রলোকেরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, আমি প্রচুর দুগ্ধ সেবন করিতেছি কিনা। আশ্রমের

আভ্যন্তরীণ অবস্থার নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া আমি ত' আর এই প্রশ্নের সত্য জবাব দিতে পারি না। ফলে প্রশ্নের উত্তর দিতে বিরত হইয়া অন্য কথা পাড়ি। ছত্রিশখানা 'মটো' লিখিয়া গতকল্য বিক্রয়ের জন্য উমাকান্তকে দিয়াছি, অদ্য উহার মূল্য পাইলে ত'—কে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিব,—সঙ্গে শ—কে দিব। কারণ, এত দুর্ব্বল ছেলে একা যাইতে পারিবে না। ত'—কে এখানে রাখিয়া বিনা শুশ্রূষায় বা বিনা পথ্যে মারিয়া ফেলিতে পারি না। * * * আমি কল্য কি পরশ্ব র—কে লইয়া মোচাগড়া যাইব। ডাক্তার সুধীর আজ দারোরা তার মাসীবাড়ী যাইতেছে। সুধীর এখানে আশ্রমে থাকিয়া একটী দাতব্য চিকিসালয় পরিচালন করিতে চাহে। এই কথা শুনিয়া নবীপুর হইতে কতিপয় সজ্জন আশ্রমের কাঁচা-পাকা ইটে তৈরী করা গৃহখানার দেওয়াল বৃষ্টিতে ধ্বসিয়া যাইবার আগেই চালা তোলা দরকার বিবেচনা করিয়া পরামর্শ করিতে গত ১৯শে তারিখ আসিয়াছিলেন। নয় ফুট ঢেউ টিন কতখানি লাগিবে, এই বিষয়ে সূর্য্যবাবু ও মহেন্দ্রবাবু-সহ তাঁহাদের পরামর্শ হইল। চারিদিন ধরিয়া এই আলোচনার ক্রম-বিরতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় সুধীর মাসীবাড়ী চলিল। মাসীবাড়ী হইতে কয়দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখে সব চুপ্‌চাপ, তবে হয় ত আবার নিজ গৃহে ফিরিবে। গ্রামবাসীদেরও সদিচ্ছা আছে, সুধীরেও সদিচ্ছা আছে। এই সদিচ্ছার কতটা পূরণ হইবে, তাহা ভবিতব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।"

রহিমপুর
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৯

কৌপীনবস্ত্রের গামছা পরা

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক প্রিয় কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"অদ্য আমার মোচাগড়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হইবে না। মাত্র একখানা কপড়ের টুকরা আছে। কাপড় কিনিয়া তারপরে যাইব। এখন একদিন গামছা পরিয়া ও একদিন কাপড় পরিয়া আমি ও র— বস্ত্রের কাজ চালইতেছি। গ্রামে গিয়া একদিন অন্তর একদিন শাস্ত্রপাঠ করিয়া

শুনাই। রোজই একাজ করিতে পারিতাম, লোকের শুনিবার আগ্রহও খুব প্রবল। কিন্তু রোজ যাই না এজন্য যে, লোকে আমাকে কখনও গামছা পরিতে দেখে নাই, এরূপ অবস্থায় গামছা পরিয়া গ্রামে যাইতে সুরু করিলে কতকটা making a parade of poverty (দৈন্যাবস্থার প্রদর্শনী করা) র মত হইয়া পড়িবে। অযাচক হইতে গেলে নিজের অসুবিধার কথাগুলি বাহিরের লোকের কাছে সঙ্গোপনে লুকানই প্রয়োজন। শুধু এই জন্যই গামছা পরিয়া যাই না। কৌপীনধারী সাধু, গামছা পরিলে তার কৌলীন্য কমে না। কিন্তু উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়াই এই কার্য্যে বিরত রহিয়াছি।"

অদ্য বেলা সাড়ে দশটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আশ্রমে কণামাত্র তণ্ডুল ছিল না। প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে জনৈক বিদ্যালয়-গামী বালক আশ্রমে দশ সের চাউল লইয়া আসিল। মোচাগড়া হইতে শ্রীযুক্ত গদাধর দেব ইহা পাঠাইয়াছেন।

লক্ষ্য তোমার নীচ নহে

আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবা ত্রিপুরা-বাঘাউড়ার জনৈক যুবককে পত্রোত্তরে লিখিলেন,—

"লৌকিক জগতের মঙ্গলামঙ্গলের উপরে আধ্যাত্মিক সাধনার যথেষ্ট প্রভাব আমি অনুভব করিতেছি। জীবের সাংসারিক সুখ-দুঃখ আধ্যাত্মিক তপস্যার স্নিগ্ধ ইঙ্গিতকে পরম শ্রদ্ধাভরে শিরোপরি বহনে স্বীকৃত হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সরল এবং মৈত্রীময় চিত্ত লইয়া আত্মরক্ষাবুদ্ধিমূলে যে ব্যক্তি বৈষয়িক কর্ম্মাদিতে রত হইবে, আধ্যাত্মিক সাধনা তাহাকে শুধু বলই দিবে না, সাফল্যও দিবে।

"গার্হস্থ্যের চিত্তবিভ্রমকারী সহস্র বৈচিত্র্যের ধাঁধায় ভুলিয়া যাইও না যে, করায়ত্ত করিতে পারিয়া থাক আর না থাক, লক্ষ্য তোমার কখনই নীচ নহে। যে বুদ্ধির শক্তিকে পূর্ব্বাচরিত পুরুষকারের অপরিহার্য্য ফলবশে বাধ্য হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে সমগ্র দিন ও সমগ্র রজনী লিপ্ত করিয়া রাখিতেছ, যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা, ত্রিকালের প্রসবিতা, ত্রিগুণের জন্মদাতা, জ্যোতির্ম্ময় ও অদ্বিতীয়, তাঁর অপরিমেয় মহাশক্তির পদপ্রান্তে এই বুদ্ধিকে একটু একটু করিয়া লগ্ন করিবার অভ্যাস কর।

উপদেষ্টা, আচার্য্য, গুরু বা আদর্শরূপে যাঁহাকেই গ্রহণ কর, জানিও, সাধন তোমাকেই করিতে হইবে।"

রহিমপুর

২৭শে আষাঢ়, ১৩৩৯

দীক্ষা ও সমারোহ

গ্রামবাসী কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হইতেছে। একজন শ্রীশ্রীবাবার নিকটে কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন,—বিবাহে ত' হট্টগোল হবেই. কারণ এর ভিতরে সাত্ত্বিকতার প্রবেশাধিকার অনেক দিন থেকেই নেই। আমি দীক্ষাতে পর্য্যন্ত দেখেছি, রাশিকৃত লোকের হট্টগোল। শিষ্য দীক্ষা নেবেন, নিষ্ঠা ও ভক্তিবর্দ্ধক আচার অনুষ্ঠান কতকগুলি ত' বিপুল আড়ম্বর সহকারে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক প্রথানুসারে গুরুদেব করাবেনই, পরন্তু শিষ্য আবার পাঁচ শত নরনারী নিমন্ত্রণ ক'রে তাদের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভক্ষণ করিয়ে খাদ্য-সম্ভারের বাহুল্যের মধ্য দিয়ে নিজের ইষ্ট-নিষ্ঠাটাকে জাঁকালো ক'রে advertise (বিজ্ঞাপিত) ক'রে নিলেন। সাম্প্রদায়িক প্রথা দীক্ষা ব্যাপারটাকে যতটুকু জটিল করেছে, তার উপরে ত' আর কেউ কথা বল্‌তে পারে না। স্থলবিশেষে ও ব্যক্তি-বিশেষে শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি নিখুঁতভাবে বা জমকালোভাবে হওয়া শিষ্যের পক্ষেও মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু আড়ম্বর ক'রে লোক-খাওয়ানোর ভিতরে নাম-কেন্‌বার সখ ছাড়া আর কি আছে ?

বিবাহ জঘন্য হইয়াছে কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকে যতই ভুলে থাকুক, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিবাহটাও দীক্ষারই মতন একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, এটা নিতান্তই রক্তমাংসের ব্যাপার নয়। ব্রহ্মচারী ও ব্রতচারিণীদিগকে বিবাহ দেখ্‌তে নিষেধ করি কেন জানো ? এক একটা বিবাহোৎসবে যত নরনারী সম্মিলিত হয়, সবাই এটাকে বর-বধূর দৈহিক সম্বন্ধমূলক ব্যাপার ব'লেই জ্ঞান করে। স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য ক'রো। ওগুলি সব এই কথাটাকেই মনে রেখে

উদ্ভাবিত হয়েছে। এতে বিবাহের মর্য্যাদা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটী বর-বধূর বিবাহ হয়, আর ঐ উপলক্ষ ক'রে স্ত্রী-আচারাদির মধ্যবর্ত্তিতায় শত শত নরনারীর অন্তরে পরোক্ষভাবে দৈহিক লালসার নানাবিধ ইঙ্গিত প্রসারিত ক'রে দেওয়া হয়। এই জন্যই অনেকের চক্ষে বিবাহ একটা জঘন্য ব্যাপার।

বিবাহানুষ্ঠানের সংস্কার-সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিবেন,—বিবাহকে এই অপবাদ থেকে উদ্ধার করা দরকার। বিবাহ-অনুষ্ঠান থেকে স্ত্রী-আচারগুলিকে অপসারিত করা দরকার। যে যে অনুষ্ঠানাঙ্গ অশ্লীলতার ইঙ্গিত-প্রসারক, সেগুলিকে সংশোধন করা দরকার। বিবাহের বৈদিক মন্ত্রগুলির মহান্ ভাবকে সকলের চ'খের সামনে উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করা দরকার। গান-বাজনার উপরে আমি কাঁচি চালাতে চাই না, কারণ, বিশেষভাবে মেয়েদের কোনও আমোদ-প্রমোদে বাধা দেওয়া ততকাল উচিত নয়, যতকাল তারা গৃহাবরুদ্ধা। কিন্তু গানগুলি সুরুচিসম্পন্ন ও sublime (মহাভাবমূলক) হওয়া চাই, কতকগুলি erotic (প্রণয়মূলক) সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে শিশুদের কাণ কলুষিত করা কখনো সঙ্গত নয়।

বিবাহানুষ্ঠানের সংস্কারের অর্থনৈতিক দিক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বশেষে অর্থনৈতিক দিকেও সংস্কার-প্রয়াসকে পরিচালিত কত্তে হবে। বিবাহ এমন একটা ব্যয়-বহুল ব্যাপার যে, অনেক গরীব লোক টাকার অভাবেই সময়মত বিবাহ ক'রে উঠতে পারে না। এর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয়বিধ কুফলই সুপ্রচুর। যে হয়ত খেটে খুটে স্ত্রীর অন্ন অর্জ্জন কত্তে সমর্থ, সেও বিবাহের সময় একটা দিনে অনেকগুলি টাকা খরচ কত্তে হবে বলে সময়-মত বিয়ে ক'রে উঠ্‌তে পারে না। দীক্ষা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু বিবাহ শুধু ব্যক্তিগতই নয়, সামাজিক ব্যাপারও বটে। সুতরাং বিবাহে স্ব-সমাজের কতক লোক খাওয়াতে হবেই। মানে, এই বিবাহটার পশ্চাতে যে তাদের নৈতিক সমর্থন ছিল, এই কথাটা তাদের দিয়ে মানিয়ে নিতে হবেই। কিন্তু সে স্থলে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে

লঘু জলযোগের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। তাতে গরীব লোকের বিবাহ-বিভীষিকা অনেক ক'মে যাবে।

দীক্ষাগ্রহণ ও জাতি-কুল

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা গোমতীর তীরে তৃণাসনে বসিয়াছেন। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত জনৈক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে নানা আলোচনাদি হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি নিজেকে কোনও জাতি, কুল বা সমাজে আবদ্ধ ব'লে মনে করো না। দীক্ষা গ্রহণমাত্র তোমার উপর থেকে সব জাতির, সব কুলের, সব সমাজের বন্ধন কেটে গেছে। যা বন্ধনকে কাটে, তাই দীক্ষা। অন্ধকারই বন্ধনের স্থায়িত্ব বিধাতা। যা অন্ধকারকে দূর করে, তাই দীক্ষা। ভগবদিচ্ছায় তুমি যে-কোনও কুলকে পবিত্র কত্তে পার, যে-কোনও দেশকে ধন্য কত্তে পার, যে-কোনও সমাজকে কৃতার্থ কত্তে পার। তোমার জনক বা জননী যে-কোনও বংশ বা যে-কোনও সমাজের অবতংশ হোন, যে কোনও আচারাবলম্বী বা যে কোনও জীবিকা-পরায়ণ হোন, দীক্ষা মাত্রই তুমি অখণ্ড। তোমার জনক নেই, জননী নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জাতি নেই, কুল নেই।

রহিমপুর

২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৯

প্রকৃত কুশল

চাঁদপুর-জাফরাবাদ নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"কুশল সংবাদে সুখী করিও। কিন্তু কুশল বলিতে আমি কি বুঝি জান? তপস্যার অনুরাগই প্রকৃত কুশল, তপস্যায় বিরাগই যথার্থ অকুশল। সাধনে দিনের পর দিন তোমার রুচি কেমন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আমি জানিতে চাই। ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিয়া, স্ত্রী-জাতিতে মাতৃবুদ্ধি বজায় রাখিয়া, সর্ব্বজীবে শুভবুদ্ধি রক্ষা করিয়া কিভাবে তুমি নিজেকে দিনের পর দিন গড়িয়া তুলিতেছ, তাহাই আমি জানিতে চাহি। ভবিষ্যৎ ভারতের সৌভাগ্য-সুন্দর অদৃষ্ট-লিপি তোমাদের জীবন-মধ্যে কেমনভাবে লিখিত হইয়া যাইতেছে, আমি তাহাই

জানিতে চাহি। কারণ, তোমরাই ভারতের সমগ্র ভবিষ্যতের অদ্বিতীয় নির্ম্মাতা। তোমাদের জাগ্রত তপস্যায় দেশ উঠিবে, তোমাদের নিঃসংজ্ঞ তন্দ্রায় দেশ ডুবিবে।"

ভুলিও না

জাফরাবাদ নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তপঃসাধনের মঙ্গলময় পথে দিনের পর দিন বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতেছ ত? যে অগ্রসর হয়, জগতে সেই পূজ্যস্থান অধিকার করে, পরবর্ত্তীদের আদর্শ-স্থানীয় হয়। আলস্যের পুঞ্জীকৃত বিষাদ আননে মাখিয়া যাহারা হস্ত-পদ থাকিতে পঙ্গু ও চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া বসিয়া রহে, জগতে তাহাদের জন্য কোনও কল্যাণ নাই, কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। হে পুত্র, নিত্যকল্যাণের তুমি অধিকারী, ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠায় তোমার আজন্ম অধিকার। তুমি আজ আলস্যে ভর করিয়া অবসাদ-কালিমা-গ্রস্ত নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিতে মোটেই রুচিমান হইও না,—প্রবল পৌরুষে অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তোল, বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী কাঁপাও, বীরপদভারে ধরণী টলমল করুক। হে সাধক, ভগবানের অমৃতময় নাম ভুলিও না, ব্রহ্মচর্য্যের মহাব্রত ভুলিও না, আত্মমর্য্যাদাবোধ ভুলিও না।

নিজের শক্তি ও পরমাত্মার শক্তি

চাঁদপুর-শ্রীরামদী নিবাসী একজন ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য পালনে খুব দৃঢ় থাকিবে। দুর্ব্বলতাকে অন্তরের কোণেও ঠাঁই দিবে না। নিজের সমস্ত শক্তি জাগাইয়া তুলিয়া অসংযত চিন্তার বিরুদ্ধে উদ্যত করিবে। যখন নিজের শক্তিকে অপ্রতুল ও অসমর্থ বলিয়া অনুভব করিবে, তখন পরমাত্মার অপরিমেয় শক্তির শরণাপন্ন হইবে।

"মঙ্গলময় ভগবানের পরমমধুর পবিত্র নাম এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হইওনা,—এক নিমেষের জন্যও নয়। নামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া তোমার মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মতেজকে জাগাইয়া তুলিবে এবং সকল কামনা-বাসনার সুগহন খাণ্ডবারণ্যকে ডালে-মূলে দগ্ধ করিবে, ধ্বংস করিবে। নাম করিতে করিতে চিত্তে বিমল প্রেমের অভ্যুদয় হইবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার আপন হইবে।"

আত্মগঠন ও পর-সংশোধন

শ্রীরামদী-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রত্যেকের সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ হইবার প্রয়োজন আছে; যেহেতু, তোমাদের দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী কিশোরদের চরিত্র ও আচরণকে অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে। মুখে উপদেশ না দিলেও তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠা, সংযম-পরায়ণতা, জীবন-গঠন-প্রচেষ্টা নিরতিশয় সংগুপ্ত ভাবে এবং অপ্রত্যাশিতরূপে ইহাদের জীবন-পোতে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের কার্য্য করিয়া যাইবে। তোমারও মানুষ হইবার প্রয়োজন আছে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশটাকে মনুষ্যত্বের বিমল বিভায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবারও দায়িত্ব তোমার রহিয়াছে। তোমার আত্মগঠন শুধু তোমার একারই জন্য নহে, সমগ্র দেশের মঙ্গলার্থে। আত্মগঠন-ফল দেশকেই দিতে হইবে।

"আমি নিশ্চিতরূপে জানি, আত্ম-প্রচার নিরর্থক। নিজেকে সংশোধনই পরকে সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। নিজেকে গড়িয়া তোলাই পরকে সুগঠিত হইতে বাধ্য করার উৎকৃষ্টতম সঙ্কেত।

"কিন্তু আত্মগঠনের সমগ্র মূলদেশ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অকপট, একাগ্র, নিষ্ঠাশীল ভগবৎ-সাধনার মধ্যে। ভগবৎ-সাধনার স্নিগ্ধ-জোছনা জীবনের রুক্ষ, কঠোর, কর্কশ সংগ্রামগুলিকেও সহনীয় ও সহজ করিয়া দেয়। ভগবৎ-সাধনায় ডুবিয়া যাও এবং সাধন-সমুদ্রের তলদেশ হইতে নির্ভরের অমঙ্গল-বিনাশী মহারত্ন উত্তোলন করিয়া উঠিয়া আইস। নির্ভরই তোমাকে অজেয় করিবে। অমৃতময় অখণ্ড-নাম একটী দিনের জন্যও ভুলিও না, একটী মুহূর্ত্তের জন্যও না।"

শিষ্য, সাধন, গুরু ও পরমগুরু

ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমরা কেহই সাধন কর না, অথচ স্বরূপানন্দের সন্তান বলিয়া একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছ। এইরূপ শিষ্যদের দ্বারা জগতে কোনও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে না। জীবনটাকে সত্যিকার একটা সার্থকতা দিতে হইলে সাধক বলিয়া পরিচয় দিবার আগ্রহ হইবার আগে সাধন করিবার আগ্রহ হওয়া

কর্ত্তব্য। অসাধক শিষ্যের আচার্য্যত্ব করিতে গিয়া আমারও বুদ্ধি স্থূল এবং জীবন অসার্থক-বাহুল্য-ভূয়িষ্ঠ হইয়া পড়িবে। অতপস্বী শিষ্যের সমাজে মহাতপস্বী গুরুও ব্রহ্মবিদ্যার জ্যোতিঃ বড় একটা বিকীর্ণ করিতে পারেন না। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে সমগ্র মনঃপ্রাণ একমাত্র পরমাত্মার দিকে উন্মুখ করিবার জন্য ইচ্ছুক রহিয়াছি।

"শিষ্য যদি গুরুকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পরমাত্মাকে না ভোলে, আমি কিন্তু তাহাকেও পূজা করি। গুরু যদি শিষ্যকে ভুলিয়া যান, পরমাত্মাকে না ভুলেন তবে তাঁহাকেও আমি কর্ত্তব্যচ্যুত মনে করি না। কারণ পরমাত্মাই পরম গুরু, তাঁহার সেবাই সদ্‌গুরুর সেবা এবং গুরুর ব্রহ্মনিষ্ঠাই শিষ্যের সকল মঙ্গলের মূল,—গুরুদেবের চরণ-কমলের রাতুল সৌষ্ঠব নহে, পৌরজন-মনোহারিণী বচন-মাধুরী নহে, জটাজুটশোভিত পিঙ্গল শির কিম্বা স্ফীতোদরও নহে।"

ভাষা ও ভাব

গ্রামের বিবাহে যে সকল বরযাত্রী আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন আশ্রমে (প্রভাত-ভবনে) শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনার্থে দ্বিপ্রহর বেলা সমাগত হইলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পরে নানা সৎ-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাষার উদ্দেশ্য ভাব-প্রকাশ। ভাষা আমার ভাব তোমার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যায়, শুধু তাই নয়, ভাষা ভাবোদ্যানের পুষ্প-চয়নেরও সহায়ক। একটা শব্দ উচ্চারণ কর্লে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবের প্রকাশ হয়, ঐ শব্দটাই বারংবার উচ্চারণ কর্লে নব নব ভাবের উন্মেষ ঘট্‌তে থাকে। মন্ত্র-জপ ব্যাপারটীর মর্ম্মও ত' এই-ই। একটা মন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবকে suggest (লক্ষিত) করে। কিন্তু মন্ত্রটী বারংবার অভিনিবিষ্ট চিত্তে জপ্‌তে জপ্‌তে সেই একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবের ভিতর থেকেই শত সহস্র অনুভাবের বিকাশ ঘট্‌তে থাকে, এমন সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হ'তে থাকে, যা বাহ্যতঃ কখনো অনুমানও করা চলে নাই। সুতরাং একথাই স্বীকার কর্ত্তে হয় যে, ভাষা ভাবের ধারক, প্রকাশক, বাহক ও পথ-প্রদর্শক। আবার ভাব ছাড়া ভাষাও

হয় না। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে কোনও শব্দ মনুষ্যকণ্ঠে যখনি উচ্চারিত হোক্ না কেন, একটা ভাব তার সঙ্গে থাক্‌বেই থাক্‌বে। সব সময়েই যে সেটা অপরের নিকটে communicable (অবগমনযোগ্য) হবে, তার কোনও মানে নেই, কিন্তু ভাব একটা থাক্‌বেই।

ভাবে বড় জাতিই যথার্থ বড়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে জাতি ভাবে বড়, সেই জাতিই যথার্থ বড়। কারণ, সাত্ত্বিক পথে ভাব যখন প্রগাঢ়, তখন সৃষ্টি করে সিদ্ধমানবের ; রাজসিক পথে ভাব যখন প্রগাঢ়, তখন সৃষ্টি করে দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মীর ; তামসিক পথে ভাব যখন প্রগাঢ়, তখন সৃষ্টি করে, রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শের বস্তুতন্ত্র পূজারীর। এদের দিয়েই জগতের কাছে এক একটা জাতি বড় হয় ; অবশ্য ভাবের চর্চ্চা যখন তামসিক পথে চলে, তখন প্রকারান্তরে সেই জাতিকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়, তবে নিবে যাবার আগে তৈল-প্রদীপের মতন একবার পৃথিবী চমকিত করে দিয়ে, জাতিটা কবিত্বে, শিল্পে, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায়, প্রসাধনে, বিলাসিতায়, অঙ্গরাগে অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়ে নেয়।

ভাবের বাজারে চাঁদি ও সোনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাবের মহত্ত্বই জাতির মহত্ত্ব। কারণ, ভাবের মহত্ত্বই কর্ম্মের মহত্ত্বকে সম্ভব করে ও সূচনা দেয়। আবার ভাব ভাষার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশিতও করে, প্রবর্দ্ধিতও করে। এই জন্যই ভাবের বাজারে বিকিকিনি কত্তে চাঁদির টাকা আর সোনার মোহরই ব্যবহার করা সঙ্গত। কিন্তু কড়ির কি ব্যবহার থাক্‌বে না ? থাক্‌বে, কিন্তু তা গরীব লোকের জন্য। অবশ্য, জগতে গরীব লোকই বেশী, ধনী অল্প। কিন্তু যে দেশ বড় হ'তে চায়, মহৎ ব'লে পরিচয় দিতে চায়, তার পক্ষে প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে গরীবের গরীবত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া। গরীবের গরীবত্বকে বিনা প্রতিবাদে নতমুখে মেনে নেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

মহত্তম ভাবের সহিত মহত্তম ভাষার সমন্বয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেকটী লোককে জগতের মহত্তম ভাবগুলির সঙ্গে

পরিচিত কত্তে হবে। সুতরাং মহত্তম ভাব-প্রকাশের যোগ্য ভাষার সঙ্গেও পরিচিত কত্তে হবে। কন্দর্পকান্তি পুরুষের সাথে একটী কাণা মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেমন ব্যাপার, সুন্দরতম ভাবের সাথে একটী খোঁড়া ভাষার সংযোগ-সাধনও তদ্রূপ ব্যাপার। বাংলা দেশের বর্ত্তমান মনীষীরা এই বিষয়ে খুব অল্প চিন্তাই দিচ্ছেন। তার ফল হয়ত ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার উপর দিয়েই যাবে। সময় থাকৃতে যে পথে আসে না, অসময়ে তাকে হাহাকার কত্তে হয়।

লেখকের লক্ষ্য ও পাঠকের দাবী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ম্যাক্সমূলার বলেছিলেন যে, ভাষা-চর্চ্চার মূল্য কি, যদি তার সামনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য না থাকে? "what would the science of language be without missions?" হাজারে হাজারে বই বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা করা উচিত, কেন লোকে এসব বই লিখ্‌ছে? অবসরের চিত্ত-বিনোদন? নাম-যশ কুড়ানো? ব্যক্তিগত আত্মোন্নতি? সমাজোন্নয়ন? কোন্‌টা এর লক্ষ্য? না এসব একেবারে লক্ষ্যহীন? যারা বই পড়ে, তাদের একথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তারা তাদের এ অধিকারকে প্রয়োগ করে না। লেখক যে বই লেখে, তার উপর পাঠকের কি দাবী আছে বা থাকা উচিত, একথা পাঠকের চিন্তা করা উচিত। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন কতকগুলি আবর্জ্জনা-স্তূপ সৃষ্টি ক'রে তার নীচে পাঠককে চাপা দেবার অধিকার লেখকের নেই।

কদর্য্য সাহিত্য জাতির লজ্জা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক একটা যুগের সাহিত্য সেই যুগের মানুষগুলির মনের মুকুর হ'য়ে জগতের প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত হ'য়ে থাকে। দুর্ব্বল, বিলাস-ব্যসনী সাহিত্য দুর্ব্বল জাতীয়-মনোভাবের সাক্ষিরূপে সেখানে অবস্থান করে। নিকৃষ্ট সাহিত্য জাতির জন্য ধিক্কারের সৃষ্টি করে। কদর্য্য সাহিত্য জাতির লজ্জা, জাতির অপমান, জাতির অধঃপাত।

সাহিত্য ও জাতির ভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাহিত্য যেমন জাতীয় মনের মুকুর, সাহিত্য তেমন

জাতির ভাগ্যলিপি। অপরিচ্ছন্ন সাহিত্য অপরিচ্ছন্ন জাতিই সৃষ্টি করে। ধোঁয়াটে সাহিত্য, ধোঁয়াটে জাতিই সৃষ্টি করে। পবিত্র, বলিষ্ঠ, তেজস্বী সাহিত্য পবিত্র, বলিষ্ঠ, তেজস্বী জাতিই সৃষ্টি করে। জাতিকে যদি মানুষ ব'লে পরিচিত কত্তে হয়, তবে তাকে এমন সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসার সাধন কত্তে হবে, যার উদ্ভব জাতীয় আত্মসম্মান-বোধ থেকে, পরন্তু পরাজিতের মনোবৃত্তি থেকেও নয়, ভোগলালসার অন্ধ প্ররোচনা থেকেও নয়। সেইটীই হচ্ছে ভাগ্যবান্ জাতির সাহিত্য, যা প্রথমেই দেয় জ্ঞান, পরে দেয় কর্ম্মসামর্থ্য। কুৎসিত কদর্য্য অসুন্দরের জ্ঞান নয়, সত্য, শিব ও সুন্দরের জ্ঞান,—আত্মহত্যার সামর্থ্য নয়, আত্মরক্ষা, পররক্ষা ও বিশ্বরক্ষার সামর্থ্য।

রসানুভূতি অভ্যাস-সাপেক্ষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রসানুভূতির কথা উঠবে। কিন্তু রসানুভূতি ব্যাপারটী ত' প্রধানত অভ্যাস-মূলক। কয়েকটী দিন কষ্ট ক'রে যে ক্রমান্বয়ে মদ খায়, মদের নেশার রসাস্বাদ সেই কত্তে পারে; প্রথম যে খায়, তার ত' গলাজ্বালা, বুকজ্বালা ও মাথাঘুরাণিই সার। রোজ মিশ্রির সরবৎ খাচ্ছ, কিন্তু কতটা রস যে ওতে অনুভব করা সম্ভব, তা কি কখনো ভেবে দেখেছ? অভ্যাস ক'রে দেখ, মিশ্রির সরবতের মাঝেই কত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। দুই দিকেই ব্যাপারটা অভ্যাস-সাপেক্ষ। রসানুভূতির জন্য বঙ্গ-বাণীর পূজারীদের চোখ শুধু উল্লসিত স্তন আর স্খলিত বসনই খুঁজে বেড়াবে, একি তাজ্জব ব্যাপার? একটু অভ্যাস করলে অন্য দিকেও রসের অনুভূতি সম্ভব। যৌন রসই রস, অন্যত্র আর রস নেই, এ'ত নিতান্ত পাগলের অথবা অন্ধের উক্তি। একটা মহাজাতির ভবিষ্যৎ কি একদল পাগল বা অন্ধ মিলেই নির্দ্ধারণ ক'রে দেবে? ক্লীবের মত একটা জাতি তাই আবার নতশিরে মেনে নেবে?

দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা বনাম সাহিত্যিক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা যদি শাসনযোগ্য হয়, সাহিত্যিক উচ্ছৃঙ্খলতা ত' তাহলে ততোধিক অমার্জ্জনীয়। একটা লোকের দৈহিক অনাচার তাকে ও তার সমসাময়িক সঙ্গীদিগকে কলুষিত করে। একটা

লোকের সাহিত্যিক অনাচার পরবর্ত্তীদের ভিতরেও কামুকতা, পাপ, পঙ্কিলতা ও কলঙ্ককে প্রসারিত করে। যেখানে এরূপ অনাচারের সাথে প্রতিভার সংযোগ ঘটে, সেখানে ত' মহামারীর বীজ বপন করা হ'য়ে গেল। প্রতিভাহীন পঙ্কিল মন রাস্তা-ঘাট নোংরা করে, প্রতিভাবান্ পঙ্কিল মন আকাশ-বাতাস নোংরা করে।

ভাষা বার-বিলাসিনী নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাষা কি বার-বিলাসিনী? লোকমনোরঞ্জনের জন্যই তার অস্তিত্বকে বজায় রাখ্‌তে হবে? গণিকামূর্ত্তি ছেড়ে সান্ত্বনা-দাত্রী, স্নেহ-দাত্রী, শুশ্রূষাদাত্রী, আরোগ্যদাত্রী কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সে এসে দাঁড়াবে না? সজ্জনের সে সংখ্যা-বৃদ্ধি কর্ব্বে না, অসজ্জনকে সে সজ্জনে পরিণত কর্ব্বে না? সম্ভোগপ্রিয় ব্যক্তিদের হাতে প'ড়ে সে চিরকাল তার মহিমার কথা ভুলে থাক্‌বে? পরিচ্ছন্ন চিন্তার ভিত্তিমূলে এসে দিব্য স্ফূর্ত্তির অট্টালিকা-রূপে অভ্র-রাশি ভেদ ক'রে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে সে কখনো নিখিল জগৎকে অমৃতের ছাদ-ছায়া-তলে আশ্রয় ও অভয় নিতে ডাক্‌বে না?

সাত্ত্বিক দান

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা গোমতীর তীরে আসিয়া বসিয়াছেন। "নদীর স্রোত অবিরাম বহিতেছে, বিরাম নাই, তোমারও প্রাণের প্রেমের স্রোত এইরূপ অবিরাম প্রবাহিত হউক,"—এই মর্ম্মে কয়েকজন জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দিয়া সন্ধ্যা সমাগমে আশ্রমে (প্রভাত-ভবনে) ফিরিয়া আসিতেই দেখিলেন, বস্ত্রাভাব দূর হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিপিন সাহা গোপনে আশ্রম-কর্ম্মী র—র নিকট একখানা নববস্ত্র দিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা সমস্ত অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চোরের মত দানই সাত্ত্বিক দান।"

আজ হইতে গামছা পরিধান বন্ধ হইল।

রহিমপুর
২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৯

আত্মসুখ-কামনা ও আশ্রমগঠন

ত্রিপুরা জেলার কোনও একটী আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"আশ্রম ও মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যে যত প্রতিষ্ঠা কর, ততই ভাল। তোমার মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল, উভয়ের মঙ্গল ইহাতে হইতে পারিবে। কিন্তু সেবা-বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া যদি সুখ-ভোগাদি-লিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হও, তবে এই সু-প্রতিষ্ঠানও তোমার জন্য অপ্রতিষ্ঠাই আনিয়া দিবে। যাহার প্রতিষ্ঠা করিলে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠা মিলে, তাহাই প্রতিষ্ঠান। একথা ভুলিয়া থাকিয়া মঠাদি স্থাপন ও পরিচালন দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের পক্ষে একটী ঘোরতর বিড়ম্বনা বলিয়া জানিও। প্রতিক্ষণই নিজ চিত্ত-বৃত্তির গতিকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আরামের লোভ কি রহিয়াছে? নাম-যশ কুড়াইবার কামনা কি আছে? ব্যক্তিগত আরাম হয়ত চাহ না, কিন্তু নাম-যশ চাহ। ইহা ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে, তোমার ভিতরে ক্ষুদ্র সুখের লোভ রহিয়াছে আর সেই লোভই প্রতিষ্ঠান-সেবার মুখস পরিয়াছে, তবে চিত্তের স্বার্থপরা বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করার দিকেই তোমার সমগ্র চিন্তা ও চেষ্টাকে আগে নিয়োজিত করা আবশ্যক। যে পরকল্যাণ পরমকল্যাণের বিঘ্ন, যে পরকল্যাণ আত্মকল্যাণের শত্রু, যে পরকল্যাণ আত্ম-সুখের কামনার প্রচ্ছন্ন রূপ মাত্র, যে পরকল্যাণ ছদ্মবেশী আরামপ্রিয়তা, সুখলুব্ধতা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণশীলতার সূক্ষ্মতর রূপান্তর মাত্র, সেই পরকল্যাণ কমিয়া গিয়া আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা অধিকতর হিতকর। এই বিষয়ে যার দৃষ্টি তীব্র তীক্ষ্ণ সজাগ, মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার পক্ষে সেই যোগ্যতম ব্যক্তি।

"কিন্তু যে ব্যক্তি যোগ্যতম নয়, সে মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে না, তাহা আমি বলিতেছি না। নিজের আরাম চাহিতে গিয়াও অনেক সময়ে সদনুষ্ঠানের সংশ্রবে আসিয়া মানুষ আত্মস্বার্থজিৎ হইয়া থাকে। নিজের মান-যশ খুঁজিতে যাইয়া যশের তাড়নাতেই অনেক সময়ে মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন যশ বা কীর্ত্তি অর্জ্জন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইরূপ যোগাযোগ অল্পই দেখা যায়। এজন্যই তোমাকে সাধনের বলের উপরে নির্ভর করিতে বেশী উৎসাহ দিতে চাহি।

মহাত্যাগী তুমি, কাল হয় ত সমাজ-সেবার দোহাই দিয়া মহাভোগীতে পরিণত হইবে; লোকে টিট্‌কারী দিবে, কিন্তু তুমি তোমার ভ্রমকেই অভ্রান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যত্নশীল হইবে। সাধনে রুচি কমিলে, ভগবানের দিকে দৃষ্টি শিথিল হইলে, এরূপ কখনও কখনও কাহারও কাহারও জীবনে ঘটিতে দেখা যায়। ইহা নিতান্তই অঘটন নহে। সুতরাং প্রাণপণ যত্নে সাধনশীল হও। সাধক পুরুষ পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়ান, ভ্রম করিলেও সহজেই সব সংশোধন করেন। বিশ্বামিত্র এই বিষয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।"

মনের বায়ু পরিবর্ত্তন

কুমিল্লা হইতে আগত একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। তাঁহার সহিত কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারের দারুণ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মাঝে মাঝে এসে আশ্রমবাস করা খুব ভাল। অনেকদিন এক জায়গায় থাক্‌লে যেমন শরীরের হিতের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন দরকার, অনেকদিন সংসারে থাকলেও তেমন মনটাকে জীরিয়ে নেবার জন্য ভিন্নতর পরিবেষ্টনের মধ্যে অবস্থান করা দরকার। এই হিসাবে আশ্রমবাস খুবই ভাল। এখানে এসে ভোজ্য-পানীয় প্রচুর না পেতে পার, কিন্তু মনের ক্লান্তি দূর হবে।

কোদাল-মারার শেষ?

মূলগ্রাম হইতে একটী ভক্ত যুবক শ্রীশ্রীবাবাকে একবার শিবপুর যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। তাহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—১৩৩৯এর ২৩শে শ্রাবণ আমার অভিক্ষার দ্বাদশ বর্ষ শেষ। অভিক্ষা অবশ্য ছাড়ব না, কিন্তু তারপর থেকে কোদালমারা হয়ত ছেড়ে দিব।

রহিমপুর
৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৯

চক্রান্তে পড়িয়া দীক্ষা

ঢাকা-মাইজপাড়া নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"লোকের চক্রান্তে পড়িয়া অযোগ্য পাত্র হইতে দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য হইয়া-

ছিলেন শুনিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। শাস্ত্রে গুরুকরণের পূর্ব্বে গুরু-পরীক্ষার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যগণ আবেগের আধিক্যহেতু এবং গুরুগণ শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির লোভহেতু এই মহামূল্য উপদেশে উপেক্ষা করিয়া আধুনিক ধর্ম্মজগৎকে কলঙ্ক-সঙ্কুল ও প্রবঞ্চনা-ভূয়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, যাহাকে আপনার পথ-প্রদর্শনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার প্রতি কিংবা তাহার উপদেশের প্রতি কোনও প্রকার বৃথা-মমত্ব-বুদ্ধি না রাখিয়া ঈশ্বর-কৃপানুগত ভুজ-বিক্রমে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। প্রবল পুরুষকার আপনাকে ঐশ্বরিকী কৃপার রসাস্বাদন করাইবে। দীক্ষাদাতার মূর্ত্তিধ্যান অথবা গুরুপত্নীধ্যান নিষ্প্রয়োজন। শিশুদের খেলা করিবার জন্য শিশু-পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়েরা এই সকল খেল্না সাধন-মন্দিরের সিংহ-দুয়ারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র। অক্ষম শিশুর জন্য যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সজ্ঞান মানবের তাহা গ্রহণীয় নহে।”

স্থূল পঞ্চ-মকার

ঐ পত্রে শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

“তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে কৌলমতানুযায়ী যে স্থূল সাধন আপনি করিয়াছেন, তাহাও বৃথাশ্রম ব্যতীত কিছুই নহে। কারণ, স্থূল পঞ্চ-মকার সাধন ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাই মাত্র বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকার সাধন ব্যতীতও অতি সরলভাবে সহজ পথে সংযম-সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা ও ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা যায়। মানব-মনের ইন্দ্রিয়-সুখ-লোভাতুর নীচ প্রবৃত্তিকে সদ্বস্তুর দোহাই দিয়া কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিবার চেষ্টারই নাম পঞ্চ'ম'কার সাধন। কিন্তু তন্ত্র-সাধনার ইতিহাস এবং জাতির উপরে তাহার স্থায়ী ফলাফল অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে যে, পঞ্চ-'ম'কারিগণের অত্যদ্ভুত ও অসমসাহসিক অধ্যবসায় অল্প স্থলেই সিদ্ধি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে।”

শব্দ-যোগ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

“পরবর্ত্তী যে সম্প্রদায়ের কথা আপনি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে কিরূপ

উপদেশ পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ অবগত নহি। ইঁহারা শব্দ-যোগী বলিয়া আমি শুনিয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের সাধন-প্রণালীর সহিত পরিচয় স্থাপনের সুযোগ এবং ঔৎসুক্য ঘটে নাই। নাদই ব্রহ্ম, ইহা এক সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। নাদকেই আমরা প্রচলিত ভাষায় "নাম" বলিয়া থাকি। নাদের সহিত পরব্রহ্মের অভেদত্ব মনন-পূর্ব্বক ইহার সঙ্গ করিলে ইহাই পরব্রহ্মের সঙ্গসুখ প্রদান করে। এই জন্যই নামের এত সমাদর। খ্রীষ্টান মিশনারীদের মুখে যুক্তি শুনিয়াছি,—'চিনি' 'চিনি' বলিয়া জপ করিলে চিনি আসিয়া মুখের নিকট হাজির হয় না—অতএব নামজপ করার মত বাতুলতা আর কিছু নাই। কিন্তু চিনির কথা চিন্তা করিলে জিহ্বায় যে-কোনও ব্যক্তি চিনির আস্বাদন পাইতে পারে, যদি মনটাকে একটু একাগ্র করিয়া নামটা স্মরণ করিতে পারে। অন্ততঃ আমি ত' চিনি বলিতে চিনির স্বাদ, তেঁতুল বলিতে তেঁতুলের স্বাদ সঙ্গে সঙ্গে পাই।—নামের সঙ্গই যথার্থ সৎসঙ্গ এবং নামের রসাস্বাদনই ব্রহ্ম-রসাস্বাদন।"

ওঙ্কার সর্ব্বনামের সম্রাট

ঐ পত্রে শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"ওঙ্কারই সকল নামের সম্রাট। এই নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। ইহাই সর্ব্ব-দুঃখের হারক, সকল অজ্ঞানতার অপসারক এবং দুঃখময় পুনর্জ্জন্মের নিবারক। এই বিষয়ে নিজে নিজে আপনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই পরম-মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত। এই নামের সহিত অন্য কোনও নাম সংযুক্ত করিয়া আল্লা-হরিবোলের গণ্ডগোলে পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই। একমাত্র মহানাম ওঙ্কার যাহাকে দুঃখজাল হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না, সহস্র মন্ত্র গুলিয়া খাওয়াইলেও তাহার আর উদ্ধার নাই। কণামাত্র পূর্ব্ব-সংস্কার না রাখিয়া, অতীতকে বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়া পুনরায় অমোঘ পরাক্রমে একমাত্র ওঁ-কার সাধনায় প্রবৃত্ত হউন।"

সাধন-ভজন ও আমিষ-নিরামিষ

উক্তপত্রে শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"সাধন-ভজনের সঙ্গে আমিষ-নিরামিষ আহারের গুরুতর সম্পর্ক কিছু নাই। দ্রব্যগুণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু মানুষ আহারীয়রূপে যতগুলি বস্তুর নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এইরূপ বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাচিত যে, অল্পমাত্রায় সেবনে তাহার অধিকাংশই কোনও উল্লেখযোগ্য অনিষ্ট করিতে পারে না এবং যে অনিষ্টটুকু করিতে পারে, তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তিও মানুষ চেষ্টা-যত্ন দ্বারা নিজ দেহ ও মনে উন্মেষিত করিয়া লইতে পারে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে,—

'এক মছ্‌লি খায়,
কোটি গো-দান করে
তব্‌ভি পাপ নাহি যায়।'

যদি মছলী খাওয়ার পাপ কোটি গো-দানে না যায়, তাহা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে, গো-দানের মূল্য কয় কড়ি? মছলি খাইলে যদি ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর অপেক্ষা মছলীর গায়ে জোর বেশী। আসল কথা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জনপদের আবহাওয়ার পার্থক্য-হেতু এবং খাদ্যাদির সুলভতার ও দুর্লভতার তারতম্যানুসারে আহারীয় বস্তুর বিচারেও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে দেশে বা যে বংশে যে বস্তু দীর্ঘকালের অভ্যস্ত, তাহা পরিমিতভাবে গ্রহণ করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনও প্রকার অমঙ্গল হয় না। কিন্তু হায়! নিজ নিজ মতের প্রাধান্য-সংরক্ষণে সমুৎসুক যুধ্যমান ধর্ম্মপ্রচারকদের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার-দৃষ্টি রক্ষা করা কতই কঠিন! আপনার জন্য আমি বলিতেছি, আপনি মাছ-মাংস নির্ভয়ে খাইবেন, কিন্তু পরিমিতভাবে খাইবেন, প্রয়োজনমত খাইবেন এবং অপ্রয়োজনে বর্জ্জন করিবেন। এক টুকরা মাছ খাইলে যদি কাহারও ব্রহ্মচর্য্য টুটিয়া যায়, তবে তাহাকে ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা না দিয়া 'ঠুন্‌কো কাচ' বলা ভাল। ব্রহ্মচারী ভোগ-সংস্পর্শ বর্জ্জন করিবেন, ইহাই তাহার প্রধান কথা। যে দেশে দুধ মিলিবে না, ঘৃত দুষ্প্রাপ্য, পুষ্টিকর আটা-সুজী জন্মায় না, সে দেশের লোক

দরকার হইলে মাছ খাইয়াই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। মছলী-খোরকে হিন্দুস্থানীরা ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর ঘৃণা করিবেন না।"

চট্ করিয়া সর্ব্বত্যাগ

চট্টগ্রাম-ধুম-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"হঠাৎ উত্তেজনার বশে বা আত্ম-পরীক্ষা না করিয়া অর্থাৎ নিজের প্রকটিত ও প্রচ্ছন্ন সকল সংস্কারের ওজন না বুঝিয়া চট্ করিয়া সর্ব্বত্যাগের পথ যে শিষ্য আশ্রয় করে, তাহাকে যেমন অধিকাংশ সময়ে নিজ হঠকারিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়, যে গুরু এইরূপ শিষ্যকে আত্ম-গঠনের, আত্ম-প্রস্ফুটনের, আত্ম-বিশ্লেষণের ও আত্ম-পরিচয়-লাভের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান না করিয়া গৈরিক পরিবার কষ্টলভ্য অধিকার প্রদান করেন, তাহাকেও তেমন অনুতপ্ত হইতে হয়। প্রাণে যদি ত্যাগ জাগিয়া থাকে, নিশ্চিন্ত থাক, তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহই তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

অসৎকথা, সৎকথা ও সৎকার্য্য

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা মুরাদনগরের দিকে বেড়াইতে গেলেন। গ্রামের কতিপয় যুবক সঙ্গ লইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—অসৎকথা শোনার চাইতে কিছু না শোনা ভাল। কিছু না শোনার চাইতে সৎকথা শোনা ভাল। প্রচুর সৎকথা শুনেও কোন সৎকার্য্য না করার চাইতে অল্প সৎকথা শুনে অল্প সৎকার্য্য করা ভাল। সৎকথা যদি না মজ্জাগত হয়, তবে তা তোমাকে সৎকার্য্য কত্তে বাধ্য কত্তে পারে না। এজন্যই সৎকথা যাতে একেবারে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জার সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে যেতে পারে, তেমন ভাবে তার সুগভীর অনুশীলন প্রয়োজন।

সৎকথাকে মজ্জাগত করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাঠাভ্যাস যাতে নিখুঁত হয়, তার জন্য কি করা প্রয়োজন জানো? প্রথম প্রয়োজন বারংবার অভ্যাস, বারংবার আলোচনা'

তারপরে প্রয়োজন অপরকে শিক্ষাদান। চতুষ্পাঠীর বড় ছেলেরা যেমন ক'রে অভ্যস্ত পাঠ আবার ছোট ছেলেদের পড়ায়, তেমনি ক'রে শোনা সৎকথা বারংবারমনে মনে আলোচনা করার পরে অপরকে আবার তা শুনান হচ্ছে সৎকথাকে মজ্জাগত করার উৎকৃষ্ট উপায়। যে সৎকথাটীকে নিজে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছ, জগতের কাছে তা প্রচার কর্লে, বারংবার ঘোষণা কর্লে, তা দ্বারা তোমারই নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে জগতের ত' হিত-সাধনের সম্ভাবনা আছেই।

প্রচারকের গুরুত্বাভিমান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু গুরুগিরির ভাবও এসে যেতে পারে। সেই বিপদটী সম্বন্ধে অন্ধ থাক্‌লে চল্‌বে না। প্রচার ক'রে তোমার নিষ্ঠা বাড়্‌বে, এইটাই প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রচারের দ্বারা তুমি জগতের সেবা কর্ব্বে, সেটা তার পরের কথা। আবার ভাবা উচিত, এই বিশাল জগতে তুমি কে যে, জগৎকে উপকৃত কর্ব্বার স্পর্দ্ধা রাখ? আত্মকল্যাণ করার জন্যই সৎকথার প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছ, এই বুদ্ধি যদি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাহ'লে গুরুত্বাভিমান আসে না এবং প্রচারের ভঙ্গীও বড় নিরীহ হয়।

সেবা-বুদ্ধি প্রণোদিত প্রচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবাবুদ্ধি নিয়েও প্রচারকার্য্য চল্‌তে পারে। কোনও একটী সৎকথার অন্তর্নিহিত তত্ত্বে তোমার গভীর নিষ্ঠা এসেছে, সুতরাং নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য আর প্রচারের হয় ত' আবশ্যকতা নেই। সেই স্থলে সেবাবুদ্ধি নিয়ে প্রচার চল্‌তে পারে। যে সৎকথা শু'নে, যার তত্ত্ব মনন ক'রে তুমি প্রাণভরা আনন্দ পেয়েছ, তা শু'নে, তার তত্ত্ব-মনন ক'রে পাপী নিষ্পাপ হোক্, তাপী নিস্তাপ হোক্, শোকগ্রস্ত অপগতশোক ও ভীতিগ্রস্ত অপগতভয় হোক্, সকলের শুষ্কমুখে সুখের হাসি ফুটুক, এইরূপ সেবাবুদ্ধি নিয়ে, এইরূপ প্রেমময় অভিপ্রায় নিয়ে প্রচার-কার্য্য তুমি পরিচালন কত্তে পার। কিন্তু কোনও অসাধক ব্যক্তির পক্ষে এইটী আশা করা সুকঠিন। সুতরাং প্রচার-কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ার কেউ যদি আবশ্যকতা অনুভব করে, তবে সর্ব্বাগ্রে তাকে সাধক

হ'তে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, নীরব সেবা সশব্দ সেবার চেয়ে বেশী দামী। সাধন-ভজনের দিকেই সমগ্র মন-প্রাণ দেবে, তবে ক্ষেত্র বুঝে এবং অবস্থার উপযোগ বুঝে প্রচার করাও সময় সময় চল্‌তে পারে।

রহিমপুর

৩১শে আষাঢ়, ১৩৩৯

শিষ্য-সংগ্রহের বাতিক

দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক প্রিয় কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"যারা আমার জিনিষ, তারা আমার কাছে আজ হৌক, কাল হৌক, আসিবেই। এই বিশ্বাস আমার এত দৃঢ় বলিয়াই শিষ্যসংগ্রহের বাতিক * * * আমার নাই।"

রহিমপুর

৩২শে আষাঢ়, ১৩৩৯

ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মপ্রচার

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"অখণ্ড-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে তোমাদের নিজ নিজ জীবনের আচরণের বিশিষ্টতার দ্বারা। নিজে যে ধর্ম্মাচরণ করে, তার আর মুখের কথা কহিতে হয় না, তার দৃষ্টান্তই অপরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। তোমরা সত্য সত্য সাধক হও, সত্য সত্য তপস্বী হও, সমগ্র পৃথিবী আসিয়া তোমাদের প্রাণময় জীবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং ইহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে। তোমাদিগকে প্রকৃত তপস্বী হইবার প্রেরণা দিবার জন্যই আমার যাবতীয় তপশ্চেষ্টা।"

রণক্ষেত্রে বা পল্লীকুঞ্জে

কলিকাতা-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"বন্ধুদের মধ্যে অবস্থান-কালেও তুমি অমৃতময় নামে ডুবিয়া থাক জানিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমার যে যথার্থ সন্তান, সে নিভৃত সাধক। তার সাধন ফল্গু নদীর স্রোতের মত সহস্র কর্ম্মের অন্তরালে অবিচ্ছেদে চলিতে

থাকে। কর্ম্মকে সে ডরায় না, অবিরল তার একাগ্র সাধন কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে রন্ধ্র খুঁজিয়া লইতে থাকে। কিন্তু সাধনহীন কর্ম্মকে আমার সন্তান বর্জ্জন করে। চলিতে,বসিতে, কাজ করিতে সব সময় সে নীরব তপস্বী। রণক্ষেত্রে বা পল্লীকুঞ্জে সর্ব্বত্র তার নিঃশব্দ তপোধারা বাধাহীন বেগে ধীরপ্রবাহিতা। কেবল কথা কহিবার সময়েই তার পক্ষে সাধন অতীব সুকঠিন। এই জন্যই তাহার আধ্যাত্মিক সাধনায় মিতভাষিতা ও মৌন একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ।”

আমার তুমি সন্তান

কলিকাতা-নিবাসী অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“সাধনহীন জীবন বহির্ম্মুখ হইয়া যায় এবং বহির্ম্মুখ জীবন বৃথা-দুঃখ-নিচয় চয়ন করে। সাধনহীন জীবন চঞ্চলতার আকরে পরিণত হয় এবং চঞ্চলতা মনকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া আলেয়ার আলোর পশ্চাতে নিস্ফল পর্য্যটন করাইয়া লয়। অতএব, হে পুত্র, যৌবনের এই প্রথম উন্মেষে জীবনকে প্রাণপণ যত্নে সাধন-নিষ্ঠ কর, বহির্ম্মুখতা হইতে মনকে রক্ষা কর, প্রলোভন-জালের কপট কুহক ছিন্ন-ভিন্ন কর। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদনুসরণের দুরপণেয় দুঃখপুঞ্জ হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত রাখ। আমার তুমি সন্তান, ব্রহ্মচর্য্য তোমার ব্রত, সংযম তোমার সাধনা, সত্যানুসরণ তোমার তপস্যা। আমার তুমি সন্তান, চরিত্র তোমার শিরোভূষণ, আত্মশ্রদ্ধা তোমার বর্ম্ম, ভগবানের নাম তোমার ধ্রুবতারা।”

তপস্যার স্থান নির্ব্বাচন

শ্রীশ্রীবাবা স্নান করিতে যাইতেছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তপস্যার স্থান নির্ব্বাচন কর্ব্বে, সুভিক্ষ, নিরুপদ্রব ও অত্যধিক শীতোষ্ণাদির প্রকোপহীন দেখে। যেখানে হট্টগোল নেই অথচ একেবারে নির্জ্জনও নয়, এমন স্থানই উত্তম। যেখানকার জন-সাধারণ তোমার তপোব্রতের প্রতি বিরোধহীন, এমন স্থানই উত্তম। অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে আকস্মিক প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে লোকাভাব হেতু তপঃক্ষতি হ’তে পারে।

নিরীহ প্রকৃতির লোকেরা যেখানে প্রতিবেশী, তপস্যার পক্ষে সেই স্থানই উত্তম। তারা দাতা না হউক, কিন্তু চোর বা দস্যু না হয়; তারা সমধর্ম্মী না হউক, কিন্তু অধার্ম্মিক না হয়; হিতৈষী না হউক, কিন্তু পর-পীড়ক না হয়।

তপঃস্থান অনুকূল করা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বাংশে অনুকূল স্থান না পাও, আংশিক অনুকূল স্থান পেলে তাকেই চেষ্টার দ্বারা সম্যক্ অনুকূল কত্তে যত্ন নিতে পার। সব যত্নই যে সফল হবে, তার কোনো মানে নেই, কিন্তু যত্নে যদি খাদ না থাকে, তাহ'লে বিফল যত্নও একটা তপস্যা। যত্নের পশ্চাতে অবস্থিত তপস্যাভিলাষটাই বড় কথা। সেই অভিলাষ দশ মাস পরে বা দশ বছর পরে একদিন পূর্ণ হবার সুযোগ আপনি এনে দেয়। এজন্য নিজেকে দায়ী মনে না ক'রে ভগবানকে দায়ী মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

ভণ্ডতাহীন প্রণাম

মধ্যনগরের শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত সন্ধ্যার পরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন,—আমি আপনাকে কখনো পছন্দ করিনি, কখনো ভক্তি করিনি, আমি আগাগোড়া আপনাকে অশ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, ঘৃণা করেছি। এই জন্যই আমি গত আঠারো মাসের ভিতরে একটী-বারও আপনাকে প্রণাম কত্তে আসিনি। কিন্তু এখন আমি অনুভব কচ্ছি, আমাদের সকলের প্রতি কত গভীর আপনার প্রেম। তাই আজ প্রণাম কত্তে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গত আঠারো মাসে আঠারো হাজারের বেশী লোক আমাকে প্রণাম করেছে। তার মধ্যে যে কয়টী প্রণাম ভণ্ডতাহীন, তন্মধ্যে আবার তোমার প্রণামই শ্রেষ্ঠ।

রহিমপুর

১লা শ্রাবণ, ১৩৩৯

কৃষি-প্রবচন ও ধর্ম্মগত সংস্কার

আষাঢ়ের ৩১শে তারিখে দ্বারভাঙ্গা হইতে শতাধিক লেংড়া আমের কলম

আসিয়াছে। এতদঞ্চলে এই জিনিষটীর প্রবর্ত্তনই প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রাবণ মাস বলিয়া অনেকেই বৃক্ষরোপণে অনিচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে খনার বচনের কথা উঠিল।

একজন বলিলেন,...

"শ্রাবণে করিয়া কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাজা রাবণ।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথাটাকে একটু বিচার কর। রাবণ রাজা যদি কলাগাছ রুয়েই সবংশে নির্ব্বংশ হ'য়ে থাকেন, তবু তার সঙ্গে আর একটী ঘটনা ছিল। সেইটী হচ্ছে, সীতা-হরণ। সুতরাং তুমি যদি কলা রোও, তাহ'লেও তোমার সবংশে বিনাশ হ'তে পারে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে পরের বউ চুরী কর। আসল কথা এই যে, কলা রোপণের সঙ্গে তোমার জীবন-মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই, কলা রোপণের সঙ্গে সম্পর্ক সেই কলারই জীবন-মরণের এবং তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক আকাশ-বাতাসের অবস্থার। প্রতিকূল আবহাওয়ায় কলা রুপলে কলার ঝাড়ই সবংশে মর্‌বে। রাবণের যেমন বারো লক্ষ নাতি আর তেরো লক্ষ পুতি, কলা গাছও একবার পুঁত্‌লে তেমনি অল্প দিনেই একটী গাছ থেকে অসংখ্য ঝাড়ের সৃষ্টি হ'য়ে যায়। এজন্য কলা গাছকেই তুলনা-মূলে রাজা রাবণ বলা হয়েছে, লঙ্কার রাবণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আরো বিবেচনা ক'রে দেখ, আগের মত এখন আর প্রত্যেক মাস নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা কচ্ছে না। আষাঢ় মাসেও অনাবৃষ্টি যাচ্ছে, পৌষ মাসেও শীতাভাব হচ্ছে। সুতরাং বহু যুগ আগে রচিত প্রবচন দেখে না চ'লে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঋতু-বিপর্য্যয়ের গতি বুঝেই বপন-রোপণ উচিত। কৃষি-প্রবচনগুলি অবশ্যই অতীত কালের কৃষি-জ্ঞানী ব্যক্তির অভিজ্ঞতাতেই সমৃদ্ধ, কিন্তু কৃষি-প্রবচনকে ধর্ম্মের সংস্কারে পরিণত করা ভুল।

রহিমপুর
২রা শ্রাবণ, ১৩৩৯

আপনার পত্নীকে ভালবাস

অদ্য চট্টগ্রামবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার সরলতাপূর্ণ পত্র আমার পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এক নিমেষে বিদূরিত করিয়াছে। সরল যার প্রাণ, তার কোটি অপরাধ ক্ষমা পায়। যে অন্যায় তুমি করিয়াছিলে, তাহাতে তুমি ত' তোমার পাপের অনলে দগ্ধিয়া মরিয়াছই, যাহার উপরে এ অন্যায় হইতে চলিয়াছিল, সেই অসহায়া রমণীরও বিনাপরাধে কম লজ্জা ও চিত্ত-তাপ সহিতে হয় নাই। আর তোমার মত ছেলের কাছ হইতে প্রত্যাশাতীত ব্যবহার কি করিয়া যে আসিতে পারে, তাহা ভাবিয়া এতগুলি দিন আমিও তোমার সম্পর্কে বেদনায় মূক হইয়া রহিয়াছিলাম। তোমার অনুতপ্ত হৃদয়ের সরল আশ্বাস আমার কণ্ঠের জড়তা দূর করিল।

"অপরাধ করিয়া অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হওয়াই সচ্চরিত্রতার এক বড় প্রমাণ। বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতিকেও মার বা শয়তান প্রলুব্ধ করিতে চাহিয়াছিল। এ জগতে দুর্ব্বলতার করাল-গ্রাসের সমক্ষে ছোট-বড় সবাইকেই পড়িতে হয়, কেহ তপস্যার বলে দুর্ব্বলতাকে পায়ে চাপিয়া গতাসু করিয়া বীরবিক্রমে পথ চলে, কেহ বা নিজেই কবলিত হয়। কিন্তু দুর্ব্বলতার নিকটে নতি স্বীকার করিয়া যে পুনরায় তার প্রতীকারে যত্নবান হয় না, সে নিতান্তই দুর্ভাগা এবং অপাত্র। তুমি যখন নিজের ভুল বুঝিয়াছ এবং তজ্জন্য লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছ, তখনই অর্দ্ধেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু আরও করিবার ছিল এবং আছে। * * * তুমি তোমার আপন পত্নীকে ভালবাস না এবং এই জন্যই নিমিষের জন্য হইলেও তুমি পরস্ত্রীর কথা ভাবিতে পারিয়াছ। এমন ব্যক্তিকে সমাজ চাহে না, যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিবে না কিন্তু অপর নারীর জন্য লালায়িত হইবে। সমস্ত প্রাণটা দিয়া স্ত্রীকে ভাল-বাসিতে পারাই অবৈধ ইন্দ্রিয়াতুরতার প্রতীকারের পথ। * * * তোমার প্রতি এখন আমার একমাত্র উপদেশ—স্ত্রীকে ভালবাস, কারণ এই ভালবাসা তোমাকে ভবিষ্যতের সকল পতন-সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে শক্তি দিবে।"

দেখিয়া শিখ, ঠেকিয়া শিখিও না

চট্টগ্রাম নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"আমার বিলাস-সৌধের উচ্চতা অপেক্ষা তোমার মন্দির-চূড়ার উচ্চতা অধিক, ইহা যদি আমার ঈর্ষ্যাকে ইন্ধন না যোগাইল, তবে আবার বিষয়ী হইলাম কি? বিষয়-সেবার ইহা এক অদ্ভুত পরিণাম। লোকের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, নিজে সাবধান হও, দেখিয়া শিখ, ঠেকিয়া শিখিও না। কিন্তু পরনিন্দা হইতে বিরত হইও। যাহার জীবনের নিন্দনীয় আচরণগুলির কুফল দেখিয়া তুমি শিক্ষা করিলে যে, এইরূপ আচরণ প্রাণপণে বর্জ্জনীয়, তাহাকে মনে মনে একপ্রকারের গুরু স্বীকার করতঃ প্রণাম কর এবং তার নিকটে কৃতজ্ঞ হও। তার আচরিত কুদৃষ্টান্তগুলির আলোচনারূপ কুকার্য্যকে 'সত্য কথা' নাম দিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না। পাপী ব্যক্তিই পরনিন্দা পছন্দ করে, আবার পরনিন্দা পাপী ব্যক্তিরই সৃষ্টি করে।"

কে আপন কেবা পর

মেদিনীপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কে যে আপন, আর কে যে পর, বিচার করিতে গিয়া অনেক নজির ঘাটিও না। শুধু নিজের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, যাহাকে তুমি আপন বলিয়া ভাবিতেছ, সে সত্যই তোমার আপন কি না। সে কি তোমার প্রাণের প্রাণ হইতে পারিয়াছে? যাঁহাকে ভালবাসিলে তোমার ভালবাসার পরম সার্থকতা, তাঁহাকে সে কি ভালবাসিয়াছে? তোমার ঔরসে জন্মিয়াছে বলিয়াই তোমার পুত্র তোমার আপন হইয়া গেল, ইহা মনে করিও না। সে কি ভগবানকে ভালবাসে? না সে হরি-বিরোধী? পুত্র হইয়াও প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে আপন মনে করিতে পারেন নাই। পত্নী হইয়াও মীরাবাঈ রাণা কুম্ভকে আপন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ভগবানের জন্য যার প্রাণের টান, সেই তোমার আপন, তার সঙ্গে কৌলিক বা সামাজিক কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও সে আপন, সে মুচী, মেথর, হাঁড়ি, ডোম হইলেও আপন। ভগবদ্বিরোধী হইলে সে পরেরও পর। তোমার ভগবদুপাসনার সময়ে যদি কোনও মলভোজী কুক্কুর অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়া লাঙ্গুল দোলায়,

তুমি তাকেও আলিঙ্গন দিও। তোমার ভগবদুপাসনায় যার আনন্দ, সেই তোমার আপন। তোমার হরি-বিমুখতায় যার তৃপ্তি, সেই তোমার পর। এই কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধুর আপনত্ব যাচাই করিয়া লও। মোহের ধাঁধায় ঘুরিয়া মরিও না। জগতে আপন চিনিয়া চল, আপন বুঝিয়া চল ; যে পর, তার প্রতি বিরোধ করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না, কিন্তু তার সহিত সংশ্রব কমাইয়া নিজ-জন সংশ্রবের মধ্য দিয়াই ভাব-ভক্তির পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হও।"

ভগবানের কাছে কি প্রার্থনীয় ?

ত্রিপুরা নিলখি নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করিবে জান ? ধন নহে, জন নহে, রূপ নহে, যৌবন নহে, খ্যাতি নহে, প্রতিষ্ঠা নহে, বল নহে, বিদ্যা নহে,— চাহিবে, তাঁহার চরণে চিরস্থির প্রেম। প্রার্থনা করিবে, তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণের জন্য সহস্র কর্ণ, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিবার জন্য সহস্র কণ্ঠ, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য সহস্র বাহু, তাঁহার পবিত্র তত্ত্ব মননের জন্য সহস্র মন। কোনও প্রার্থনা না করিয়া নির্ভর হৃদয়ে অবিরাম তাঁর নাম জপিয়া গেলেই তুমি জীবনের শ্লাঘ্য সম্পদসমূহ লাভ করিতে পার, কিন্তু তবু যদি কখনও চাহিবারই রুচি হয়, তবে যাহা বলিলাম, তাহাই চাহিও।"

জপ অবিরাম মধুময় নাম

পার্শ্ববর্ত্তী নবীপুর গ্রাম হইতে একটী যুবক আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—যতক্ষণ বেঁচে থাক্‌বে, নিমেষের জন্য ভগবচ্চিন্তা পরিহার কর্বে না। প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেকটী হস্তপদসঞ্চালনে, হৃদয়ের প্রত্যেকটী স্পন্দনে, শরীরের প্রত্যেকটী আন্দোলনে অবিরাম ভগবানের মধুময় নাম স্মরণ কর। তাঁর নামের সেবাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, অন্য কাজকে এর অধীন ক'রে নাও। এই কাজই প্রধান, অন্য সব কাজ অপ্রধান।

নিষ্কাম জপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কি উদ্দেশ্য নিয়ে জপ কর্বে? তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণকেই জপের প্রধান উদ্দেশ্য রাখবে। নাম জ'পে যে বিমল-সুখের আস্বাদন হয়, এমনকি তার কামনাটীও রাখবে না। আত্মসমর্পণ,—যুক্তিহীন, সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণ। অবশ্য বিপদুদ্ধারের জন্যও যারা নাম জপে, তারাও নাস্তিকের চেয়ে ভাল। বল হোক, বীর্য্য হোক, অস্থিরচিত্ত সুস্থির হোক, মনের ময়লা দূর হোক, এই কামনা নিয়ে যারা নাম জপে, তারা আরো উচ্চ, আরো মহান। কিন্তু সর্ব্বোত্তম তিনি, যিনি নিষ্কাম জাপক।

বৃক্ষমূলে জল ঢাল

রাত্রে গ্রামের একটী বিবাহিত যুবক আসিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্ব হই-তেই তিনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীবাবার নিকট নানা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর হইতে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন যে, তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত অবাধ্য, একগুঁয়ে এবং কোপন-স্বভাবা। অকপটে তিনি সকল অবস্থা প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবার চরণে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বউটীকে উপাসনা কত্তে শেখা। নাম জপ কত্তে উৎসাহ দে। ক্রোধ-শান্তি কর্ব্বার জন্য উপদেশ না দিয়ে, ভগবৎ-প্রেমিকা হবার জন্য উপদেশ দে। গাছের গোড়ায় যদি জল ঢালা যায়, আপনা আপনি শাখা-পত্র সব সঞ্জীবিত হয়। ভগবানের পায়ে যদি মন ঢালা যায়, আপনি সব নিকৃষ্ট বৃত্তি দূর হয়ে অদোষদর্শী মঙ্গলনিষ্ঠ শান্ত সুন্দর স্বভাবটীর বিকাশ হয়।

ক্রোধ ও নির্ব্বুদ্ধিতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্রোধের উদয় নির্ব্বুদ্ধিতায়, ক্রোধের প্রকাশ বাধায়, আর ক্রোধের শান্তি আত্মগ্লানিতে। ক্রোধ যদি কারো দূর কর্ত্তে হয়, তবে তার নির্ব্বুদ্ধিতা আগে দূর কর্ত্তে হবে। নির্ব্বুদ্ধিতাও গেল, ত' ক্রোধের জন্ম-সম্ভাবনাও গেল। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা কাকে বলে? ভগবানকে

ভুলে থাকার নামই নির্ব্বুদ্ধিতা। এর চেয়ে বড় নির্ব্বুদ্ধিতা তিন ভুবনে আর কিছুই নেই। ভগবানের স্নেহের চক্ষু অনুক্ষণ যার উপরে প'ড়ে রয়েছে, সে ক্ষুব্ধ হবে কোন্ প্রয়োজনে, ক্রুদ্ধ হবে কোন্ লাজে।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ও বাধা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যখন দেখবি, বোকা মেয়েটা চটে গেছে, তখন তুইও চটে যাস্ নে। ক্রোধকে ক্রোধ দিয়ে জয় করা যায় না। ক্রোধকে বাধা দিলে সে বরং উত্তেজিতই হয়। যে এসেছিল নরুণ নিয়ে তোকে আক্রমণ কর্ত্তে, বাধা পেলে সে আসবে সঙ্গীন উচিয়ে। যে এসেছিল পট্‌কা-বাজি নিয়ে, বাধা পেলে সে আসবে মেসিন-গান নিয়ে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সাপের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য এই যে, সামান্য কারণেই চ'টে উঠে ফণা ধ'রে দংশনে উদ্যত হয়। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও আছে। সাপ যখন দংশনোদ্যত, তখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে সে ক্ষতিও কর্‌বে, বিষও ঢাল্‌বে। কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যখন দংশনোদ্যত তখন চুপ ক'রে থাকলেই সে কাবু হয়ে যাবে। কতক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস করে আপনি সে থামবে এবং নিজের কাজে মন দেবে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে তার ক্রোধ প্রকাশ কর্ত্তে দেওয়া উচিত, কারণ ফুটবলের ভেতরের বাতাসটুকু বেরিয়ে গেলেই তার লম্ফঝম্প থামে।

ক্রুদ্ধা পত্নীকে উপদেশ দান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রাগ যখন তার থেমে যায়, তখন যদি আবার তুমি তোমার সহিষ্ণুতার জয়-ঘোষণা সুরু কর, তবে কিন্তু এত কষ্টের চিনিতে বালি পড়বে। রাগ যখন তার থেমে গেল, তখনো তুমি তার উপরে কোনও উপদেশের বাণী বর্ষণ ক'রো না। দিনের পর দিন প্রতীক্ষা কর, কতদিনে তার অনুতাপ আসে। অনুতাপ যখন নানা লক্ষণের ভিতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ সুরু কর্ব্বে, তখন তুমি আস্তে আস্তে ক্রোধদমনের অবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া আরম্ভ কর্ব্বে।

যুবতী পত্নীর ক্রোধের মূলে কামের সম্ভাব্যতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পত্নী যুবতী। তার ক্রোধকে শুধু ক্রোধ 'বলেও

মনে ক'রো না। কামকে চেপে রাখ্‌লেও এক রকমের ক্রোধ হয়। সেই ক্রোধকে দমনের জন্য অন্য কৌশলও প্রয়োজন। প্রথমতঃ পত্নীর প্রাণে এই বিশ্বাসটী তোমার জাগিয়ে দিতে হবে যে, সে নিজে যাই হোক্ না কেন, তুমি তাকে সত্যি সত্যি ভালবাস। তারপরে তাকে বুঝতে দাও যে, সে যদি ভগবানকে ভালবাসে তাহ'লে তার প্রতি তোমার ভালবাসা সহস্র গুণ বাড়্‌বে।

রহিমপুর
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৯

পূজাভাব ও কামভাব

প্রাতে আট কি নয় ঘটিকার সময়ে নিলখী-নিবাসিনী জনৈকা মহিলা ধামঘর হইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ্ মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ব'লে আলাদা আলাদা দেব্‌তা নেই। একমাত্র পরাৎপর পরমেশ্বর আছেন, আর তাঁকেই লোকে লক্ষ্মী নামে সরস্বতী নামে ভজনা করেছে। তাদের প্রাণের কি বল, বুকের কি পাটা, অনুভূতির কি কবিত্ব ভেবে দেখ্। তুইত স্ত্রীলোক। তোর দেহটা তোর স্বামী একটা নিতান্তই ভোগের জিনিষ জ্ঞান কচ্ছে, তুইও নিজেকে তার চেয়ে বেশী কিছু ব'লে ভাব্‌তে পাচ্ছিস্ না। আর, সেই এমন একটা মূর্ত্তিকে এনে সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে বসিয়ে মানুষ কত ভক্তিভরে, কত প্রীতিসহকারে, কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়, কত গভীর অনুরাগে পূজা করেছে, কচ্ছে। এই যে পূজার ভাব, এইটী এলে কি আর কামবুদ্ধি থাকৃতে পারে? পূজাভাব আর কামভাব একে অন্যের ছোঁয়াচ সইতে ভালবাসে না।

স্বামিদেহ সম্বন্ধে কামভাব দূরীকরণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোর স্বামীর দেহের প্রতি তুই এরকমের পূজা-ভাবের অনুশীলন কর্ব্বি। স্বামীর দেহটাকেই ঈশ্বর ব'লে জ্ঞান করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ঐ দেহের মধ্যে পরমেশ্বর আছেন, এই ভাব অন্তরে জাগরূক রাখ লে ঐ দেহ সম্পর্কে কামভাব জাগরিত হ'তে পারে না। কাম-

ভাব ভগবানকে বড় ভয় করে। তার নাম অনঙ্গ, তার শরীর নেই, এজন্য সে অঙ্গের উপরেই অত্যাচার করে। কিন্তু যে বস্তুর উপরে তোমার অঙ্গবোধ নেই, সেই বস্তু সম্পর্কে তার অত্যাচারের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু একটা দেহের প্রতি দেহ-বোধ থাকবে না, এটা কি সহজ কথা ? এটা সম্ভব হ'তে পারে, যদি দেহের ভিতরে, বাহিরে, স্রষ্টারূপে, পোষ্টারূপে একমাত্র ভগবানই বিরাজ কচ্ছেন, এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা যায়।

পরভুক্ কাম ও আত্মভুক্ কাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোর নিজের দেহেও যে ভগবান্ অনুক্ষণ বিরাজ কচ্ছেন, এই উপলব্ধিকেও জাগরুক রাখ্‌তে হবে। কামের দুইটি রূপ,—পরভুক্ আর আত্মভুক্। অপরের দেহকে নিয়েই সে যখন চপল, তখন সে পরভুক্। কিন্তু যখন কৌশল-বিশেষের সহায়তায় বা সাধনের বলে কাম অপরের দেহ নিয়ে নিজেকে বিব্রত কত্তে অক্ষম হল, তখন সে নিজেকেই নিজে তৃষ্ণার শিখায় দগ্ধ কত্তে লেগে যায়। বাহ্য কোনও আচরণে হয়ত তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই, কিন্তু মনের ভিতরে একটা বিপ্লব উপস্থিত ক'রে সে নিজের মনকে নিজের প্রতি লালসা-সম্পন্ন করে।

শাশ্বত জীবন লাভ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ক্ষেত্রেও প্রতিকারের পন্থা ঐ একই। তোমার যত কাম আর প্রেম, তা তোমার জন্যও নয়, জগতের কোনও প্রিয়জনের জন্যও নয়,—তোমার সকল কাম, আর প্রেম একমাত্র তাঁরই জন্য, যিনি জগতের সকল দেহের প্রভু হ'য়েও নিজে বিদেহ। তাঁরই চিন্তা দিয়ে কাম আর প্রেম সব-কিছুকে তাঁর পায়ে ঠেলে ফেলে দাও, পবিত্র জীবন লাভ কর, শাশ্বত জীবন লাভ কর।

আত্ম-বিসর্জ্জনের মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে মন্ত্র সেই দিন আমি দিয়ে এসেছি তোদের কাণে কাণে, সে মন্ত্র ভগবানের মাঝে নিজত্বকে বিসর্জ্জন দিবার মন্ত্র—এককণা স্বার্থকেও নিজের জন্য পৃথক্ ক'রে রেখে দিবার মন্ত্র নয়। আত্ম-নিমজ্জন,

আত্ম-বিলয়, আত্ম-বিলোপ। ভগবানকে ভালবাস মা, তাঁকে নিয়েই তোমার সকল ঘর সকল পর আপন হোক্।

দ্বিমুখী পরচর্চ্চা

নিলখির একটী যুবকের সহিত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধক-জীবনের উন্নতির গোড়া হচ্ছে পরচর্চ্চা-বর্জ্জন। পরচর্চ্চা দ্বিবিধ,—যথা অভিলাষ-মুখী, আর বিদ্বেষ-মুখী। তোমার পরম সাধনার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর জন্য যে প্রাণের অনুরাগ বা রুচি, এইটী হচ্ছে অভিলাষমুখী পরচর্চ্চা। তোমার পরম-সাধনার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ক'রে মনকে যে ক্ষণকালেরও জন্য ইষ্ট থেকে দূরে রাখা, এইটী হচ্ছে বিদ্বেষমুখী পর-চর্চ্চা। এই উভয়বিধ পরচর্চ্চা তোমাকে পরিহার কত্তে হবে। তবে তুমি অতি সহজে সাধন-জীবনে উন্নতি কত্তে সমর্থ হবে।

সাহিত্যিক, ধর্ম্মজীবন ও অদোষদর্শিতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যা সব দোষ-ত্রুটী খুঁত-খাদ খুঁজে বের করে, সমালোচকের এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সাহিত্যক্ষেত্রে খুব আবশ্যকীয়। নতুবা কু-সাহিত্যে দেশ পূর্ণ হ'য়ে যায় এবং কুসাহিত্য আবার কু-জন সৃষ্টি করে। কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনার জগতে অদোষ-দর্শিত্বই বেশী আবশ্যকীয়। পর-দোষ-দর্শন সাধনের রুচিও কমায়, বেগও কমায়। মোটর-ড্রাইভার যদি সম্মুখে দৃষ্টি না রেখে ডাইনে-বাঁয়ে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য আর প্রাকৃত-জনের আচরণই লক্ষ্য ক'রে বেড়ায়, সে নিশ্চয় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নিজেও মরবে, গাড়ীও চূর্ণ কর্ব্বে, লক্ষ্যস্থলে আর তার যাওয়াও হ'য়ে উঠবে না। মূর্খ তারা, যারা সাধন জীবন গ্রহণ করেছে, অথচ অপরের দোষ অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে।

চরিত্রের গুপ্ত থার্ম্মোমিটার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যখনই দেখবে যে, চিত্ত পরনিন্দায় রুচি অনুভব কচ্ছে, তখনি বুঝবে যে, তোমার নিজের ভিতরে কিছু দোষ আছে। যার নিজের ভিতরে দাগ নেই, সে পরের দাগ খোঁজে না। পল্লীগ্রামে প্রায়ই লক্ষ্য কর্ব্বে, যত অসতী স্ত্রীলোকগুলিই সতী নারীদের চাল-চলনে দোষ খুঁজে

খুঁজে বেড়ায়। নিজেরা যারা যত কলঙ্কিত, তারাই তত পরের কলঙ্ক আলোচনায় সুখ পায়। মনের অজ্ঞাতসারেই তারা মনে করে যে, এভাবে বুঝি নিজের কলঙ্ক চাপা পড়বে। পরনিন্দা-প্রবৃত্তিকে তোমার গুপ্ত চরিত্রের থার্ম্মোমিটার ব'লে মনে করো। রোগীর জ্বর যত বেশী, থার্ম্মোমিটারে পারদ তত বেশী উঠে, জ্বর যত কম, তত পারদ নামে। তোমার ভিতরে দোষ যত বেশী, পরনিন্দায় রুচি তোমার তত বেশী হবে, নিজের ভিতর থেকে দোষ যত আরাম হবে, পরনিন্দার রুচিও তত ক'মে যাবে।

ত্রিবিধ পরনিন্দা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরনিন্দার তিনটী রূপ। পরের দোষ খুঁজে বেড়ান হ'ল মানসিক পরনিন্দা। পরের দোষ আলোচনা করা হ'ল বাচনিক পরনিন্দা। পরের দোষ-কাহিনী শ্রবণ করা হ'ল শ্রাবণিক পরনিন্দা। ত্রিবিধ পরনিন্দাই বর্জ্জনীয়,—বিষবৎ এবং সর্ব্বতোভাবে। সাংসারিক ব্যাপারের চেয়ে ধর্ম্ম নিয়ে পরনিন্দাটাই বেশী মারাত্মক, অথচ কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্ম নিয়েই পরনিন্দাটা লোকে বেশী করে।

পরধর্ম্ম-গ্লানি ও নামের সেবা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা স্বরচিত কয়েকটী পয়ার বলিলেন,—

যখনি চাহিবে চিত্ত পরধর্ম্ম-গ্লানি
অখণ্ড-নামের নীরে ডুবিও তখনি।
অপরের পাপ-পুণ্য কি কাজ বিচারে,
নিরন্তর রহ নামে লগ্ন অবিচারে।
নামযোগে প্রাণ-মন কর যদি লয়,
মুহূর্ত্তে হইবে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়।
তিলক কাটিয়া কেহ বৈষ্ণব না হয়
অবিরাম ইষ্টে যদি চিত্ত নাহি রয়।
মদ্য-মাংস সেবিলেই না হয় তান্ত্রিক,
অশ্লীল-ভাষণে কেহ না হয় রসিক।

মল-মূত্র-রজোবীর্য্য করিয়া সেবন
কেহ কি হইতে পারে বাউল কখন ?
নগ্ন-কটি হইলেই নাগা নাহি হয়,
মালা-ঝোলা দেখিয়াই ফকির কে কয় ?
গৈরিকেই হয় নারে যথার্থ সন্ন্যাসী,
শ্রীকৃষ্ণ কি হয় শুধু বাজাইলে বাঁশী ?
চিত্ত যবে নামামৃতরসে ডুবে রয়,
তখনি বহিরাচার তুচ্ছ সমুদয়।
নিত্য সত্য পরাবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে নামে
তিলক না কাটী তুমি বৈষ্ণবের ধামে।
নামের সেবায় তুমি সাধকের শ্রেষ্ঠ,
মাংসাদি না স্পর্শ করি' তান্ত্রিক-বরিষ্ঠ।
অশ্লীল না কহি' তুমি রসিকের সেরা,
মলমূত্র না সেবিয়া বাউলের বাড়া।
নাগা-শিরোমণি তুমি উলঙ্গ না রহি',
ফকির-প্রধান মালা-ঝোলা নাহি বহি'।
গৈরিক বিনাও তুমি নিত্য, অবিনাশ,
আত্মারাম,—হ'লে চিত্ত নামেতে উদাস।
পরধর্ম্ম-নিন্দা করে শুধু অসাধকে,
সাধন করিলে দ্বেষ ঘুচিবে পলকে।
এক ব্রহ্ম, লক্ষ কোটি সাধনের পথ,
এক ব্রহ্ম, লক্ষ কোটি ভজনের মত।
যে যেমন পারে, সে যে করিবে তেমন,
যথা চায়, তথা পায়, মনের মতন।
পথ ভেদে মতভেদ প্রথমেই থাকে,
তপস্যা তাহারে পূর্ণ প্রেম দিয়া ঢাকে।

অতএব নিত্য কর তপস্যা সঞ্চয়,
সাধনের মহাবলে লভ অভ্যুদয়।
যে উঠেছ যে নৌকায়, সে সেখানে থাক,
এক লক্ষ্যে হাল ধ'রে প্রাণভ'রে ডাক।
ইহকাল পরকাল সব হোক ভুল,
মধুময় মহানাম সাধনের মূল।
কেন কর বারংবার অন্য অভিলাষ,
কেন পর সমাদরে বাসনার পাশ ?
স্নেহে কিম্বা দ্বেষ-বশে সব চর্চ্চা ছাড়,
অবিরাম কর নাম যত বেশী পার।
নামে আছে ধ্বনিরূপী এক আবরণ,
সাধন করিয়া তারে কর উন্মোচন।
অর্থ-রূপী আছে পুনঃ অন্য আবরণ,
তাহারে ভেদিয়া মধ্যে করহ গমন।
জ্যোতিরূপী আছে পুনঃ অন্য আবরণ,
তারে ভেদি' আরো মধ্যে করহ গমন।
তখন দেখিবে তার অখণ্ড মূরতি,
তখনি আসিবে সত্য নামামৃতে রতি।
নাম যে পরশমণি হৃদয় ছুঁইবে,
মুহূর্ত্তের মাঝে তারে সোনা করে দিবে।
হোক্ হিন্দু, শিখ, পার্শী, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান,
তত্ত্বমূলে সকলেরে করিবে সমান।
অটুট বিশ্বাসে কর নামের সাধন,
পরানন্দ-সরোবরে হইবে মগন।
তণ্ডুল ছাড়িয়া কেন তুষে কর প্রীতি,
দোষ-দৃষ্টি ছাড়ি' রাখ সাধনে সুমতি।

পার্থক্য থাকিতে পারে আচার লইয়া,
নামের প্লাবনে তাহা যাইবে ধুইয়া।
নামে রুচি থাকে যদি, বিশ্ব আপনার,—
নামে রুচি না থাকিলে, বিতর্ক-বিচার

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য

বেলা বারটার সময়ে কোনও এক প্রয়োজনে শ্রীশ্রীবাবা মুরাদনগর আসিলেন। হাই-স্কুলের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ফটিক চন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিতে পাইয়াই লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রণামান্তে শ্রীশ্রীবাবাকে মহাসমাদরে স্কুলে নিয়া আসিলেন। সকল শিক্ষকেরা ঘিরিয়া বসিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবার মধুময় উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় আজিকার এই উপদেশ রাজির বিস্তারিত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? জীবিকার্জ্জন, প্রতিপত্তিলাভ, দেশ-বিদেশের সংবাদ জানা, এমনকি পরহিত-সাধন প্রভৃতি সবই শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবের মনকে এমন এক ঊর্দ্ধ স্তরে পৌছে দেওয়া, যে রাজ্যে জাগতিক স্ত্রী-পুরুষের ধারণা পৌছুতে পারে না। মনকে সেই রাজ্যে রেখে জগতের স্ত্রী-পুরুষ জগতের কাজ করুক, এইটীই হচ্ছে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংসারের দুঃখ ও মমত্ব

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা মুরাদনগরের শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র ভৌমিকের বাসায় আসিলেন।

শচীন্দ্র বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীকে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুঃখ নেই, শোক নেই, এমন সংসার নেই। কিন্তু এই দুঃখ, এই শোক তোমার গায়ে একটী আঁচড়ও কাটতে পারে না, যদি এই সংসারের উপর থেকে "আমার" "আমার" ভাবটী তুলে নিয়ে "তোমার" "তোমার" ভাবটীকে বসিয়ে দেওয়া যায়।

সংসার কি বিপদের কালেই ভগবানের ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,--কিন্তু দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে যদি "তোমার" "তোমার" লেবেলটী এঁটে দাও, তবে এতে স্বার্থপরতাও হবে, একরকমের জুয়াচুরীও হবে। দু'জন লোক রেলে ভ্রমণ কচ্ছেন, একজনের সঙ্গে বোঝা নেই, তিনি স্বচ্ছন্দে খালি হাতে পায়ে ভ্রমণ কচ্ছেন, অপর জনের সঙ্গে প্রচুর বোঝা, কিন্তু তার জন্য রেলের মাশুল দিতে তিনি রাজি নন। টিকিট-পরিদর্শক এলেন, আর অমনি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলতে লাগলেন,—"এই মালগুলি আমার, আর ঐ মালগুলি ঐ ভদ্র লোকের, ঐ গুলি আমার নয়।" টিকিট-চেকার দেখ্‌লেন যে, সবগুলি মালের অর্দ্ধেক যদি হয় এক জনের, আর অপর অর্দ্ধেক হয় আর এক জনের, তা হ'লে রেলের আইনে মাশুল দাবী করা চলে না। সুতরাং টিকিট-চেকার চ'লে গেলেন। যাই টিকিট-চেকার চ'লে গেলেন, অমনি প্রথম ব্যক্তি একটা বোচ্‌কা খুলে তা থেকে সন্দেশ বে'র ক'রে টপাপট গিল্‌তে লাগ্‌লেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লেন,—"সে কি হে, তুমি পরের জিনিষ এভাবে আত্মসাৎ কচ্ছ কেন ?" প্রথম ব্যক্তি বল্লেন,—"সে কি ? এই না তুমি চেকারের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে যে, এগুলি আমার ?" ঠিক তেমনি, বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য যদি কেউ বলে, "সংসারটী আমার নয়, ভগবানের" আর বিপদ উদ্ধার হ'য়ে গেলেই যদি মন করে যে, সংসারের সুখ, সম্পদ, সম্মান আমারই ত প্রাপ্য, তা হ'লে সে স্বার্থপরতারও পরিচয় দেয়, অসাধুতারও পরিচয় দেয়।

সংসার সর্ব্বকালেই ভগবানের

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সম্পদে হোক, বিপদে হোক্, সংসার সব সময়েই ভগবানের। মানে ও অসম্মানে, উত্থানে ও পতনে, সুযোগে ও দুর্য্যোগে, কল্যাণে ও অকল্যাণে সব সময় সংসারের প্রভু শ্রীভগবান। এই বোধ অন্তরে জাগরূক রে'খ। প্রাণ স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে।

ভালবাসাই জীবের স্বভাব

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত শীতল ডাক্তারের বাসায় আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালবাসাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিদ্বেষ করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। প্রেম দিয়েই সে নির্ম্মিত, প্রেমেই তার পূর্ণ পরিণতি। শীতকালে সে খেলার সাথীকে ভালবেসেছ, কৈশোরে সমপাঠীকে, যৌবনে পত্নীকে, কৈশোরে সন্তানকে, বার্দ্ধক্যে দৌহিত্র-পৌত্রাদিকে।

ভালবাসার প্রকৃত লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তবু তার ভিতরে কত বিদ্বেষ, কত হিংসা, কত ঈর্ষ্যা, কত নীচতা প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কি জানেন? সবাই ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার আসল লক্ষ্যটী যে কে, তা জানে না। যাঁকে ভালবাসলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলের উপরে ভালবাসা আপনি গিয়ে পড়ে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অনু, পরমাণু, কেউ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় না, তাঁর কথা মনে থাকে না। আমরা জগতের সবাইকে ভালবাসতে চেষ্টা করি, কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে চাই না। তাই আমাদের এত হিংসা, এত দ্বেষ। অপূর্ণ বস্তুকে ভালবাসলে ভালবাসাও অপূর্ণ থাকতে বাধ্য। অপূর্ণ ভালবাসায় ঈর্ষ্যা দ্বেষাদির প্রশ্রয় আছে।

অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে (প্রভাত ভবনে) ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, চান্দলা হইতে মোহিনী-ত্রিবেণীদাদের মাতৃদেবী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা যোড়শী দেবী চান্দলার বহু যুবক সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়াছেন এবং তাহাদের আনন্দ-কলরোলে যেন আশ্রমে আনন্দের হাট বসিয়াছে। মা আসিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন এবং সকলের জন্য রান্নার আয়োজন করিতেছেন।

সন্ধ্যা-সমাগমে শ্রীশ্রীবাবা সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা করিলেন। আজ শ্রীশ্রীবাবাকে একটু রাত্রি জাগিতে হইল।

গুরু, শিষ্য ও সমদীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ

একজনকে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতা আর দীক্ষিত এই দুজনের মধ্যে জাতিভেদ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। দীক্ষিতকে নীচ জাতি ব'লে অবজ্ঞা করা দীক্ষাদাতার পক্ষে কপটতা

ব'লে আমি মনে করি। সুতরাং সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতরেও জাতিভেদ নিয়ে কোনও কথা উঠতে পারে না, উঠা উচিত নয়। আমি অবশ্য জোর ক'রে আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্য থেকে জাতিভেদ দূর ক'রে দেবার চেষ্টা করি নি, করা প্রয়োজনও মনে করি না। তার কারণ এই যে, এরা যদি অধিকাংশেই দীক্ষাপ্রাপ্ত মহামন্ত্রের সাধন অকপটে ক'রে যায়, তা হ'লে এদের ভিতর থেকে সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদ আপনা আপনিই উঠে যাবে, অথচ জাতিভেদ তু'লে দেবার জন্য এই সমসাধকদের সমাজে কোনও অনাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতাও প্রবেশ কত্তে পার্ব্বে না।

জাতিভেদবিদূরণ ও সদাচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যেখানে যেখানে জাতিভেদ তু'লে দেবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে সেখানে আমি ঔৎসুক্যের সাথে লক্ষ্য কচ্ছি যে, জাতিভেদ উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-সদাচারও উঠে যাচ্ছে কি না। সদাচারকে যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা থাকে, তা হ'লে জাতিভেদ উঠে গেলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সমত্ব অর্জ্জনের জন্য সবাই মিলে শূদ্র হ'য়ে যাবে, এটা কোনো কাজের কথাই নয়।

সদাচারের ভিত্তিতে আত্মপ্রসার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদিন লক্ষ লক্ষ অনার্য্য আর্য্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করেছিল। তার প্রকৃত রহস্য হচ্ছে এই যে, আর্য্য সদাচার গ্রহণে সাধ্যমত তাদের চেষ্টা ছিল ব'লেই একার্য্য সম্ভব হয়েছে। পুনরায় কি তোমরা সদাচারের অভিযান নিয়ে নিখিল ভুবনে ছড়িয়ে পড়বে ? তা যদি পার, তা হ'লে শুধু ক্ষুদ্র একটুখানি ভারতবর্ষের মধ্য থেকেই জাতিভেদ দূর হ'য়ে যাবে না, নিখিল জগতের সকল জাতির লোককে তোমরা নিজের ক'রে নিয়েও নিজস্বতা বজায় রাখ্তে সমর্থ হবে। তোমাদের আত্মসংগঠন আর আত্মপ্রসার উভয়ই হওয়া চাই সদাচারের ভিত্তিতে।

সদাচারের সংজ্ঞা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, সদাচারের সংজ্ঞা কি, তা তোমাদের জিজ্ঞাস্য

হ'তে পারে। যে সকল আচরণ ঈশ্বর-ভক্তির বর্দ্ধক, নাস্তিক্য-ভাব-প্রশমক, তাই সদাচার। যে সকল আচার, শারীরিক স্বাস্থ্যের পরিরক্ষক, অস্বাস্থ্যের প্রতিষেধক এবং সংক্রামক-রোগ-নিবারক, তাই সদাচার। যে সকল আচার পুরুষের সংযম ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব-সম্ভ্রমের বর্দ্ধক, তাই সদাচার। যে সকল আচার প্রতিপালনের দ্বারা কামবেগ, ক্রোধবেগ ও লোভবেগ প্রশমনের সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয়, যে সকল আচারের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজ-মধ্যে কামুক, লম্পট, বহুদারাভিগামী বা বহুপুরুষ-সেবী পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক'মে যেতে বাধ্য হয়, সেগুলিই সদাচার।

স্ত্রী-সান্নিধ্য-জনিত ভোগোত্তেজনা

একটী যুবক বলিলেন যে, তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর কাছে থাকেন, তখন ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম তাড়নাকে দমন করিতে পারেন না বলিয়া বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এটা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, আগুনের সামনে এলে ঘৃত গল্‌তে আরম্ভ করে। সাধারণ ক্ষেত্রে জিভের কাছে তেঁতুল ধর্‌লে জিভে জল আস্‌বেই।

যুবক।—কিন্তু আমি যে এ তাড়না সহ্য কত্তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাতে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে দূরে কিছুদিন থাক্‌তে পার, এমন একটা কাজকর্ম্ম কিছু নাও। আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবদুপাসনা জোর্‌সে চালাও। কিছুদিন দূরে থেকে ভগবৎ-সাধন কর্ল্লে মনের ভিতরে নূতনতর বলের সঞ্চার হবে। পরে, সেই বলের সাহায্যে সহজে ইন্দ্রিয়-দমন কত্তে পার্ব্বে।

স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে। ইন্দ্রিয়-দমন কচ্ছ ব'লেই যেন আবার স্ত্রীর উপরে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা কোনও অবজ্ঞামূলক চিন্তাকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। বিদ্বেষ-মূলে যে সংযম, প্রলোভনের সমক্ষে

তা অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। বিদ্বেষ-বিহীন যে সংযম, সেই সংযমই নির্ভরযোগ্য পাকা সংযম।

দীক্ষামন্ত্র ও শিক্ষামন্ত্র

অপর একটী যুবকের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাদের এ প্রথা আছে, থাকুক, তোমাদের মধ্যে যে বারংবার মন্ত্রগ্রহণ নেই, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাক। মন্ত্র নিয়েছ ত' জীবনে একবারই নিয়েছ। শতবার শত মন্ত্র নয়। শিক্ষামন্ত্র আর দীক্ষামন্ত্র ক'রে চতুর্দ্দিকে বড় বেশী হট্টগোল হচ্ছে। তাতে তোমরা কাণ দিও না। নিষ্ঠাই সাধনের প্রাণ। প্রাপ্ত নামে নিষ্ঠা রাখ। দেনা-পাওনার সম্বন্ধ একটী নামের সাথেই থাকুক, শত দিকে মন দিও না।

কুমিল্লা
৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লা আসিয়া পৌছিয়াছেন। রাত্রে বহু যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া শ্রীচরণ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

মৃত্যুভয় নিবারণের উপায়

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মৃত্যুভয় কি ক'রে নিবারণ কর্ব্ব ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনকে নিরপরাধ কর, নিজের বিরুদ্ধে আর ভগবানের বিরুদ্ধে যত অপরাধ করেছ, অনুতাপে আর সৎসঙ্কল্পে তার প্রায়-শ্চিত্ত কর। নিরপরাধ চিত্ত মৃত্যুকে ভয় করে না। আসক্তিও কমাও। আসক্তি আত্মদানের বিঘ্ন। অনাসক্ত চিত্ত মৃত্যুতে অবিকম্প।

নিরপরাধ ও অনাসক্ত হইবার উপায়

প্রশ্নঃ—নিরপরাধ হবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিরপরাধ হবারও যা উপায়, অনাসক্ত হবারও তাই উপায়। ভগবানকে সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান ক'রে নিজেকে তাঁর দাসানুদাস জ্ঞান ক'রে তাঁর প্রীত্যর্থে সর্ব্বকার্য্য সম্পাদনই হচ্ছে অনাসক্ত হবারও উপায়, নিরপরাধ হওয়ারও উপায়।

গুরুর বিচিত্র আচরণ

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অপরকে গ'ড়ে তোলা যার জীবনের ব্রত, তার আচরণ তোমাদের ক্ষুদ্র মাপ-কাঠি দিয়ে মাপ্‌তে গেলে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় তাতে হ'তে পারে, কিন্তু সুবিচার নাও হতে পারে। বাগানের মালীর কর্ত্তব্য গাছের যাতে উপকার হয়, তাই করা। কিন্তু উপকার বল্‌তে কি বুঝবে ? সব সময়ে, একই ব্যবহারে কি উপকার হয় ? কত যত্ন, কত তদ্বির চল্‌ল গাছটাকে বড় ক'রে তুল্‌তে, তার ক'দিন পরেই পালা এল ডাল ছাট্‌বার। কারণ, ডাল কিছু কিছু ছেটে না দিলে ফুল-ফল আস্‌বে না। অথচ ফুল-ফলেই বৃক্ষের সার্থকতা। গুরুরও কর্ত্তব্য সেইরূপ। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন, অলস, অকর্ম্মণ্য শিষ্যকে মহাব্রতে উদ্বুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তার অন্তর্নিহিত শক্তিতে, তার পুরুষকারে, তার ব্যক্তিত্ববোধে রসায়ন-প্রয়োগ চল্‌তে লাগ্‌ল। ফলে বহু সদ্‌গুণের সাথে সাথে ঔদ্ধত্য, অবিনয়, অবিমৃষ্য-কারিতা, অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, পরমতে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতির ডাল-পালা আকাশ স্পর্শ কত্তে ছুট্‌ল। এ সময় গুরুকে ডাল পালা ছাট্‌বার জন্য কঠোর হস্তে কাঁচি বা কাটারি চালাতে হয়, স্থলবিশেষে কুড়াল পর্য্যন্ত ধর্‌তে হয়। কারণ, দর্প-দম্ভের ডাল-পালা ছেঁটে না দিলে মানবের জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোটে না, ফল ফলে না। যাকে আদরে লালন করা হয়েছিল, তাকেই আবার কঠোর শাসন করার প্রয়োজনও গুরুর আছে, যোগ্যতাও গুরুর থাকা দরকার।

মূর্ত্তি-ধ্যানের ক্রমাবনত স্তর

অন্য একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মূর্ত্তিধ্যান না ক'রে যদি সাধন চলে, তবে আর মূর্ত্তিধ্যানের চেষ্টায় যেও না। আবার, মূর্ত্তিধ্যান যদি কত্তেই হয়, তবে নামের মূর্ত্তিটীই ধ্যান কর। তাতেও যদি অক্ষম হও, তবে যে কোনও ঈশ্বর-ভাবোদ্দীপক মূর্ত্তির চিন্তন কর, কিন্তু, ঈশ্বরভাবের সঙ্গে জীব-ভাবের ছন্দাংশও মিশান না থাকে, তার দিকে লক্ষ্য রাখ। জীব-ভাব যদি খানিকটা এসে যায়, তবে জীবভাবটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না ক'রে জীবভাবকে উপেক্ষায় পরিহার ক'রে, ঈশ্বরভাবটুকুতেই চিত্ত ডুবাও।

এই কথা বলিয়াই হাসিতে হাসিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অর্থাৎ আমি এম-এ ক্লাসের ছেলেকে নীচের দিকে প্রমোশন দিতে দিতে একেবারে ম্যাট্রিক ক্লাসে নামিয়ে দিচ্ছি।

মন্দির না যাদুঘর ?

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—প্রতীকই যদি গ্রহণ কত্তে হয়, তবে তার সম্পর্কেও প্রবল নিষ্ঠা থাকা চাই। রমণীর যেমন স্বামি-গ্রহণ। স্বামীর পর্য্যঙ্কে সে কয়টী পুরুষকে ঘুমুতে দেবে ? তুমিই বা তোমার মন্দিরে কয়টী বিগ্রহকে স্থাপন কত্তে পার ? বহু-বিগ্রহের অর্চ্চনা করার মানেই হচ্ছে কোনোটাকেই না করা। আমি যখন দেখ্‌তে পাই, একই মন্দিরে শত শত মূর্ত্তি, তখন ওটাকে ভজনালয় ব'লে মনে না ক'রে প্রদর্শনী বা যাদুঘর ব'লে আমার ভ্রম হয়।

ওঙ্কার-নামব্রহ্মই সর্ব্বজনীন প্রতীক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ওঙ্কার-নামব্রহ্মই আমার মতে সর্ব্বজনীন প্রতীক। একমাত্র নামব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনও প্রতীক যদি মন্দিরে রক্ষিত না হয়, তাহ'লেই শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর, রামায়ৎ, শিখ, ব্রাহ্মের সকল কলহের অবসান একদিনে হয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে ওঙ্কার-ব্রহ্মকে কে না মানেন ? কিন্তু শাক্ত বিষ্ণুকে না মান্‌তে পারেন, বৈষ্ণব শিবকে না মান্‌তে পারেন, শৈব গণপতিকে না মান্‌তে পারেন, গাণপত্য সূর্য্যকে না মান্‌তে পারেন, সৌর শ্রীরামকে না মান্‌তে পারেন।

মন্দির হইবে সকলের মিলন-কেন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গণ্ডী আর কেন্দ্র, এ-দুটী জিনিষে তফাৎ আছে। মন্দিরের দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রের দায়িত্ব। সকলের সঙ্গে যার সমান টানের সম্পর্ক, সেই হচ্ছে কেন্দ্র। মন্দির যদি গড়তে হয়, দৃষ্টি রেখ, তার কেন্দ্রের কর্ত্তব্য যেন আড়ম্বর ও বৈচিত্র্যের মোহে সে ভুলে না যায়।

স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য,

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনের আনন্দকে অব্যাহত রাখা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই বেশী প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারগুলির স্বার্থ ত' এতে সংরক্ষিত হবেই, কিন্তু একটা পরিবারের উদয়-বিলয়ের চেয়েও অনেক বেশী গরীয়ান্ বিবেচ্য হচ্ছে একটা জাতির উদয়-বিলয়। ঘরে ঘরে স্ত্রী-রোগ, ঘরে ঘরে সূতিকা, এ অবস্থা যাদের, তাদের মধ্যে শক্তিশালী লোকের আবির্ভাব তুমি কত আশা কত্তে পার ?

স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য-হানির কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য কিসে এত দ্রুত নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, তার বিষয় ভেবেছ ? কতক হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারে, কতক ভোগমূলক কুচিন্তায়, কতক পুষ্টিহীন খাদ্যে, কতক আলস্যে, আর কতক অতিশ্রমে, কতক অবহেলা ও নির্য্যাতনে।

আদর্শ নারী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এসবের প্রতীকার কত্তে হবে। কিন্তু প্রতীকার-চেষ্টার আগে একটা আদর্শ নারীর চিত্র মনের ভিতর এঁকে নিতে হবে। যে স্ত্রীলোক অসংযত নয়, কুচিন্তা করে না, আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না, শারীরিক শ্রমকে ভয় পায় না, অত্যন্ত নিদ্রাসক্ত নয়, অতিলোভী নয়, কোপন-স্বভাব নয়, আত্মমর্য্যাদা-বোধ যার আছে কিন্তু অপরের সম্মানে যে আঘাত দেয় না, তাকে ব'লো আদর্শ নারী।

আদর্শ নারীর শিক্ষা ও সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তার শিক্ষার কথাটা এখনো বলা হয় নি। তাকে শিক্ষিতাও হ'তে হবে। বি-এ, এম্-এ পাশের কথা বল্‌ছি না, যে শিক্ষায় ভগবৎ-পাদপদ্মে মনের নিত্য আকর্ষণ আসে, সেই শিক্ষা তার চাই। আর চাই এই বোধ যে, সতীত্ব ছাড়া জগতের কোনো শিক্ষার বা ডিগ্রির কোনো মূল্য নেই।

বাহ্য বেশভূষা ও সাধক পুরুষ

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধক-জীবন

যাপনের যার অভিপ্রায়, তাকে সাধনের উপরেই বেশী জোর দিতে হবে। বাহ্য বেশ ও বাহ্য আচারকে সাধন-স্পৃহার অনুগত ও অনুকূল ক'রে রাখ্‌তে হবে। দৈনিক জটা সাম্‌লাতেই দু-দণ্ড যায়, ধ্যান-জপে পাই না পাঁচ মিনিট, এ বড় অসুবিধাজনক অবস্থা। যে বেশ, যে ভূষা, যে আহার, যে আচার সাধনের অনুকূল, তাকেই গ্রহণ কত্তে হবে। যা প্রতিকূল, তা বর্জ্জন কত্তে হবে। আজ যা অনুকূল, কাল যদি তা প্রতিকূল হয়, তবে আজ যা গ্রহণ করেছ, কাল তা ছেড়ে দিতে হবে। প্রকৃত সাধক নিষ্প্রয়োজনে কোনও প্রথার দাসত্ব কত্তে পারেন না, আবার অনর্থক কোনও প্রচলিত সৎপ্রথার বিরোধও কত্তে পারেন না।

কুমিল্লা ও লাকসাম

১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

রহিমপুর-নিবাসী একটী যুবক কুমিল্লায় কিছুদিন যাবৎ বাস করিতেছেন। গ্রামের অপরাপর সকল যুবকের ন্যায় এই যুবকটীও শ্রীশ্রীবাবার একান্ত প্রীতিপাত্র। কিন্তু ৬ই বৈশাখের উৎসবে কদম-গাছ ফাড়া লইয়া গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তির সহিত ইহার যে ঝগড়া হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে আজ পর্য্যন্ত ইনি ক্রোধ-শান্তি করেন নাই। শ্রীশ্রীবাবা খুঁজিয়া তাঁহার বাসা বাহির করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন।

ক্রোধের অপকারিতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ক্রোধকে বেশীদিন মনের ভিতরে পুষে রাখ্‌তে নেই। ক্রোধ যখন সিংহাসনে বসে, লক্ষ্মী তখন রাজ্য ছেড়ে পালায়, বুদ্ধি-শুদ্ধি লক্ষ্মীর পদানুসরণ করে। তুমি যার উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছ, তার কোনো ক্ষতি কত্তে না পেরে ক্রোধ শেষে তোমাকেই দগ্ধে দগ্ধে মারে, তোমার মনের তন্তুগুলির গঠন খারাপ ক'রে দেয়, সদানন্দ মেজাজটীকে চণ্ডালে পরিণত করে। জান ত', আগেকার দিনে চণ্ডালেরাই জল্লাদের কাজ কত্ত?

ক্রোধ-চণ্ডাল

শ্রীবাবা বলিলেন,—ক্রোশ্রীধকে সম্পূর্ণরূপে দমন ক'রে রাখা সহজ কথা

নয়। কিন্তু ক্রোধ-দমন যদি অসাধ্যই হয়, তবে অন্ততঃ ক্রোধ-চণ্ডাল না হ'য়ে ক্রোধ-ব্রাহ্মণ হও! ব্রাহ্মণের ক্রোধ দুই দণ্ড, চণ্ডালের ক্রোধ আমৃত্যু। বেশ, ক্রোধ-ব্রাহ্মণ না হ'তে পার, ক্রোধ-ক্ষত্রিয় হও। মানে, যার প্রতি তোমার রাগ তার সঙ্গে খুব কতক্ষণ কাটাকাটি ক'রে কর-মর্দ্দন কর। ক্ষত্রিয়ের ত' কথায় কথায় যুদ্ধ আবার কথায় কথায় সন্ধি, পাওনা-দেনার কথা তুচ্ছ, মান-মর্য্যাদার জন্যই সব। তাও যদি না পার, ক্রোধ-বৈশ্য হও। মানে, কে কার কত ক্ষতি করেছ, তার হিসাব কর, উভয়ের লাভক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে তার পরে একটা আপোষ-রফা ক'রে ফেল। কিন্তু যাই কর আর নাই কর, ক্রোধ-চণ্ডালটী হয়ো না।

ভগবান তোমার নিকটতম

অদ্য মজিদপুর-নিবাসী একটী যুবক সাধন গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—উপাসনার সময়ে কখনো মনে করো না যে, ভগবান দূর-দূরান্তরে রয়েছেন। তিনি তোমার নিকটতম। তিনি তোমার এত নিকট যে তোমার চক্ষু, কর্ণ, অস্থি, মাংস এরাও এত কাছে নয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের অভিসার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এভাব প্রথম সাধকেরা আয়ত্ত কত্তে পারে না। তদবস্থায় তুমি জান্‌বে, তুমি যেন নদী আর তিনি যেন মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্র থেকে জোয়ারের জল এসে যখন নদীকে প্লাবিত ক'রে দিয়ে যায়, তখন কি মহাসমুদ্রও নদীতে প্রবেশ করে না? কিন্তু তা অংশতঃ, পূর্ণতঃ নয়। নদী যখন ভাটার টানে সমুদ্রের বুকে পড়ে, তখনো সে নিজেকে পূর্ণতঃ ডুবিয়ে দেয় না, দেয় অংশতঃ। তোমার শ্বাসে আর তোমার প্রশ্বাসে অবিরাম এই জোয়ার-ভাটা চলেছে। Each inspiration is a motion of God into you just as the sea enters a river in flood. Each expiration is a motion of yourself into God just as a mighty river enters the sea. জোয়ারে সেই

পরম-প্রেমিক তোমার ভিতরে আসেন, ভাটায় তুমি সেই প্রেমরস-সাগরের পানে ছুটে যাও। এভাবে অবিরাম শ্বাসে ও প্রশ্বাসে তোমাদের দুই-জনের প্রেমাভিসার চলেছে। অভিসার কখনো পূর্ণ মিলন নয়, কিন্তু মিলনের আনন্দ এতে আছে, কারণ, অপূর্ণ মিলনও পূর্ণ মিলনেরই ত' একটা ভগ্নাংশ।

নৈকট্য-বোধের পরিণাম অদ্বৈতবোধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অভিসার যদি বহু দিন ধ'রে চলে, তাহ'লে সেই প্রেমিক-যুগল আর দূরে দূরে বাসা বেঁধে থাকৃতে পারে না, অনুক্ষণ কাছে কাছে থাকৃতে চায়, দিবানিশি প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন পেতে চায়। তখন নৈকট্য জন্মে। এই নৈকট্য যত নিঃস্বার্থ, সে তত সাত্ত্বিক, তত গভীর। আমার সুখের জন্য তোমাকে কাছে চাই না, তোমার সেবার জন্যই তোমাকে কাছে চাই, এই বোধ যত গভীর, নৈকট্য তত নিবিড়। নৈকট্য যত নিবিড়, অদ্বৈতানুভূতি তত সন্নিকট।

উপলব্ধির অদ্বৈতাভিমুখিনী ক্রমগতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে ছিল কেউ না, সাধন ক'রে সে হ'ল আপন, কিন্তু বড় দূরে। যে ছিল দূরে, সাধন ক'রে সে হ'ল কাছে, কিন্তু আমার সুখেরই লাগি'। সে হ'ল কাছে, সে হ'ল আরো কাছে, কিন্তু তারই সেবার তরে। সে হ'ল গভীরভাবে নিবিড়ভাবে আপনতম, নিকটতম, পরে হঠাৎ চেয়ে দেখি, তাতে আর আমাতে পৃথক্ সত্তার অনুভূতি নেই,—"হয় শুধু তুমি থাক, নয় শুধু আমি রাখ, উভয়ের নহে একাসন।"

অদ্বৈতের দ্বিবিধ অনুভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অদ্বৈতানুভূতির আবার কেমন বিচিত্র রূপ। একটী রূপে তিনি 'আমি' হয়ে গিয়েছেন, আর একটী রূপে আমি "তিনি হয়ে গিয়েছি। তিনি যখন "আমি" হয়েছেন, তখন দেখি, আকাশ, পাহাড়, বন ও লতা সবই আমি, মানব, দানব, পক্ষী, পশু সবই আমি. ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সবই আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই, আমি ছাড়া কিছু ছিল না, আমি ছাড়া

কিছু থাকবে না। আমি যখন "তিনি" হয়েছি, তখন আমি দ্রষ্টাও নই, দৃষ্টও নই, আমার অস্তিত্বও তাঁরই অস্তিত্ব, নিরপেক্ষ হ'য়ে তিনি আছেন, কিন্তু সাপেক্ষ হ'য়েও আমি আছি কি নেই, এপ্রশ্ন পর্য্যন্ত উঠ্‌ছে না। শ্রীরাধা একদিন কৃষ্ণসেবা কত্তে কত্তে হঠাৎ যদি দেখেন যে, রাধাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, মেঘবরণ কৃষ্ণের বাম পাশে কনককান্তি কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখীদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আটজন কৃষ্ণ আট রকম হ'য়ে মেঘবরণ কৃষ্ণ আর স্বর্ণবরণ কৃষ্ণের যুগলের উপাসনায় নিমগ্ন রয়েছেন,— তা হ'লে যে অবস্থাটা হয়, তার গভীরতম ভঙ্গীটাকে চিন্তা ক'রে দেখ। তা হ'লে যদি কিছু বুঝতে পার।

'তৎ-ত্বম্-অসি'

কুমিল্লা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটী যুবক দ্বিপ্রহর বেলা উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে বলিলেন,—নিজের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। অথবা, প্রতিষ্ঠিত কর, বল্‌লে ভুল বলা হয়। ব্রহ্মচৈতন্য ত' রয়েছেই, বারংবার অন্তর্ম্মুখ ধ্যানের বলে তাকে অনুভব কর। পাপ দূরে যাবে, তাপ ক'মে যাবে, অশান্তি নির্ব্বাণ পাবে। ভাবো, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, নিখিল ভুবনের পালয়িতা, বিশ্বজগতের সংহর্ত্তা। ভাবো, তুমি ক্ষিতি-অপ-তেজাদি ভূতগণের আদিভূত সনাতন পুরুষ, তুমি ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবাদির পূজা-বিগ্রহ পরমাত্মা, তুমিই সত্ত্বরজস্তম গুণাদির আধার ও আধেয়। ভাবো, ত্রিগুণের তুমি প্রকাশক, ত্রিগুণের তুমি অতীত। ভাবো, পুংস্ত তোমাতে নেই, স্ত্রীত্বও তোমাতে নেই, পরমবেদ্য পরমপুরুষ তুমি, স্ত্রীপুরুষের ভেদাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত ও চিহ্নাদি-রহিত নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প মহাসমাধিভূত তুমি যোগেশ্বর-স্বরূপ। ভাবো, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই আদ্যাশক্তি, তুমিই জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের পরিপূর্ণ সমন্বয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সকল ছোটভাব, নীচ বুদ্ধি, কলুষিত প্রবণতা তোমাকে সভয়ে পরিহার কর্ব্বে। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।"

সীমাবদ্ধ-দেহধারী কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এরকম ভাব্‌তে গেলেই তোমার প্রথম প্রথম এই

কথাটাই বারংবার মনে হবে যে, দেহটা যার সীমাবদ্ধ, সে কি ক'রে পরব্রহ্ম হ'তে পারে? এজন্য তোমাকে মনে জানতে হবে, এই দেহটাই শুধু তোমার দেহ নয়, জগতের সকল দেহ তোমারই দেহ, সকল মন তোমারই মন, সকল চিন্তা তোমারই চিন্তা, সকল অস্তিত্ব তোমারই অস্তিত্ব। জগতের একটী তৃণও তোমাকে ছেড়ে ভিন্ন নয়, জগতের একটী গাছের পাতাও তোমা থেকে পৃথক্ নয়। সর্ব্বদেহের তুমি দেহী, সর্ব্বপ্রাণের তুমি প্রাণী, সর্ব্বভূতের তুমি ভূতনাথ।

গৃহী শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা চারিটার গাড়ীতে লাকসাম যাইবেন। ঘণ্টাখানেক আগে একজন ভদ্রলোক মাইল চারি দূরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে আসিয়াছেন কিছু উপদেশ পাইবার জন্য। শ্রীশ্রীবাবা আজই চলিয়া যাইবেন শুনিয়া ভদ্রলোক ঘর্ম্মপরিপ্লুত কলেবরে ছুটিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা স্বহস্তে তাহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক লজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইলেন।

অতঃপর উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুর কর্ত্তব্য সর্ব্বাবস্থাতেই শিষ্যের সংযমানুরাগ ও সংযমশক্তিকে প্রবর্দ্ধিত করার চেষ্টা করা, স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক আসক্তিকে কমিয়ে দিয়ে উভয়কেই ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করা। শিষ্যকে স্ত্রৈণ আর শিষ্যাকে কামুকী হ'তে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁর নিজের শুদ্ধ জীবন, তাঁর নিজের পবিত্র আচরণ বিনা উপদেশেই শিষ্য-শিষ্যার জীবনে ত্যাগ ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে,—এখানেই ত' তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। তার পরে, প্রয়োজনস্থলে উপদেশও তিনি দেবেন। যেখানে কৌশলের অভাবে উপদেশকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত কত্তে শিষ্য অক্ষম, সেখানে তিনি কৌশল-বিশেষেরও ইঙ্গিত কর্ব্বেন। মহাপুরুষের স্নেহাশ্রয় পেয়েও যদি জগৎ থেকে লাম্পট্য আর কদাচার না কম্‌ল, তা হ'লে মহাপুরুষদের শিষ্য-সেবা-ব্রত গ্রহণের সার্থকতা কোথায়?

সকলের সেরা দুর্ভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঈশ্বর-বিমুখতা জীবের পরম দুর্ভাগ্য। তন্মধ্যে আবার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হচ্ছে সব চেয়ে বড় বিমুখতা। যে ব্যক্তি জীবসেবাকে ব্রত ক'রে ঈশ্বর ভুলে গেছে, সে মহৎ হ'লেও দুর্ভাগ্য। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত যশের লোভে ঈশ্বর ভুলে আছে, সে আরো দুর্ভাগ্য। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখের মোহে প'ড়ে ঈশ্বর ভুলে আছে, সে হচ্ছে সকলের সেরা দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্য বিদূরণের ব্রত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুর্ভাগ্য দূর করাই গুরুর কাজ। ইন্দ্রিয়-পরায়ণকে তিনি যশস্বী জীবনের উজ্জ্বল ছবি প্রদর্শন ক'রে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীবদ্ধ গৃহকোণ থেকে টেনে এনে তার কূপ-মণ্ডুকতা ঘুচাবেন। আত্মযশোলুব্ধ রজঃপরায়ণ ব্যক্তিকে নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার অসারতা প্রদর্শন ক'রে নিষ্কাম ভাবে সত্ত্ব-রাজসিক জীবহিতৈষণায় নিয়োজিত কর্ব্বেন। জীবহিতপরায়ণ নিষ্কাম লোক-কল্যাণ কর্ম্মীর পরার্থচেতনাকে তিনি তাঁর অপার্থিব স্নেহ, প্রেম, আকর্ষণ, আদর্শ ও অনুপ্রেরণার বলে পরমার্থ-প্রেরণায় পরিণত কর্ব্বেন। এই কাজটী যদি তিনি না কত্তে চান, তবে তাকে "গুরু" এই উপাধিটী বর্জ্জন কত্তে হবে।

পরমার্থী ও পরার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যিনি পরমার্থ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি পরার্থব্রত বর্জ্জন কর্ব্বেন? তা কর্ব্বেন না। তহশীলদার যদি নায়েব হয়, সে কি তহশীলদারী ছেড়ে দেয়, না, ধ'রে রাখে? এক হিসাবে ছাড়ে, এক হিসাবে ধরে। নিজ হাতে আর তহশিলী আদায়-উশুল সে করে না বটে, কিন্তু তারই অধীনস্থ লোকদের দিয়ে সে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করায়। তহশীলদারদের কর্ম্ম-সৌকার্য্য বর্দ্ধনই তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়। একজন নায়েব যদি জমিদার হয়, সে কি নায়েবী করে, না ছাড়ে? এক হিসাবে করে, এক হিসাবে ছাড়ে। নায়েবের অধিকারের বাইরের কাজই তাকে প্রধানতঃ কত্তে হয় এবং প্রত্যেকটী অধীনস্থ নায়েবের কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তার সুব্যবস্থার

দিকেই তার প্রধান দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। পরমার্থ-উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরও পরার্থব্রতীর সঙ্গে এই রকমই সম্বন্ধ।

ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তিই সকলের গুরু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই জন্যই জগতের সকল দেশ-কর্ম্মী, স্বজাতি-সেবক, পরহিত-প্রাণ ও জীবের-দুঃখে-দুঃখী মহৎ লোকদের গুরু। কেউ মহৎ হয়েছেন, লাঞ্ছনা পেয়ে তার প্রতীকারের চেষ্টায়। কেউ মহৎ হয়েছেন, স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণে। কেউ মহৎ হয়েছেন, জীবের দুঃখ দেখে আত্মৌপম্যের দ্বারা গভীর সহানুভূতি অনুভব ক'রে। কেউ মহৎ হয়েছেন, নামের লোভে, যশের তাড়নায়, প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে। এক এক ভাব নিয়ে এক একজন কর্ম্মের পথে নেমেছেন এবং নানা ঝড়-ঝাপটা স'য়ে অনেকবার আছাড় খেয়ে হাত-পা ভেঙ্গে মার স'য়ে তারপরে অন্তরের বহু মলিনতা থেকে ঘটনার আবর্ত্তে পরিশুদ্ধ হ'য়ে মহত্ত্বের মন্দিরে এসে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু ভগবৎ-সমর্পিত-প্রাণ ব্যক্তিই এদের সকলের গুরু।

অপরাহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী, হরেকৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র ভক্ত তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লাকসাম হাইস্কুলের ছাত্রাবাসে নিয়া আসিলেন। হেডমাষ্টার সুরেশ বাবু, সহকারী প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশ বাবু প্রভৃতি শ্রীশ্রীবাবাকে মহা-সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যায় সঙ্গীতের পর সঙ্গীত চলিল। প্রথমতঃ নিজ পুস্তকে ছাপা কতিপয় গান শ্রীশ্রীবাবা গাহিলেন। তৎপরে স্বরচিত অপ্রকাশিত গানগুলি গাহিতে লাগিলেন। এক একটী গান গাহেন, আর একটু একটু উপদেশ দেন।

এস হে প্রাণের প্রিয়

শ্রীশ্রীবাবা গাহিলেন,—

এসহে প্রাণের প্রিয় আনন্দ-মন্দিরে, *
বাজাও জীবন-বীণা মলয়-সমীরে।

* কেদারা, ঢিমা তেতালা।

ধোয়াইব পদতল দিয়া আঁখিভরা জল,
আরো দিব, চাহ যদি সারা বুক চিরে ॥

এস নাথ এস আজি মোহন নাগর সাজি'
মরম-পরম-পুরে গোপনে গভীরে ॥

এতদিন সাজে নাই, এতদিন বাজে নাই,
আমার এ বীণা,
কি ক'রে সাজাতে হবে সে কথা কে মোরে ক'বে,
ওগো তুমি বিনা ?
তুমি আজি বাঁধ সুর, গানে কর ভরপূর
এক অনাহত তানে শত-তন্ত্রী ছিঁড়ে ॥
তুমি আজি গাহ গান, বহাও প্রেমের বান,
বাজাও তোমারি সুরে হৃদি-যন্ত্রটীরে ;
তোমারি মধুর নামে লহ মোরে ঘিরে ॥

ওঙ্কারে বীণা বাজে রে

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

হারে, ওঙ্কারে বীণা বাজে রে। *
ওরে, বাহিরে বাজেনা, বাজে
প্রাণ-মাঝারে।
মরমের কাণে শুনি কিবা সুমধুর ধ্বনি
দিবা-যামিনী
নাচে পরাণি
আকুলি ব্যাকুলি উঠি বারে বারে।

---

* লুম-ঝিঁঝিট ঠুংরী।

কাঁহার পরশ লাগি'
হরষ উঠিছে জাগি,
সরস রাগিণী শত উঠে ফুকারে,
ওঙ্কার ঝঙ্কার তারে তারে।

ভিখারীরে তুমি করেছ ভূপতি

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

ভিখারীরে তুমি করেছ ভূপতি, *
তাই কি তোমারে ডাকি হে?
খোঁড়ারে করেছ হিমগিরিজয়ী
তাই কি হৃদয়ে রাখি হে?

অন্ধেরে তুমি দেখাইলে চাঁদ,
বদ্ধেরে দিয়া ছিঁড়াইলে ফাঁদ,
গত জীবনের শত অভিশাপ
সোহাগে দিয়াছ ঢাকি' হে।

ছিন্ন বীণায় পরাইলে তার,
নূতন করিয়া দিলে ঝঙ্কার,
করুণে কঠোরে বাজালে রাগিণী
রাখিলে না কিছু বাকী হে।

ঝড়-ঝঞ্ঝায় ডুবিত এ তরী,
আপনি আসিয়া বাঁচাইলে হরি,
অকূল পাথারে দিলে পার ক'রে
ঘুচালে ভবের ফাঁকী হে।

---

* বেহাগ-খাম্বাজ একতালা।

অশেষ হস্তে অপার করুণা

শ্রীশ্রীবাবা গাহিলেন,—

অশেষ হস্তে অপার করুণা *
দিয়াছ দিতেছ ঢালিয়া,
তবু দেই দোষ নাহি সন্তোষ
মরি দাবানল জ্বালিয়া।

নাহি চিনি আমি আপনার জন,
তুমি সকলেরে করিলে আপন,
তবু ভুল ধরি কেবলি তোমারি
আপন ভ্রান্তি ভুলিয়া।

দুখ যদি দাও, সেও তব দয়া,
সে যে গো তোমার চরণেরি ছায়া,
ভুল বুঝি ব'লে যাই দূরে চ'লে
আশীষ-মাধুরী ফেলিয়া।

এ ভুল আমার দাও ভেঙ্গে দাও,
সুখের কামনা নাও কেড়ে নাও,
ব্যথা দিয়ে গ'ড়ে লও হে আমার
শত বেদনায় দলিয়া।

সুখ-দুখ প্রভু যা-কিছু দিয়েছ

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

সুখ দুখ-প্রভু যা-কিছু দিয়েছ †
সকলি তোমারি দয়াময়।
বিষাদ-হরষ তব শুভাশীষ,
তুমি চির-কল্যাণময়॥

* মিশ্র একতালা। † একতালা।

আছ মোর শত অনল-দহনে,
যতেক বেদনা-গহনে,
শশধর-সিত-সুধা-বরিষণে,
কুসুম-সুরভি-বহনে ;
দুঃখ-বিপদে হৃত্তাপহারী,
সুখ-সম্পদে শুভময় ॥

উজল বরণে, অরুণ কিরণে
অনাথ-পতিত-শরণে,
আলোকে আঁধারে, ভূলোকে পাথারে,
আছ হে জীবনে মরণে ;
তুমি যে আমারি চিত্ত-বিহারী,
আমি যে গো হরি তোমাময় ॥

জাগাইলে যদি হরি

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

জাগাইলে যদি হরি *
দেহ চির-জাগরণ,
যে জাগা জাগিলে পরে
মরণ নিবে শরণ।

দিবস-রজনী ভরি'
তব রূপ-রাশি হেরি,
সজীব সজাগ যেন
থাকে মম দু-নয়ন

* ইমন কেদার ঠুংরী।

তোমারি বাঁশীর ধ্বনি
অবিরত যেন শুনি,
কাণে প'শে প্রাণ রসে
করে যেন নিমগন।

সে জাগা জাগিতে চাই
যাহাতে বিরাম নাই,
সুখে দুখে সদা পাই
তোমারি চারু চরণ ॥

সকল অনল নিভিয়া গিয়াছে

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

সকল অনল নিভিয়া গিয়াছে *
তোমার কোমল পরশে,
সকল বেদনা ডুবিয়া গিয়াছে
চরণ-পরশ-হরষে।

গিয়াছে মিটিয়া আশার ছলন,
মজিয়াছে প্রেমে মম প্রাণ-মন,
শত কদম্ব ফুটিছে অঙ্গে
পুলক-অশ্রু-বরষে।

বিভীষিকা গেছে অভয়-বচনে,
মোহ-প্রলোভন আর নাহি টানে,
অন্ধ নয়ন গিয়াছে·খুলিয়া
জ্যোতির্ম্ময় দরশে।

* কানাড়া একতালা।

জুড়াল জীবন আজি

শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

জুড়াল জীবন আজি জুড়াইল রে ! *
বিরস বেদন আজি ফুরাইল রে !
ধরি প্রিয়তম আজ ভুবন-মোহন সাজ
ভাঙ্গা হৃদয়-দুয়ারে দাঁড়াইল রে !

এস এস এস ব'লে ডাকিয়াছি এতদিন
ডাকিতে ডাকিতে মম কণ্ঠ হইল ক্ষীণ,
বিগলিত আঁখি-ধারে
কেঁদে পাই নাই যাঁরে,
নিজ হাতে সে যে আঁখি মুছাইল রে !

শোয়াসে শোয়াসে যাঁর প্রেমের স্মৃতি
দগধি' আকুল মোরে ক'রেছে নিতিনিতি,
আপনারি প্রেমবশে
আসিল সে হেসে হেসে,
সকল ব্যথার বোঝা ঘুচাইল রে !

যৌবন-মন্দিরে আজি

যৌবন-মন্দিরে আজি তোমারি মূরতি হেরি' †
সকল বিষয়-তৃষা গিয়াছি চির-পাসরি'।

হিম-বিন্ধ্য-গিরি কোটি আনন্দে পড়িছে লুটি',
শত রবি-শশী তব চরণ-নখর ঘেরি'।

শুনিতেছি অবিরাম মধুমাখা মহানাম,
অনন্ত সাধক-সিদ্ধ বাজায় নামের ভেরী।

* লগ্নী ঝাপতাল।

† ঝিঝিট খাম্বাজ ঢিমা তেতালা।

লাকসাম
১১ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি চলিয়াছে। লাকসাম স্কুলের বহু ছাত্র ভিজিয়া ভিজিয়া স্কুলে আসিয়াছে। সুতরাং হেডমাষ্টার মহাশয় বাদ্‌লা দিনের (Rainy Day র) ছুটী দিলেন।

হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচরণ তাঁহার ছাত্রদের প্রতি একটী বিষয়ে অবিস্মরণীয় যে, তিনি ছাত্রদিগকে শ্রীশ্রীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ নিজ প্রাণের কথা অকপটে বলিবার জন্য উৎসাহও দিয়াছেন, সুযোগও দিয়াছেন। ইহার ফলে বহু ধ্বংসোন্মুখ জীবনে আত্মগঠনের যুগান্তর ঘটা সম্ভব হইতেছে।

প্রহ্লাদ-চরিত্র অনুসরণ কর

একটী যুবকের গুরুজনেরা অনৈতিকতামূলক একপ্রকার ধর্ম্মমতের অনুসরণ করেন। যুবকটী সেই সম্পর্কে নিজ অসুবিধার কথা বিজ্ঞাপিত করিলে শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে বলিলেন,—প্রহ্লাদের চরিত্র অনুসরণ কর। গুরুজনদের সম্মান নষ্ট করেন নি, পিতার প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করেন নি, অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন নি, অথচ নিজের ব্রতে দৃঢ়, অবিচল, সুস্থির। অত্যাচার উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা কোনো কিছু তাঁকে তাঁর নিষ্ঠা থেকে এক তিল নড়াতে পারে নি। তাঁর মত হও বাবা, তাঁর মত হও। এমন জীবন্ত জ্বলন্ত আদর্শ চখের সাম্‌নে থাক্‌তে চিত্তে দ্বিধা রাখ্‌বে কেন?

ভারতে জন্মলাভ মহাপুণ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা এক মহাপুণ্য। কেন জানো? যখনি জীবনে কোনো সমস্যা আস্‌বে, অমনি তার সমাধান রূপে একটী জীবন্ত আদর্শ চখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাবে। যদি সমস্যা আসে, উপ-যাচিকার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ব্ব? অমনি চখের সাম্‌নে লক্ষ্মণ, উতঙ্ক, অর্জ্জুন এসে দাঁড়িয়ে বল্‌বেন,—আমাদের আচরণ দেখ, শূর্পণখা, গুরুপত্নী ও উর্ব্বশী সম্পর্কে আমরা কি করেছিলাম, স্মরণ কর। যদি সমস্যা আসে, পিতার ঋণ

আমি শোধ কত্তে বাধ্য কিনা, অমনি রামচন্দ্র এসে দাঁড়িয়ে বল্‌বেন,—আমাকে দেখ। যদি সমস্যা আসে, যেখানে নিখিল ভুবনের জনগণের কোনও হিত বা অহিতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেখানে আমি পিতার অন্যায় কামনা পূরণের জন্য নিজের সুখকে বিসর্জ্জন দিব কিনা, অমনি পুরু এসে ভীষ্ম এসে বল্‌বেন,—আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। যদি সমস্যা আসে, যেখানে নিখিল ভুবনের হিতাহিতের প্রশ্ন বিজড়িত, সেখানে আমার প্রতি শত্রুতাচারী বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হ'য়ে আত্মোৎসর্গ কর্ব্ব কিনা, তৎক্ষণাৎ দধীচি এসে উপস্থিত হয়ে বল্‌বেন,—এই চেয়ে দেখ, এই বিষয়ে আমিই প্রমাণ। যদি সমস্যা আসে, আমার শত পুত্রকে যে হত্যা করেছে, তার ভিতরেও গুণ থাক্‌লে সেই গুণের মর্য্যাদা দিব কিনা, তখনি বশিষ্ঠ এসে বল্‌বেন,—আমার জীবন লক্ষ্য কর। আর যখনি সমস্যা আস্‌বে যে, গুরুজন যখন অধার্ম্মিক, বিপথচারী, ইহমুখ ও স্থূলেন্দ্রিয়ের পরিতর্পণ-রত, তখন আমার কর্ত্তব্য কি, তখনি প্রহ্লাদ বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিয়ে বল্‌তে থাক্‌বেন,—অয়মহম্ ভোঃ, এই যে আমি।

অতীতের আদর্শ বস্তা-পচা কল্পনা নয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীতের উজ্জ্বল আদর্শকে, অতুলনীয় তপস্যাকে বস্তাপচা কল্পনার বিলাস ব'লে উপেক্ষা না ক'রে, তাকে নিজ নিজ জীবনের মধ্যে সত্য ক'রে সার্থক ক'রে ধারণ কত্তে শিক্ষা কর। এই সাধনাই ভারতের বাঁচবার সাধনা। অতীতের শিক্ষাকে কেউ কাজে লাগাল না ব'লেই অষ্টাদশ পুরাণের পুণ্যকাহিনী-নিচয়ের পঠন-পাঠন নিতান্তই ভণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভারত যে অতীতের বনিয়াদেই গ'ড়ে উঠ্‌বে, এই কথা তোমরা ভুলে যেও না।

বিবাহ করিয়াও সন্ন্যাসী

অপর একটী বিবাহিত যুবক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দারত্যাগী বা পতিত্যাগিনীর সন্ন্যাস একটী স্বর্গীয় বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভারতে লক্ষলক্ষ এমন লোকও চাই, যাঁরা বিবাহ ক'রেও সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী, যাঁরা সংসারাশ্রমে বাস ক'রেও সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয়

তপস্বী, ভগবদ্‌ভজনই যাঁদের অন্তর্ম্মুখ জীবনের চরম লক্ষ্য, ভগবৎ-সাধকদের তপস্যার সৌকর্য্য-বিধানই যাঁদের বহির্ম্মুখ জীবনের পরম সাধনা, সর্ব্ববিধ দেশ-সমাজ-ও-জাতি-হিতকর কর্ম্মে অকুণ্ঠিত সহযোগই যাঁদের সামাজিক মূর্ত্তি, ভগবৎ-পাদপদ্মে যাঁদের মন-প্রাণ-আত্মা উৎসর্গীকৃত, জীব-সেবায় যাঁদের তনু-বুদ্ধি-ধন সমর্পিত, চক্ষুর্দ্বয় যাঁদের দীন-দুঃখি-আতুরের ব্যথায় অশ্রু-বিগলিত।

গণ্ডী-বন্ধন ছিন্ন করার সাহস চাই

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, অমুকে শূদ্র, এইসব পার্থক্য-বিচার তোমরা ছেলের দল কেন কর্‌বে? তোমাদের তাজা রক্ত, কাঁচা প্রাণ, সকল পার্থক্যকে বিদলিত ক'রে চলার সাহসই তোমাদের থাকা প্রয়োজন। তোমাদের গুরুজনেরা যখন ছিলেন তরুণ, তখনকার যুগকে আজও তাঁরা তাঁদের পক্ককেশের সাথে সাথে বহন ক'রে বেড়াচ্ছেন, কারণ, আবাল্যপোষিত সংস্কারকে একদিনে বর্জ্জন সম্ভব নয়। কিন্তু তোমরা এযুগের ছেলে, এযুগের মত তোমাদের হ'তে হবে, পার্থক্যের গণ্ডী-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার সাহস তোমাদের অর্জ্জন কত্তে হবে।

গণ্ডী-ছেদন কদাচারের ভিত্তিতে নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তোমরা সদাচারের গণ্ডীও ছিন্ন কর্ব্বে। সবাই মিলে অন্ত্যজ-স্বভাব অনুবর্ত্তন কর, ডোম, মেথর মুচি, মুদ্দফরাসকে উদ্ধার কত্তে গিয়ে তাদের স্বভাব তাদের আচার তাদের কদর্য্যতা তাদের বীভৎসতা গ্রহণ কর,—এ কখনো প্রার্থনীয় হ'তে পারে না। অনার্য্যকে আর্য্য কর, অসভ্যকে সভ্য কর, নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট কর, অন্ত্যজকে কুলীন কর, জঘন্যকে পূজনীয় কর,—আর এই উৎকর্ষের মঞ্চে এসে সবাই সমান হ'য়ে দাঁড়াও। গণ্ডী ছিঁড়ে সমান হওয়াই এই যুগের আবাহনী গীতি, কিন্তু কদাচারের ভিত্তিতে সমান হওয়া উচ্চ কিম্বা নীচ কারো পক্ষেই হিতকর হবে না, এ যুগের পক্ষেও গৌরবজনক হবে না।

এ যুগের হিসাব-নিকাশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদিন এযুগের ইতিহাস লেখা হবে। তোমরা

কোথায় কি কি করেছ, তার হিসাব হবে। কোথায় তোমরা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছ, কোথায় তোমরা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছ, কোথায় তোমরা নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়েছ, কোথায় তোমরা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছ, সেদিন তার বিচার হবে। তোমাদের জাত্যভিমান যেমন সেদিন নিন্দিত হবে, তোমাদের কদাচারও সেদিন তেমনি নিন্দিত হবে। কাল-ভৈরব দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর বিচারক। সেদিনকার লজ্জা থেকে বর্ত্তমান যুগকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে তোমাদের, তা ভুলে থাক্‌বার তোমাদের অধিকার নেই।

সদাচারীর সঙ্কীর্ণতা ও কদাচারীর উদারতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদাচারীর সঙ্কীর্ণতা আর কদাচারীর উদারতা, এই দুটী জিনিষের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? নিশ্চিতই আগেরটী, কারণ, কদাচারী ত' আত্মহত্যাকারী! যে নিজেই মৃত, সে উদারতা দিয়েই আর অপরের কতখানি হিতসাধন কত্তে পারে? একটা মদ্যপ লম্পট উপদংশদুষ্ট ব্রাহ্মণের ছেলে যদি মুচীর মেয়ে বিয়ে করে, তবে তাতে মুচীর মেয়ের কি উপকারটী করা হ'ল? বরং তার দেহে রোগ সংক্রামিত ক'রে তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে পুরুষানুক্রমে অসহ্য জ্বালায় দ'গ্ধে মারার ব্যবস্থা হ'ল। সদাচারী ব্যক্তি চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ নিজের লব্ধ মঙ্গলকে সমগ্র সমাজে প্রসারিত ক'রে দিতে অক্ষম হ'ল সত্য কিন্তু সে নিজে যে সদাচারী, তাতে নিজের ব্যক্তিগত যেটুকু বল হ'ল, সেইটুকু ত' পরোক্ষভাবে সমাজেরই লাভ। সমাজের সবগুলি লোক যদি সঙ্কীর্ণ-চেতাও হয়, কিন্তু প্রত্যেকে যদি সদাচারী হয়, তাহ'লে এই সদাচারই সমাজমধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার কর্ব্বে, যাতে অধিকাংশ সঙ্কীর্ণতা আপনি লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাইরে যারা সদাচারের মহিমা-কীর্ত্তন ক'রে বেড়ায়, তাদের মধ্যে প্রকৃত সদাচারীর সংখ্যা যত, লোক-মান-লিপ্সু প্রতিষ্ঠাপিপাসু ছদ্মবেশীর সংখ্যা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

সনাতনী না বিপ্লবী?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদাচার প্রতিষ্ঠার সনাতনী আন্দোলনগুলি যে সকল

হচ্ছে না, তার গোড়ার কারণই এই। আবার জাতিতে জাতিতে সমত্ব-স্থাপনের বিপ্লবী ভাব যে কোনও বাস্তব প্রতিষ্ঠাই পাচ্ছে না, তার কারণ ঐ কদাচারের প্রশ্রয়। আমাকে তোমরা কি বল্‌বে? সনাতনী না ধ্বংসবাদী। আমি ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি, সদাচারের দিকে আমি সনাতনী, সাম্যের দিকে আমি বিপ্লবী। কিন্তু তথাপি যদি আমাকে প্রশ্ন কর যে, আগে সকলের ভিতরে সাম্য প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়ে তার পরে সদাচার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত, না, আগে সদাচার প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়ে তারপরে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করা উচিত, তাহ'লে আমাকে শেষেরটীর পক্ষেই মত প্রকাশ কত্তে হবে, যদিও দুটীকে সমযোগে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদুপায়।

কুলগুরুপ্রথা ও ক্রীতদাস-প্রথা

অপর একটী ছেলের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক দিক দিয়ে বিচার কত্তে গেলে কুলগুরু-প্রথাকে কি প্রাচীন ক্রীতদাস-প্রথারই একটী রূপান্তর-বিশেষ ব'লে মনে করা যায় না? অবশ্য আর্য্য-ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল না, আর যদিও থেকে থাকে, তবে তা' আরব, মিশর ও পরবর্ত্তী আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথার সাথে তুলনায়—স্বর্গ আর নরক। কিন্তু পরে ত' এই ভারতেই ক্রীতদাস প্রথা বিদেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল? কুলগুরু-প্রথাকে কি তার সঙ্গে একটী দিক দিয়ে তুলনা করা চলে না? শিষ্য সহ শিষ্যের বংশাবলীও একটী নির্দ্দিষ্ট গুরু-বংশেরই চিরকাল অধীন হ'য়ে থাক্‌বে, এর মধ্যে কি একটী অবিচার নেই? মহামহোপাধ্যায়ের ছেলে অপোগণ্ড মূর্খ হ'লে তাকে চতুষ্পাঠী চালাবার অধিকার যে দেশে দেওয়া হ'ত না, সেই দেশে গুরুর পুত্র নিতান্ত লঘু হ'লেও মন্ত্র দেবার একমাত্র অধিকারী, এই কথাটা কি যুক্তিসহ? গুরু শিষ্যকে চিরকালই শিষ্য ক'রে রাখ্‌বেন, সাধন ক'রে, ভজন ক'রে বা ত্যাগ, তপস্যা ও সদাচারের মহিমায় শিষ্য কখনই গুরুর পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পার্ব্বেন না, এ অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। আজ যে টোলের ছাত্র, কাল সে টোলের অধ্যাপক হচ্ছে, আজ যে কবিরাজের সহকারী বালক, কাল সে অধ্যয়ন ও অভ্যাসের বলে নিজেও বৈদ্যরাজ হচ্ছে, কিন্তু আজ যে গুরুর শিষ্য, সে

নিজে বা তার বংশে কেউ কঠোরতপা ও উগ্রসাধক হ'লেও তারা পুরুষানুক্রমে শিষ্যই থেকে যাবে,—এটী সকল সুযুক্তিকে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। সুতরাং এইদিক্ দিয়ে যদি বিচার কর, তবে দেশপ্রচলিত কুলগুরু-প্রথাকে অস্বীকার ক'রে চলাই সঙ্গত হ'য়ে পড়ে।

কুলগুরুকে সমর্থনের একটী দিক্

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কিন্তু কুলগুরুদের আর যত দোষই থাকুক, একটী দিক্ দিয়ে সমর্থনের মস্ত কথা আছে। সেইটী হচ্ছে এই যে, এঁদের চৌদ্দ গোষ্ঠীকে চেন, সুতরাং অসাধনজনিত অক্ষমতার কথা বাদ দিলে অন্য-দিক্ দিয়ে এঁরা তোমার গুরুতর ভাবে কোনও ক্ষতি কত্তে পারেন না। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে মহৎ জেনে বরণ করার পরে অনেক হৃদয়-বিদারক দুঃখ পেয়ে তোমাকে অনুতাপ কত্তে হ'তে পারে। এরকম শত শত ঘটনা সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত ঘটছে ও অনেকেই কিল খেয়ে কিল চুরী কচ্ছে, তাই প্রকৃত সংবাদ বাইরে প্রচার অতি অল্পই হচ্ছে।

আদর্শ সমাজে গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সমাজ, শিষ্য এবং গুরু, এই তিনটী সম্পর্কে প্রকৃত ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত জান? প্রথম কথা এই যে, সাধকের সমাজে কোনও মানুষকেই গুরু ব'লে মনে করা হবে না। যে-কোনও অগ্রসর সাধক, যে-কোনও সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে নেবেন, কিন্তু নিজেকে গুরু ব'লে অভিমান কর্ব্বেন না, দীক্ষিত ব্যক্তিকেও শিষ্য ব'লে জ্ঞান কর্ব্বেন না। যে মহামন্ত্রে দীক্ষা হ'ল, সেই মহামন্ত্রই হবেন গুরু, নিতান্ত মানবীয় আলম্বন প্রয়োজন হ'লে ঊর্দ্ধপরম্পরায় আদি-গুরুই হবেন সকলের গুরু, আর দীক্ষাদাতা-ও-দীক্ষিত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে হবেন পরস্পরের গুরু-ভাই। দীক্ষাদাতার পুত্র দীক্ষাপ্রাপ্তের পুত্রকে দীক্ষা দিতে অধিকারী হবেন না;—বিবাহের কালে যেমন সগোত্র বর্জ্জন করা হয়, পরবর্ত্তীদের দীক্ষা কালেও ঠিক তেমনি এই বিষয়টীতে কঠোর বর্জ্জন-নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে চল্‌তে হবে। যদি ততদিনে সমাজ থেকে জাতিভেদ-প্রথা উঠে যায়, উত্তম। যদি না উঠে যায় বা আংশিক

পরিবর্ত্তিত হ'লেও জন্ম দ্বারা সম্মান বা অসম্মান লাভের পথ যদি আংশিকভাবেও খোলা থাকে, তাহ'লেও অগ্রসর সাধকের কাছে দীক্ষা নেবার বেলা কেউ তাঁর জাতি-গোত্রের শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতার বিন্দুমাত্র বিচার কর্ব্বে না, তাঁর জীবনের সাধুত্ব ও সাধকত্বের মর্য্যাদাই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হবে।

জগতের সকল লোককেই সাধক মনে করা উচিত

লাকসাম হাইস্কুলের একজন শিক্ষকের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কে যে সাধন-ভজন করে, আর কে যে করে না, বাইরে থেকে তা বুঝা কঠিন। একজন হয় ত ফোঁটা-তিলকও কাটে, মালা-ঝোলাও ব'য়ে বেড়ায়, আসনে ব'সে দু-চার ঘণ্টা কাল হয়ত চোখ বুজে ব'সেও থাকে, কিন্তু তথাপি হয়ত সাধন-ভজন কিছুই করে না। আর একজন হয়ত বড়শীর ছিপে আধার দিয়ে সারাদিন খালের ধারে ব'সে মাছ ধরে, ঠাকুর-ঘরের ধার ধারে না, ভস্ম মাখে না, জটাধারণ করে না, অথচ সুতীব্র সাধক। বাইরের আচরণ দেখে যখন কারো ভিতরের অবস্থা বোঝ্‌বার উপায় নেই, তখন জগতের সকল লোককেই প্রচ্ছন্নচারী সাধক জ্ঞান ক'রে মনে মনে সম্মান ক'রে চলা উচিত।

সাধন-ভজন ও ভোগেচ্ছা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এমন প্রয়োজন পড়তে পারে, যখন কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট লোক সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করার দরকার। নইলে হয়ত ঠক্‌তে হবে। তেমন ক্ষেত্রে তার দোষ-গুণ পরীক্ষার অধিকার আমার আছে। যদি দেখা যায়, লোকটী মায়ার বশীভূত হ'য়ে অবিরাম ভোগবাঞ্ছাই কচ্ছে, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, লোকটী আর যাই করুক, সাধন-ভজন বিশেষ কিছু কচ্ছে না। আবার যদি দেখা যায় যে, লোকটীর অন্যান্য সদ্‌গুণ যাই থাকুক আর না থাকুক, তার আসক্তি নেই, ভোগবুদ্ধি নেই, সুখলিপ্সা নেই, তবে বুঝতে হবে যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সাধন-ভজন হচ্ছেই। কিন্তু যেখানে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ খবর জেনে নেওয়ার কোনও জরুরী প্রয়োজন নেই, সেখানে কার ভোগলিপ্সা

আছে আর কার নেই, কে মায়াসক্ত আর কে মায়ামুক্ত, এই সব খুঁজতে যাওয়া পরচর্চ্চারই সামিল হবে।

ভক্তিলাভ ও পুরুষকার

পুনরায় অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা কহিলেন,—সাধক হ'লেই যে কেউ ভক্ত হবে, এমন নয়। বহু সাধন বহু ভজন ক'রে তবে সাধক ভক্তিলাভ করে, ভক্ত হয়। ভক্তি হচ্ছে পরানুরক্তি। অর্থাৎ, যার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর হ'তে পারে না, সেই ভালবাসাই ভক্তি। বহুকাল সাধন-ভজন ক'রে ভগবৎ-কৃপায় পরানুরক্তি আসে। ভক্তি পুরুষকার-সাধ্য নয়, কিন্তু সাধন কত্তে কত্তে কোনও এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়, ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হ'তে থাকে। এই জন্যই ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিকেও পুরুষকার প্রয়োগ কত্তে হয়। ভগবানকে ভালবাসা এমনই এক বস্তু যে, কোনও বিদ্যালয়ে একে শিক্ষা করা যায় না, কেউ এসে শিক্ষা দিতেও পারে না। কিন্তু ভক্তদের জীবনকে চখের সাম্‌নে আদর্শ-স্বরূপ রেখে ভগবানের পরম পবিত্র নামকে অবিরাম সাধ্‌তে সাধ্‌তে বহু জন্মের ব্যর্থ পুরুষকার একদিনে এক নিমেষে সার্থক হ'য়ে যায়।

ভক্তির ঊষা-প্রকাশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সূর্য্য উঠ্‌বার আগে যেমন ঊষা-প্রকাশ দেখা যায়, ভক্তির উদয় হবার আগেও তেমন তার প্রাগ্‌লক্ষণ টের পাওয়া যায়। সেই-গুলি হচ্ছে, ভগবানের নাম মিষ্টি লাগা, ভগবদ্-ভক্তদের কথা মিষ্টি লাগা, পরনিন্দা বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিন্দা বিষবৎ লাগা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে চেনা-চেনা, জানা-জানা, আপন-আপন বোধ হওয়া, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই যেন অবিরাম তাঁরই মধুময় নাম-গান কচ্ছে, এই রকম বোধ হওয়া এবং ভগবদ্দর্শনের অভাবকে অসহনীয় দুঃখ ব'লে মনে হওয়া।

১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

নিন্দায় অধীর হইও না

বেলা প্রায় একদণ্ড হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে তাঁহার প্রাণের কতকগুলি বেদনা নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহৎ জীবনের সুমহান্ আদর্শের মূল্য যারা বুঝবে না, তারা ত' নিন্দা কর্ব্বেই। এটা ত' অত্যন্ত স্বাভাবিক! কেন তুমি এতে বিচলিত হচ্ছ? নিন্দুকের নিন্দা-ভাষণে কর্ণপাত ক'রো না। সাধন-পথের যারা পথিক, নিন্দা তাদের অঙ্গের ভূষণ। সুগহন বন-পথ বেয়ে চলেছ। সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য হস্তী যেখানে প্রচুর, সেখানে মাত্র দুটী কণ্টকাঘাত পেয়েই তুমি অধীর হ'তে পার না।

দস্তুরমত দুর্ভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার যিনি প্রিয়, তাঁর যদি হয় নিন্দা, তখনও ম নিন্দা দিয়ে নিন্দার, ক্রোধ দিয়ে ক্রোধের প্রতিবাদ কত্তে যেও না। একজন বৈষ্ণবকে ব'ল্তে শুনেছিলাম যে, কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে যদি চিত্তে ক্রোধ আসে, তবে সেই ক্রোধ অপ্রাকৃত ক্রোধ, অপার্থিব দিব্য ক্রোধ, তাতে নাকি ভক্তের কোনও ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ হরিতে ভক্তি বাড়ে। আমি এ যুক্তিটা ঠিক্ বুঝি না। প্রিয়জনের নিন্দা শুনে যখন ক্রুদ্ধ হই, তখন কতটুকু সময়ের জন্য প্রিয়জনের মধুময় ধ্যান ছেড়ে নিন্দুকের পাপমূর্ত্তি ধ্যান কত্তে বাধ্য হই। এটা দস্তুরমত দুর্ভাগ্য।

তোমার প্রিয়জনের নিন্দুকও তোমার অপ্রিয়জন নহেন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার প্রাণের জনকে যখন কেউ নিন্দা করে, তখন জান্‌বে, নিন্দুক তোমার প্রাণ-বল্লভের ধ্যানই কচ্ছে, তারই নামকে বারংবার জপ কচ্ছে। তবে বিধিপূর্ব্বক না ক'রে অবিধিপূর্ব্বক কচ্ছে। বিধিপূর্ব্বক জপ-ধ্যান কর্ল্লে যা ফল হয়, অবিধিপূর্ব্বক কর্ল্লে তার বহুগুণ কম হয়, কিন্তু কিছু হয়। অনুক্ষণ চোরকে এবং চৌর্য্যকে নিন্দা কত্তে কত্তে একজন সাধু-সজ্জনও নিজের অজ্ঞাতসারে চোরের স্বভাব একটুখানি পেয়ে ফেলেন। সাধুকে ও সাধুত্বকে নিন্দা কত্তে কত্তে একজন চোর তদ্রূপ সাধুর স্বভাব নিজের অনিচ্ছায় কতকটা পেয়ে ফেলে। সুতরাং তোমার প্রাণপ্রিয়ের যে নিন্দা কচ্ছে, তার প্রতি প্রসন্ন হও এবং সে যে নিন্দাচ্ছলেও তাঁর স্মরণ-মনন কচ্ছে, এজন্য তার প্রতি ভক্তিশীল হও। তোমার প্রিয়জনের নিন্দুকও তোমার অপ্রিয়জন নন, কারণ অশ্রদ্ধা-

সহকারে উচ্চারণ কল্লে'ও তোমার প্রিয়জনের নামোচ্চারণ সে যতবার কচ্ছে, নামের গুণে ক্রমশ সে তাঁর তত সমীপস্থ হচ্ছে। নামের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে তার ভিতরে কাজ কচ্ছে।

বর্জ্জন কর, বিদ্বেষ করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য ব্যবহারিক ভাবে তুমি নিশ্চিতই তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে চল্‌বে। তার মনের অশ্রদ্ধাটার ছোঁয়াচ তুমি নিতে পার না। তার চিত্তের বিদ্বেষটুকু অনুসন্ধান ক'রে তুমি তোমার প্রাণপ্রিয়কে ভুলে থাক্‌বার দুর্য্যোগ বাড়িয়ে নিতে পার না। এই জায়গায় তোমার অন্তরের বিপুল দৃঢ়তার পরিচয় থাকা চাই। কিন্তু তার প্রতি ফিরে তুমি বিদ্বেষ ক'রো না।

দুঃখ সহিতে সম্মত থাক

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—আর তোমার প্রতি উচ্চারিত অশিষ্ট ভাষণের কথা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, মাত্র শিশির কণাইত' তোমার গায়ে পড়্‌ছে, সমুদ্র ত' দেখই নাই! জীবনে কত নাকানি-চুবানি খাবে, কত মনঃক্লেশ পাবে, কিন্তু তুমি কার, কে তোমার, সে কথা নিমেষের জন্যও ভুলে যেও না। দুঃখ যে সইতে রাজি, দুঃখ তার কাছে এসেই ধন্য হয়।

দ্বিপ্রহরের ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবা চট্টগ্রাম রওনা হইয়াছেন। ফেণী ষ্টেশনে একদল যুবক তাঁহার চরণ-দর্শনের জন্য সমাগত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা সকলকে নানা উপদেশাদি দিয়া বিদায় করিলেন।

স্বদেশ-সেবা

একজন যুবক শ্রীশ্রীবাবার সহিত চট্টগ্রাম চলিল। তাহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বদেশ-সেবা বস্তুটা কি? এটা কি স্বদেশের মাটিটার পূজা, না গরু-মহিষাদি জন্তুদের পূজা? না, মানুষের অভাব-পূরণ? স্বদেশের যেখানে যে প্রাণীটী আছে, তার যেখানে যে অভাব, সেইখানেই সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টার নাম স্বদেশ-সেবা। যে প্রকৃতির কর্ম্মীরা যে জাতীয় অভাবটুকুর পূরণের সামর্থ্য আছে, সে তাতেই প্রাণ ঢেলে দিক্। এরই নাম স্বদেশ-সেবা।

স্বদেশ-সেবার বৈচিত্র্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভোজের বাড়ীতে পরিবেশ্য উপকরণের বৈচিত্র্য থাকে। গলা টিপে এই বৈচিত্র্যকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কেউ করে নি। তবে কার্য্য-শৃঙ্খলার জন্য বৈচিত্র্যের ভিতরেও সাদাসিধে ভাবটা আন্‌বার চেষ্টা হয়েছে। স্বদেশ-সেবা সম্বন্ধেও তাই। নানা জন নানা ভাবে স্বদেশ-সেবা কর্ব্বে। একজনের কার্য্য অপরাপরের কার্য্যের সঙ্গে বৃথা কোনও বিরোধিতা সৃষ্টি না করে, তার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। অতটুকু সংযম সকলকেই প্রতিপালন কত্তে চেষ্টা কত্তে হবে। কিন্তু ষ্টীম-রোলার চালিয়ে সব কর্ম্মপন্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়ে একটায় পরিণত করার বুদ্ধি অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি ছাড়াআর কিছুই নয়।

স্বদেশ-সেবার উত্তেজক কারণ-সমূহের বিভিন্নতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বদেশ-সেবার উত্তেজক কারণ-সমূহের বিভিন্নতাই ভিন্ন ভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপন্থায় আকৃষ্ট করে। কিন্তু স্বদেশের হিত যখন প্রত্যেকের কাম্য, তখন মত-বিরোধের এবং পথ-বিরোধের স্থলে বিদ্বেষকে প্রাণপণ যত্নে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা না করাও ত' একপ্রকারের দেশদ্রোহিতা।

হিংসা-বিদ্বেষকে নির্ব্বাসিত কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে যেভাবেই স্বদেশ-সেবা করুক, আমার কথা এই যে, হিংসা আর বিদ্বেষ এই দুই জিনিষকে শত যোজন দূরে রাখ্‌বে। হিংসা-বিদ্বেষ বড় শক্তিক্ষয় করে, বড় বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়, নীচতা আর অপকার্য্যের বড় প্রশ্রয় দেয়। দেশ ও সমাজকে সেবা দেওয়া যার অভিপ্রায়, সে যেন তার হৃদয়-ফলকে কঠিন হস্তে লিখে রাখে—"হিংসা-বিদ্বেষকে নির্ব্বাসিত কর।"

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা আসিয়া চট্টগ্রাম পৌছিলেন।

চট্টগ্রাম

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

ইহকালে পরকালে অভ্যুদয়ের পথ

শ্রীশ্রীবাবা পূজনীয় শ্রীযুক্ত নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পাথরঘাটা আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। অপরাহ্নে কতিপয় যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিলেন।

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আড়ম্বর প্রাণপণে বর্জ্জন করবে। সাদাসিধে জীবন-প্রণালী গ্রহণ করবে! পরনিন্দা বর্জ্জন করবে। অধিক লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে। একান্ত সাধু, সজ্জন, ঈশ্বর-ভক্ত ও অদোষদর্শী ব্যক্তির সঙ্গ করবে। তোমার চাইতে যারা নিকৃষ্ট, তাদের উন্নত কর্ব্বার জন্য এমনভাবে চেষ্টা কর্ব্বে যেন এই চেষ্টায় আবার তোমার অবনতি না হয়। যাঁরা তোমার চাইতে উচ্চ, তাঁদের চরিত্র অনুশীলন কর্ব্বে। তাঁদের কোনও আচরণ যদি দুর্ব্বোধ্য হয়, তাহ'লে তার চর্চ্চা পরিত্যাগ কর্ব্বে। মহৎ অমহৎ সকল লোককেই মহৎ ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে, কিন্তু যাঁদের সংসর্গে তোমার চিত্তের উন্নতিমুখিনী বৃত্তিগুলির বিকাশ ও সৌন্দর্য্য বাড়ে, বেছে বেছে মাত্র তাঁদেরই সঙ্গ করবে। সাধু হ'তে চেষ্টা করবে কিন্তু লোকের কাছে সাধু ব'লে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা থেকে দূরে থাকবে। কোনও নরনারীর গোপন জীবন জানবার চেষ্টা কর্ব্বে না, কোথাও সেই সব আলোচনা হ'তে থাকলে সেই স্থান ত্যাগ করবে। দৈনিক একবার ক'রে আত্ম-পরীক্ষা কর্ব্বে যে, উন্নত হচ্ছ কি অবনত হচ্ছ এবং এই পরীক্ষার ফলানুযায়ী আত্মসংশোধনের চেষ্টা করবে। আলস্য আর হতাশা, এই দুইটী বস্তুকে মহাশত্রু ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে এবং নিজ-হিত-সাধনের বেলাও এমনভাবে কাজ কর্ব্বে যেন পরোক্ষভাবে অন্ততঃ একটী জীবেরও মঙ্গল তাতে হয়। সংসারের সকলকেই ভালবাসবে, পাত্রাপাত্র বিচার নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ভগবানই যে তোমার সকল ভালবাসার উৎস, এই কথা নিমেষের জন্যও ভুলবে না। অতিথির মত সসঙ্কোচে সংসারে বাস কর্ব্বে, দাসের মত সকলের সেবা কর্ব্বে, প্রভুর মত সকলের অহিত নিবারণ কর্ব্বে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্ত্তে ডাক এলেই সংসার ছেড়ে চিরবিদায়ের পথে যাত্রী হবার জন্য যাতে পাথেয়ের অভাব না পড়ে, তার দিকে খরদৃষ্টি রাখবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই দেহাতীত আত্মা ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে এবং তোমার সকল সম্বন্ধ বিদেহীর সাথে এ কথা স্মরণ রাখবে। এই ভাবে যদি সযত্নে জীবন গঠন কত্তে থাক, তা হ'লে তোমার ইহকালে পরকালে অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

মূলে ভুল

মোচাগড়া ও পূর্ব্বধৈর নিবাসী কয়েকজন ব্যবসায়ী শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শতদিকে দৃষ্টি দিও না, একজনকে ভজ, একজনকে নিয়েই মজ।

শত পতি যার, সে কি পাবে পার ?
বহুজনে রত, যাবে ছারখার।

জেলা বোর্ডের রাস্তায় বটগাছ পোতা হ'ল, তাকে রক্ষা কর্ব্বার জন্ম চারিদিকে কাপিলার বেড়া দেওয়া হ'ল। কালক্রমে অযত্নে অনাদরে বট গেল ম'রে, কাপিলা গাছই চিরজীবী অক্ষয় হ'য়ে বাড়্তে লাগ্ল, লক্ষ্যের হ'ল বিস্মৃতি, উপলক্ষ প্রধান হ'য়ে দাঁড়াল। তোমাদের শনিপূজা, লক্ষ্মীপূজা এসব শত শত দেবদেবীর অর্চ্চনার অবস্থা বাবা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। জগদ্ব্যাপী সকল পূজা যে একজনেরই পূজা, একজনের ছাড়া দুজনের যে পূজা হ'তে পারে না, একজনকে নিয়ে প্রাণের নিবিড় গভীর সম্বন্ধ স্থাপনই যে জীবনের একমাত্র ব্রত, সেই মূলে ভুল হ'ল, ছায়া নিল কায়ার স্থান, শাখায় ঘু'রে ঘু'রে জীবন বৃথাই কেটে গেল।

চট্টগ্রাম
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

ডাকা আর পাওয়া

অপরাহ্ণে কতিপয় যুবক আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে প্রেমভরে ডাকা আর তাঁকে পাওয়া একই কথা। যতবার ডাকৃছ, ততবারই তাকে পাচ্ছ, শুধু অনুভূতিশক্তির আড়ষ্টতার জন্য উপলব্ধি কত্তে পাচ্ছনা। অবিরাম ডেকে যাও। ডাকৃতে ডাকৃতে আধার শুদ্ধতর হবে, বৃহত্তর হবে, অনুভূতিগুলিও স্পষ্টতর হবে, বৃহত্তর হবে।

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আহার কমাবার জন্ম

আর কুম্ভক আয়ত্ত কর্ব্বার জন্য জবরদস্তি নিষ্প্রয়োজন। বিনা বলপ্রয়োগে যেখানে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেখানে জোর খাটান ঠিক্ নয়। অল্প বলে যাতে বেশী কাজ হয়, তার জন্যই কৌশলের সৃষ্টি। যতক্ষণ কৌশলে কাজ চলে, ততক্ষণ হঠপন্থা গ্রহণ কাজের কথা নয়। যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্। তবে, হঠপন্থায় লোকের বিশ্বাস যত সহজে আসে, কৌশলের উপর বিশ্বাস তত সহজে আসে না। কারণ হঠপন্থার ফল হাতে হাতে দেখা যায়। কৌশলের কাজ অল্পায়াসে আয়ত্ত হয় কিন্তু ফল আস্তে আস্তে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, এলোপ্যাথিক ঔষধের গুণ হাতে হাতে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের গুণ আস্তে আস্তে, কিন্তু একটীর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, অপরটীতে তা নেই।

আহার-কমাইবার কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আহার কমাবার হঠকৌশল হ'ল রোজই কিছু কিছু ক'রে কম খাওয়া। যেমন একটী নারকেলের মালা যদি রাখো, যাতে করে মেপে আহারীয় গ্রহণ কর্ব্বে এবং রোজই যদি মালাটীকে একটু একটু ক'রে ঘ'ষে ক্ষয়িত কর্ত্তে থাকো, তা হ'লে আধসের চালের ভাতের মরদ অভ্যাসের ফলে আধ পোয়া চালে দেহধারণ কর্ত্তে পারে। কিন্তু রোজ যখন নারকেলের মালাটী ক্ষয়িত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরের অভাব এবং সেই অভাব-পূরণের প্রয়োজনও কি ক্ষীয়মান হচ্ছে? নারকেলের মালার ক্ষয়ের সঙ্গে তোমার অভাব পূরণের প্রয়োজন-ক্ষয়ের কি কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে? তা না হ'য়ে থাক্‌লে এই পন্থায় আহার কমাতে গিয়ে তুমি ভবিষ্যতে গুরুতর শারীরিক বিপ্লবের সম্মুখীন হ'তে বাধ্য হবে। এই জন্যই তোমার চেষ্টা ধাবিত হওয়া উচিত আহার কমাবার দিকে নয়, শরীরের অভাব-হ্রাসের দিকে। ক্ষয়ের ফলে শরীরের প্রত্যেকটী তন্তু ক্ষুধিত হয়, পিপাসিত হয়। সূক্ষ্মপথে যদি তাদের ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা থাকে এবং সূক্ষ্মভাবেই যদি তাদের সাধ্যমত ক্ষয়রোধ করা হয়, তাহ'লে আহারের প্রয়োজন যে আপনি ক'মে যাবে। প্রয়োজন ক'মে গেলে, জোর ক'রেও আর তুমি গিল্‌তে পার্‌বে না, দেহমন আহারীয়

গ্রহণ কত্তে চাইবে না। কিন্তু তৎসাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবৎ-সাধন,— নামজপ আর ধ্যান। আহার কমাবার এইটীই হচ্ছে প্রধানতম কৌশল।

কুম্ভকের কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জোর ক'রে কি কুম্ভক হয় না? খুব হয়, কিন্তু কত বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে প্রাণায়াম সাধন ক'রে যে কুম্ভককে আয়ত্ত কত্তে হয়, তা বলার নয়। নিয়ম থেকে এক চুল স'রে যাও, ব্যাধিতে পড়্‌বে। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাসে আর প্রশ্বাসে যে স্বাভাবিক প্রাণায়াম চলেছে, তার সাথে সাথে ভগবানের নাম জ'পে যাও, একদিন দুদিনে কিছু না বুঝলেও বহুকাল পরে নিজেই লক্ষ্য ক'রে অবাক্ হবে যে, শ্বাস আর প্রশ্বাসের মাঝ-খানে একবার ক'রে, বা প্রশ্বাস আর শ্বাসের মাঝখানে একবার ক'রে, বা উভয় অবস্থাতেই একবার ক'রে আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসের পূর্ণ বিরতি হচ্ছে। এই বিরতি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে নিরপেক্ষ নিরালম্ব পূর্ণ কুম্ভকে পরিণত হ'য়ে যাবে। সুতরাং শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপই কুম্ভক হওয়ার শ্রেষ্ঠ কৌশল।

শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট কর

রাত্রিতে বক্সিরহাট হইতে চণ্ডীদ্বার-নিবাসী দুইটী যুবক আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—লালসাকে পোষণ কর্ল্লে পালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সার্কাসওয়ালার ঘাড় ভাঙ্গবে। সুতরাং ইতর লালসাকে প্রশ্রয় দিও না। আজ যাকে আদরে বাড়িয়ে তুল্‌ছ, কাল সে তোমার বুকের রক্ত পান কর্‌বে। পার যদি, শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট কর।

চট্টগ্রাম
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

জগদুদ্ধার ও আত্মোদ্ধার

ত্রিপুরা হোসেনতলা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের সুমঙ্গল ব্রত তোমাকে সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া পালন করিতেই হইবে। তোমার চরিত্রের বল তোমাকে সফলতা দিবে। তোমার

সাধন-নিষ্ঠা তোমাকে অফুরন্ত উৎসাহ যোগাইবে। তোমার ধৃতবীর্য্যতা অপরের মধ্যে তোমার উপদেশ-বাণী সহজে-সঞ্চারণ-যোগ্য করিবে। এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি, জগদুদ্ধারের শ্রেষ্ঠ পথ আত্মার উদ্ধার, পরসংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায় আত্ম-সংশোধন। পরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে সর্ব্ববিধ পঙ্কিলতা হইতে প্রমুক্ত রাখিবার আপ্রাণ প্রয়াস তোমাকে পাইতেই হইবে। নিজের চরিত্রে সহস্র কলঙ্ক রাখিয়া শুধু আচ্ছাদনীর জোরে বা ছদ্ম-বেশের শক্তিতে অপরের চরিত্র-মধ্যে পবিত্রতার দিব্য-সুন্দর শ্রী আরোপিত করা যায় না।"

অখণ্ডের বিশিষ্টতা

রহিমপুর নিবাসী জনৈক ভক্ত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"যাহারা আমার সন্তান, তাহাদের জীবনের প্রত্যেকটী আচরণে, প্রত্যেকটী ঘটনায়, প্রত্যেকটী আবর্ত্তনে একটী দৈবী বিশিষ্টতার বিকাশ ঘটা চাই। এই কথাটী মনে রাখিয়া নিজেকে 'অখণ্ড' বলিয়া জগৎ-সমাজে পরিচিত করিবে। তোমাদের সাধন জগৎ-কল্যাণের সাধন,—তোমাদের আত্মো-দ্ধার ও জগদুদ্ধার যুগপৎ চলে। একাকী মোক্ষলাভের লোভ তোমার নহে, একাকী বৈকুণ্ঠধামে গমন তোমার প্রার্থনীয় নহে। তুমি আত্মোদ্ধার-পরায়ণ হইয়াও জগন্মঙ্গলকারী, লোক-কল্যাণ-সাধক হইয়াও আত্ম-কল্যাণ-প্রসারী। স্বার্থ ও পরার্থের, ঐহিকের ও পরমার্থের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী তুমি,—তোমার বিশিষ্টতা এইখানেই।"

গুরুভক্তির স্বরূপ

অপরাহ্নে চারি পাঁচ জন দীক্ষিত-শিষ্য শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আসিয়াছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, আপনাকে ভগবান্ বলে জান্‌বার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এইরূপ ভাব্‌বার প্রয়োজন কি?

পরিমল বলিলেন,—নইলে গুরুভক্তি হবে কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু পথ ব'লে দিয়েছেন, সেই পথই নিত্য, সেই পথই সত্য, সেই পথ প্রাণান্তেও বর্জ্জন কর্‌ব না, অন্য কোনো পথের প্রতি কোনো অবস্থাতেই আকৃষ্ট হব না, সাধন নেবার পর থেকে একদিনের জন্যও আলস্যে কাটাব না,—এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বনের নামই গুরুভক্তি। সেই গুরুভক্তি তোরা অর্জ্জন কর্‌। গুরু পথ বলেছেন, সেই পথে অবিচলিত বিক্রমসহকারে চ'লে তোরা পরমগুরুকে লাভ কর্‌।

চট্টগ্রাম
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

তোমার সর্ব্বস্ব ভগবানের

ঢাকা-চম্পবন্দী নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবা পত্রে লিখিলেন,—

"তোমরা মা মহাশক্তির অংশসম্ভূতা, তোমাদের মধ্যে তাঁর সমস্ত শক্তিই সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। নিজেকে তাঁর সহিত অভেদ জানিয়া সঙ্গোপিত অসীম শক্তির উন্মেষ সাধন কর। প্রত্যহ তাঁর সহিত নিজের দেহ, মন ও প্রাণের সংযোগ ঘটাইয়া তোমার জগৎ-পালনী শক্তিকে সম্প্রসারিত কর। এ-সংযোগের পথ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া। ভগবানের পায়ে যে নিজেকে অঞ্জলিস্বরূপ অর্পণ করে, তার দেহে-মনে-প্রাণে ভগবানের দিব্য সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকাশিত হয়। তোমার দেহ তোমার নহে, শ্রীভগবানের ; তোমার মন তোমার নহে, শ্রীভগবানের ; তোমার জীবন, তোমার যৌবন, তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার আশা, তোমার ভাব, তোমার ভাষা, সব ভগবানের। তুমিও তোমার নহ, দ্বৈতের দিক্ দিয়াও তুমি তাঁর, অদ্বৈতের দিক্ দিয়াও তুমি তাঁর। অহর্নিশ এই চিন্তায় ভরপুর হইয়া থাক, আর নিষ্কাম নিঃস্পৃহ নিরুদ্বেগ অন্তরে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। দেখিও, কোনও চিত্ত-মালিন্য, কোনও কলুষ-কালিমা তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারিবে না।"

ধর্ম্মপত্নীকে কিরূপ শিক্ষা দিবে ?

নাগপুর কালামনা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার ধর্ম্মপত্নীকে প্রত্যেক পত্রে এই ধারণাই দিতে থাকিও যে, সাংসারিক সহস্র ঝঞ্ঝাটের মান রাখিয়াও তাহাকে ঈশ্বর-সমর্পিত-প্রাণা যোগিনী হইতে হইবে। দেহ দেহের কাজ করিবে, চিত্ত ঈশ্বরে লাগিয়া থাকিবে; চক্ষু দেখিবে, কর্ণ শুনিবে, অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে কিন্তু মন পরমাত্মার সুখময় সঙ্গ করিতে থাকিবে। পিতার কন্যারূপে, ভ্রাতার ভগ্নীরূপে, স্বামীর পত্নীরূপে, সন্তানের মাতারূপে দেহ তার স্বকীয় কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুচারুরূপে পালন করিবে, কিন্তু মন-প্রাণ পরমেশ্বরের পরমামৃত-সাগরে পরমনির্ভরে নিমজ্জিত রহিবে। যাহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, এই শিক্ষা তুমি তাহাকে অবিরত প্রদান করিতে থাক।

"নরনারীর দাম্পত্য-জীবনে দৈহিক মিলনের জন্যও একটী নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে। এই অধিকার হইতে গৃহীকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা সম্যক্ কল্যাণপ্রসূ নহে। ভোগায়তন দেহ ভোগের পানে তাকাইবেই, ভোগতৃপ্তির দ্বারা তার সাময়িক তৃষ্ণা মিটাইবার চেষ্টা থাকিবেই। ধর্ম্ম যদি এখানে আসিয়া বাধার প্রাচীর গড়িতে চাহে, তাহা হইলে হয় ধর্ম্মকে, নতুবা গার্হস্থ্য জীবনকে জগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। এই জন্যই অতি প্রাচীন যুগেই আর্য্য ঋষির সূক্ষ্মদৃষ্টি ধর্ম্মকে গার্হস্থ্যের অনুকূল এবং গার্হস্থ্যকে ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া জীবনালেক্ষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং এই সামঞ্জস্যময় প্রবর্ত্তনা প্রভূত মঙ্গলকে উদ্বোধিত করিয়াছিল।

"কিন্তু ধর্ম্মকে গার্হস্থ্যের অনুকূল কখন করা সম্ভব? যখন গৃহী সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অসীম ইন্দ্রিয়ের বিকাশ চাহে। গার্হস্থ্যকেই বা ধর্ম্মের অনুমোদিত কখন করা যায়? যখন গৃহী স্বকীয় আশ্রমকে, স্বকীয় আশ্রমের প্রত্যেকটী আয়োজন ও প্রয়োজনকে ব্রহ্মস্মৃতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করে, স্ত্রী যখন স্বামি-সেবা করিতে বসিয়া ব্রহ্মসেবার রসাস্বাদন পায়, স্বামী যখন স্ত্রীকে ভালবাসিতে যাইয়া ব্রহ্মপ্রীতির উপলব্ধি লাভ করে, তখন। স্বামী যখন স্ত্রীকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া পরমাত্মার পরমপেলব স্পর্শসুখের মধুময়

হিল্লোল অনুভব করে, স্ত্রী যখন স্বামীর বুকে আত্মসমর্পণ করিয়া পরব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় প্রেমবারিধির মৃদু-তরঙ্গায়িত বারি-প্রবাহে ডুবিয়া যায়, তখন। দেহ-সুখে প্রমত্ত রহিয়াও মন-প্রাণ যখন ব্রহ্মানুভূতির পরমসুখকে একমাত্র অনুভূত সত্য বলিয়া উপলব্ধি পায়, তখন।

"অবশ্য, সাধন ছাড়া ইহা হয় না। এজন্য ভগবৎ সাধনাতেই তোমাদের দুজনকে প্রাণাত্যয়-সঙ্কল্প করিয়া ব্রতী হইতে হইবে।"

জোর করিয়া কলসী ডুবাও

ত্রিপুরা বিষ্ণাউড়ী নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার অন্তরের ভাণ্ডারে যে রিক্ততা অনুভব করিতেছ, অবিচ্ছেদ সাধনার দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া লও। জলের মধ্যে না ডুবাইলে কাহারও শূন্য কুম্ভই পূর্ণ হয় না। সাধন-সমুদ্রে ডুব দাও, সকল অপূর্ণতা আপনি পরি-সমাপ্তি পাইবে। ডুবাইতে পারিলে কলসী আপনি ভরে, জোর করিয়া ডুবাইয়া দেওয়াই তোমার পুরুষকার।

সর্ব্বাবস্থায় সাধনের সুযোগান্বেষণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক ভক্তের রাজনৈতিক কারণে জেল হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি মুক্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা ও ইতিবৃত্ত জানাইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে এক পত্র দিয়াছেন। কারাগারে থাকাকালে তিনি খুব সাধন-ভজন করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে লিখিলেন,—

"তুমি যে অবরুদ্ধ জীবনের সুদীর্ঘ সময়টা মঙ্গলময় নামের নিভৃত সেবায় কাটাইয়াছ, তাহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। প্রকৃত সাধক জীবনের প্রতিপাদক্ষেপে সাধনের সুযোগই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং একটী সুযোগকেও নীরবে চলিয়া যাইতে না দিয়া তার কাছ হইতে যতটুকু আদায় করিয়া লইবার, তাহা লয়।"

নির্ভর রাখ ভগবানে

অপরাহ্ণে উপদেশ-প্রার্থী ব্যক্তিরা সমাগত হইলেন।

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনো অবস্থাতেই মানুষের উপরে তোমার নির্ভর রেখ না। সমগ্র নির্ভর, সমগ্র বিশ্বাস সম্পূর্ণ-রূপে ন্যস্ত কর শ্রীভগবানে। মানুষ তোমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, উত্তম কথা। মনে রেখো, তাঁর ভিতর দিয়ে এ কণ্ঠ-বাণী শ্রীভগবানের। মানুষ তোমাকে ভরসা দিতে পারেন, কিন্তু সেই অনুযায়ী চল্‌বার শক্তি তার নিজের নেই, সব শক্তি ভগবানের। জগতের যত জীব যত ভাবে তোমার সংস্পর্শে আসুক, তাদের প্রত্যেকটী আচরণের ভিতর দিয়ে তুমি তোমার প্রতি ভগবানের দেওয়া ইঙ্গিতগুলিকেই অনুসরণ কর। যিনি উপকার কচ্ছেন, তিনি ভগবদাদিষ্ট হ'য়েই কচ্ছেন। প্রকৃত দাতা ভগবান, অপর সকলে তাঁর কর্ম্মচারী বা যন্ত্র। উপলক্ষ্যের ভিতর দিয়ে সেই পরমদয়াল তোমাকে দান, দয়া, দাক্ষিণ্য বিতরণ কচ্ছেন। তাঁর কর্ম্মচারী সবাই হ'তে পারে না, সকলেই কিছু তাঁর হাতের যন্ত্র হ'তে সমর্থ নয়, সুতরাং তিনি যার মুখ দিয়ে শত শত দুর্ব্বল হৃদয়ের বল-বিধায়ক সান্ত্বনা-ভাষণ, আশ্বাস-বাণী, ভরসার কথা উচ্চারণ করাচ্ছেন, সেই মহাজন নিশ্চয়ই ধন্য, নিশ্চয়ই ভক্তির পাত্র, কিন্তু তোমার অন্তরের সকল কৃতজ্ঞতা অবিরাম উচ্ছ্বসিত হোক সেই পরম দয়ালের শ্রীচরণ স্মরণ ক'রে, যাঁর কৃপা-কণার স্পর্শ পেয়ে ভয়দাতাও অভয় দাতায় পরিণত হ'তে পারে, আত্মসুখী মহাকৃপণও সর্ব্বস্ব-দাতায় রূপান্তরিত হ'তে পারে। ভগবান্ যাঁকে মহৎ করেছেন, পরমেশ্বের মহিমার কথা ভেবে তাঁকে দেখে চমৎকৃত হও। কত তিনি মহান্, যিনি এমন প্রেমিক, এমন পরদুঃখকাতর, এমন সর্ব্বজীব সুখকামী মহাপুরুষদের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

কীটাধম একদা পুরুষোত্তম হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য এখনই একটা তর্ক উঠ্‌বে যে, বহুজনের ভিতরে মহত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন ব'লেই যদি ভগবান্ মহিমাময়, তাহ'লে শত শত ব্যক্তির ভিতর দিয়ে নীচতার, হীনতার, ঘৃণ্যতার, জঘন্যতার বিকাশ

ঘটিয়েছেন ব'লে কি তাঁকে বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন ব'লে মনে কত্তে হবে না? যুক্তির হিসাবে কথাটা অকাট্য। কিন্তু আস্বাদনের দিক্ দিয়ে কথাটা তাই নয়। চিনিকে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তার ভিতরে রং মিশিয়ে জমাট্ বাঁধিয়ে তাই দিয়ে মিঠাইওয়ালা লঙ্কা তৈরী করে। দেখতে ঠিক্ ক্ষেতের লঙ্কার মত, মনে হবে যেন জিভে দিলেই দারুণ ঝাল লাগবে, হয়ত জ্বালার চোটে জিভই খ'সে পড়বে। কিন্তু সাহস ক'রে এনে মুখে পুর্লেই আস্বাদনের মুখে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে এটা ঝাল ত' নয়ই, বরং অতীব সুমিষ্ট। ঐ যে যত নীচ, ঘৃণ্য, জঘন্য জীব আত্ম-সুখে মত্ত হ'য়ে অবিরাম পরানিষ্ট সাধন কচ্ছে, তাদের বাহ্য আবরণের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিকে পরিচালনা কর, তাদের রক্ত ও মাংস, দেহ ও মন, আসক্তি ও সংস্কার প্রভৃতি সব-কিছুর পিছনে রক্তাতীত, মাংসাতীত, দেহাতীত, মানসাতীত, আসক্তির অনবগম্য ও সংস্কারের অনবগাহ্য চিরস্থির চিরস্থায়ী পরমসত্তার প্রতি তাকিয়ে দেখ। স্পষ্ট অনুভব করবে, এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবন ন্যক্কারজনক কলুষ-পল্বলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, এ হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে নিম্নতম সুখানুভূতির নিকৃষ্টতম স্তর থেকে উচ্চতম পরিতৃপ্তির উৎকৃষ্টতম স্তরে প্রবল বেগে অগ্রসর হবার পথে অবশ্যম্ভাবী আবর্ত্ত মাত্র। এ আবর্ত্ত ক্ষণস্থায়ী। নীচ একদা উন্নত হবে, ঘৃণ্য একদা দেবপূজ্য হবে, অধম একদা পুরুষোত্তম হবে। তাঁর মঙ্গলময় পরমবিধানের এইটীই এক অখণ্ডনীয় বৈশিষ্ট্য যে, ছোট বড় হবে, অবজ্ঞেয় সর্ব্ব-জীব-শিরোমণি হবে, কীটাধম মহামানব হবে।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

সাধন-জীবনে নিষ্ঠার স্থান

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত অজয়গড় প্রবাসী জনৈক ভক্তকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"বহু গ্রন্থ অধ্যয়নে এবং নানা মতবাদের আলোচনায় চিত্ত চঞ্চল ও নিষ্ঠা টলটলায়মান হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে জোর করিয়া ঐ সব বন্ধ করিয়া দিয়া

নিতান্ত গোঁড়ার মত নিজের নির্দ্দিষ্ট পন্থাটুকু আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হয়। ইহাই সাধন-জীবনে সাফল্য-লাভের গূঢ়তম কৌশল।

"এক পথে তুই থাকিস্ রে ভাই
দশ দিকে মন দিস্ না রে,
এক সুধাতেই হয় রে তৃপ্ত
দশ জনমের তৃষ্ণা রে।

"এক তপনের কিরণ লেগে
বিশ্ব-ভুবন উঠ্‌বে জেগে,
লক্ষ তারার পানে চেয়ে
সুযোগ নাশ করিস্ নারে।

"এপথ ও পথ সে পথ ঘু'রে
সংশয়ে তুই মরলি পু'ড়ে,
একের মাঝেই সকল আছে
এই কথা ভুলিস্ নারে।

"জগতে গোঁড়ামির খুব নিন্দা আছে কিন্তু মানব-জীবনকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার কার্য্যে গোঁড়ামির নিজস্ব অধিকারও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতা যে কিছুতেই রাবণকে ভজনা করিলেন না, অর্জ্জুন যে কোনও যুক্তিতেই উর্ব্বশীর প্রার্থনানুগামী হইলেন না, বর্ত্তমান তথা-কথিত সভ্যতালোকিত অনেক চিত্তেই ইহা একটা গোঁড়ামি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এই গোড়ামিই সীতাকে পূজনীয়া ও অর্জ্জুনকে বন্দনীয় করিয়াছে।

"সকল দিকের সকল কৌতূহল দমন করিয়া মনকে একটী স্থানেই ডুবাইয়া দিতে হইবে।

"একজনারে জান্‌লে আপন
বিশ্বভুবন আপন তোর;
এক জনাতে যুক্ত হ'লে
সকল ভাঙ্গায় বাঁধে জোড়।

একজনারে হৃদয় দিলে
বিশ্বজনার হৃদয় মিলে,
একের তরে ঝরলে আঁখি
সবার চোখে বইবে লোর।

"একের স্নেহের পরশ-মাঝে
সবার স্নেহের পরশ আছে,
একের কোলে ঠাঁই হ'লে তুই
পাবি রে সকলের ক্রোড়।

"দশজনারে যাও ভুলে যাও,
একজনাতে সব সঁপে দাও,
তাঁরি তরে হও রে পাগল
যে জন তোমার চিত্ত-চোর।

"একটী তত্ত্বে নিঃশেষে অবস্থান করিবার নামই নিষ্ঠা। অন্য কোথাও মনকে নিমেষের তরেও স্থিতিশীল না করিয়া সমস্ত স্থিতি একটী ভাবনায় একটী মন্ত্রে অর্পণ করিতে হইবে। সন্দেহ, সংশয় ও বিতর্ক পদতলে চাপিয়া রাখিয়া এক মনে এক প্রাণে একটীমাত্র পথের অনুসরণ করিবার নামই নিষ্ঠা। নদী পার হইতে হইলে একটী নৌকারই আরোহী হইতে হয়, শত শত মাঝির ডাকাডাকি তুচ্ছ করিয়া 'যত্রাভিরমতে মনঃ' এমন নৌকায় চাপিয়া বসিতে হয়। মাঝ-দরিয়ায় যদি ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রবল বিক্রমে তরণী মজ্জনোন্মুখিনী হয়, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজির অবাধ্য আক্রোশে বিষম বিপদেরও সম্ভাবনা ঘটে, তবু এই নৌকা ছাড়িব না, এই জিদ্. এই দৃঢ়তা, এই অসমসাহসিকতার নাম নিষ্ঠা।

"নিষ্ঠাই জয়েচ্ছুর বিজয়-লক্ষ্মী-প্রদাত্রী, সৈন্য-সংখ্যা নহে।

"শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে নামের কৃপা-গুণে,
ওরে তুই ভয়-ভাবনায় হস্‌নে অধীর
অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব শুনে।

"যত সব ঝরা-পাতা
চ'খের জলে ভিজে দেবে
মাটির উর্ব্বরতা,
উঠ্‌বে বেঁচে মরা শিকড়
রসের আস্বাদনে।

"বৃক্ষমূলে রসের যদি
হয় রে পরশন,
তরু কি আর নীরস থাকে ?
পত্র পুষ্প লাখে লাখে
চতুর্দ্দিকে মোহন-শোভা
করবে বিকীরণ।
নামেই আজি কর্ ভরসা
বন্ধু কে আর তিন ভুবনে ?

"প্রথম সময়ে যত তিক্ত, যত কটু, যত কষায়ই লাগুক্, পরিণামে নাম হইতেই অফুরন্ত মধুর অমৃতময়ী ধারা বহিবে।

ভক্ত ও অভক্ত

মণিপুর-ইম্ফল নিবাসী জনৈক বঙ্গ-ভাষাভিজ্ঞ মণিপুরী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মণিপুরী, কাছাড়ী, বাঙ্গালী বা গুজরাটী বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ জাতি নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কুলীন, অন্ত্যজ প্রভৃতিরও পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। তাঁহার বিচারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র দুইটী জাতি বিদ্যমান, একটী ভক্ত, অপরটী অভক্ত। যাঁহারা ঈশ্বর-পরায়ণ, প্রেমনিষ্ঠ, নিত্যানিত্য-বিবেকবান, ভগবৎ-সৃষ্ট জীবমাত্রেরই প্রতি সমানুভূতিসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল, যাঁহারা জীবনের প্রতিকর্ম্মে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ অনুভব করিয়া প্রতিটী হস্ত-পদ-সঞ্চালনকে পরিচালিত করেন, জীবনের প্রত্যেকটী উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া যাঁহারা ভগবৎ-করুণার প্রত্যক্ষ

আস্বাদন লাভে প্রযত্নপর, জন্ম এবং মরণ, স্বপ্ন এবং জাগরণ প্রভৃতি কোনও কিছুকেই যাঁহারা ভগবানের মঙ্গলোদ্দেশ্য-বর্জ্জিত বলিয়া জ্ঞান করেন না এবং ভগবদ্দত্ত সবটুকু সসীম শক্তি, বুদ্ধি, প্রতিভা, তাঁহারই অসীম শক্তিতে, অপার বুদ্ধিতে, অপরিমেয় প্রতিভাতে সর্ব্বতোভাবে লীন করিয়া দিতে চেষ্টারত,—তাঁহারাই ভক্ত। আর যাঁহারা ইহার বিপরীত, তাঁহারা অভক্ত। জগতে সর্ব্বজীবের মধ্যে ভক্ত আর অভক্তের এই একটীমাত্র জাতিভেদ রহিয়াছে, এই একটিমাত্র বর্ণভেদ রহিয়াছে। তবে এই জাতিভেদ কোনও চিরস্থায়ী প্রাচীর নহে যে, কোনও দিনই লোপ পাইবে না। যিনি আজ অভক্ত আছেন, কাল তিনি নিশ্চিতই ভক্ত হইবেন, কারণ ঈশ্বরকে ভজনা করার বৃত্তি জীব মাত্রেরই জন্ম-সংস্কার। তাঁহাকে ভজিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহার মধুমাখা নামে মজিয়া, তাঁহার মহিমা-চিন্তন ও গুণানুবাদ করিয়া, তাঁহার প্রেমময়ী কথা শুনিয়া ও শুনাইয়া নিত্যকাল জীব পরমা শান্তির আস্বাদন করিয়াছে, অমৃতের স্বাদ পাইয়াছে। আজ যাঁহারা অভক্তি-চর্চ্চার চূড়ান্ত শিখরে স্পর্দ্ধার সিংহাসন রচনা করিয়া ধরাকে জ্ঞান করিতেছেন সরা আর ব্রহ্মাণ্ড-পতিকে জ্ঞান করিতেছেন নব্য-বিজ্ঞানের দাসানুদাস, কাল তাঁহারাই অবনত মস্তকে বিনীত কন্ধরে আসিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে নিজেদের প্রেম-ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিবেন। অভক্ত নাম ধরিয়া যাঁহারা এখন ভক্ত-বিদ্বেষ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি তোমাদের পুনরায় বিদ্বেষ পোষণের প্রয়োজন নাই। জানিও, শুধু কাল-প্রতীক্ষাই মাত্র আবশ্যক। একদা ইহারাই প্রত্যেকে ভক্তরাজ পদবীর যোগ্য হইতে বাধ্য হইবেন। জীবের অভক্ত থাকিয়া মরিবার উপায় নাই। সকলেরই শির অন্তিমে সেই পরমবৎসল শ্রীহরির ক্রোড়ে সঁপিতে হইবে। সম্যক্ আত্মসমর্পণ করিয়া যে জীব মরিতে পারে না, শুধু আত্ম-সমর্পণ শিখিবারই জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নবতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া নবতর দেহে আবির্ভূত হইতে হয়। একদা জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীকে ভক্ত হইতেই হইবে,—তাহা যুগপৎ না ঘটিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক জীবেরই চরম পরিণতি ইহা, পরম প্রাপ্তি ইহা, অখণ্ডনীয়

বিধি-লিপি ইহা,—ইচ্ছা করিলেই কেহ অনন্তকাল অভক্ত থাকিতে পারিবেন না।"

প্রেম ও বিনিময়

ত্রিপুরান্তর্গত ভা ণী-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"প্রেমিক প্রেম দিয়াই কৃতার্থ, প্রেমের প্রতিদানে কি সে পাইল, তাহার বিচারে তার না আছে রুচি, না আছে অবসর। যখনই দেখিবে যে তুমি ভালবাসা দিয়াছ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ে ভালবাসা বা সদ্ব্যবহার বা অন্ততঃ মৌখিক সুজনতার প্রত্যাশা করিতেছ, তখনই জানিবে যে, এ ভালবাসা নিতান্ত খেলো জিনিষ, মেকী মাল,—খাঁটি, অকৃত্রিম, ভেজাল-বর্জ্জিত জিনিষ ইহা নহে। এই জাতীয় ভালবাসা কাহাকেও দিও না, কাহারও কাছ হইতে পাইতেও প্রয়াসী হইও না।"

পণ্ডিত ও ভক্ত

বীরভূম-বাজিতপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পণ্ডিত হওয়া এবং ভগবদ্‌ভক্ত হওয়া দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামপ্রসাদ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না, কিন্তু ছিলেন ভক্তশিরোমণি। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি ভক্তও ছিলেন, পণ্ডিতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অপণ্ডিতও থাকিতেন, তথাপি ভক্তরূপে সর্ব্বজনের পূজা পাইতেন। পণ্ডিতগণ মান্য, কিন্তু ভক্তগণ পূজ্য। সম্মানে আর পূজায় নিশ্চয়ই বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে। মান-সম্মান বাহিরে প্রদর্শনের জিনিষ, পূজা অন্তরের অর্ঘ্য। পণ্ডিতেরা এই জন্যই সমাজের শাসক, কিন্তু ভক্তেরা সমাজের সর্ব্বস্তরের সর্ব্বজনের প্রাণারাধ্য বস্তু। পণ্ডিতগণ দোষ-গুণের বিচারক হইতে পারেন, কৃত-কর্ম্মের শাস্তি বা পুরস্কারের নিরূপক হইতে পারেন, কিন্তু ভক্তেরা দোষ-গুণ-নিরপেক্ষ হইয়া দণ্ড ও পুরস্কারের অতীতে থাকিয়া প্রেমবলে হৃদয় জয় করিয়া থাকেন। সুতরাং হইতে যদি পার, ভক্তই হও।"

কৌলীন্য,—বংশগত ও ব্যক্তিগত

হুগলী-জনাই নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হইলেও এমন এক ব্যক্তির পুত্র, যাঁহার নাম মহাত্মাজীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আমরা কেহই কখনও শ্রবণ করি নাই। এখনই শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু কয়জনে এই ত্রিলোকবরেণ্য মহাপুরুষের পিতার নামটী মনে রাখিতে পারিতেছি? আবার মহাত্মাজীর পুত্রগণ-মধ্যে কেহই হয়ত এইরূপ বিপুল মহত্ত্বের মর্য্যাদার বা মহিমার অধিকারী নাও হইতে পারেন।—অর্থাৎ মানবের কৌলীন্য বংশগত নহে, কঠোর ভাবেই ব্যক্তিগত। শ্রীকৃষ্ণ যদি জগতে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে কংস-কারাগারে রাজবন্দী হতভাগ্য বসুদেবের কথা হয়ত এই জগৎ জানিতেও পারিত না, রাজরোষে পতিত শত সহস্র দুর্ভাগ্য বন্দীর মত ইনিও হয়ত নাম-গোত্র-পরিচয়-হীন ভাবেই চিরকাল লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া যাইতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশে নিখিল ভুবন চমকিত হইল, বিস্ময়ে অবাক্ হইল এবং নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অবনতমস্তক হইয়া তাঁর তিরোধানের পরে গাথায় গাথায় স্তুতি-বন্দনা রচনা করিল। এমন সুদুর্লভ পুত্রের পিতা হইয়া দুর্ভাগ্য-দহন-ক্লিষ্ট দম্পতী দেবকী-বসুদেব মানব-মানসে অমর হইয়া রহিলেন। অথচ যোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ, ভারত-যুদ্ধের রাষ্ট্রধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতবীর্য্য, কৃতকর্ম্মা, সর্ব্ববেদবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ নিজের পবিত্র ঔরসে যে সন্তানের জন্মদান করিলেন, সেই প্রদ্যুম্ন কি জগতে শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা পাইয়াছেন?—অর্থাৎ মানবের কৌলীন্য প্রকৃত প্রস্তাবে বংশগত নহে, কঠোরভাবেই ব্যক্তিগত। রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে পুত্ররূপে শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। মৈত্রীর মধুময়ী বাণীতে তিনি জগজ্জয় করিলেন। অচেনা অজানা এক পার্ব্বত্য-দেশের অপরিচিত নরপতি শুদ্ধোদনকে তখন লোকে চিনিল। কিন্তু শ্রীবুদ্ধের পবিত্র ঔরসে যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই রাহুল সর্ব্বত্যাগ-ব্রত হইয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেও

ত্রিলোক-বিস্ময়কর কোনও বিশেষ প্রতিভার কি পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেন, না, পিতার ন্যায় ত্রিভুবন-পূজিত হইলেন? অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কৌলীন্য কঠোরভাবেই ব্যক্তিগত, বংশগত নহে। অবশ্য, একথা নিশ্চিতই স্বীকার্য্য যে গান্ধী, বুদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অলোকসামান্য মহাপুরুষের ঔরসের মধ্যে উন্নতি-সম্ভাবনার বীজ সুপ্রচুর রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই বীজকে অঙ্কুরিত, শাখান্বিত, পল্লবিত, এবং ফলফুলমণ্ডিত করিয়া মহামহীরুহে পরিণত করিতে বিপুল সাধনার প্রয়োজন গান্ধীতনয়েরও আবশ্যক হইবে, বুদ্ধ-তনয়েরও আবশ্যক হইবে, কৃষ্ণ-তনয়েরও আবশ্যক হইবে। পিতার তুল্যকক্ষ সাধনা থাকিলে ইহারা জগতে পিতার সমানই কৌলীন্যের অধিকারী হইবেন। ঔরসের সহিত পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের অনুকূল শক্তি ইহারা নিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সাধনার দ্বারা সেই অনুকূল শক্তিকে কাজে আনিতে হইবে। ঔরস বংশ হইতে আইসে, কিন্তু সাধনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়।”

অন্ন-সমস্যা ও ফলোদ্যান

অদ্য কলিকাতার কোনও নার্শারীতে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্র দিয়াছেন যে, পেয়ারার কলম প্রেরণের জন্য যে টাকা বহু পূর্ব্বে প্রেরণ করা হইয়াছে, তন্মূল্যের কলম যেন চট্টগ্রাম পাথর-ঘাটা আশ্রমে প্রেরণ করা হয়।

রহিমপুর আশ্রমে না পাঠাইয়া পাথরঘাটা আশ্রমে প্রেরণের আদেশের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জানিস ত' রহিমপুর আশ্রমের অবস্থা। সন্ধ্যার সময়ে গাছ পুঁতে আস্‌বি, পরদিন সকালে গিয়েই দেখ্‌বি, কেউ হয়ত সমূলে উপ্‌ড়ে রেখেছে, নতুবা ডাল ভেঙ্গে দিয়েছে। এ অবস্থা অহরহ হচ্ছে। এজন্য চাটগাঁয়ে প্রথম আড্ডা গড়্‌ব, ভাব্‌ছি। এখান থেকে কলম তৈরী ক'রে ক'রে নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জেলার প্রয়োজন-স্থলে কলম সরবরাহ করা যাবে।* চিরদিনই রহিমপুরে সাম্প্রদায়িক উৎপাত থাকবে না, আর চিরদিনই ফলোৎপাদনে লোকের ঔদাস্য থাকবে

* পরবর্ত্তী সময়ে এখানে বাগান হইবার পরে এখান হইতে কয়েকস্থানে বিনামূল্যে কলম সরবরাহ করা হইয়াছিল।

না। এমন একটা দিন আস্‌বে যখন দেশের প্রত্যেকটী লোক উপায় উদ্ভাবন কত্তে বাধ্য হবে যে কি করলে প্রতি আঙ্গুল জমি কিছু না কিছু শস্য, কোনো না কোনো ফল ভগবানের জীবকে প্রাণধারণের জন্য প্রদান করে। তোমরা দূরদৃষ্টিহীন, তাই মনে কচ্ছ যে, চিরকাল বাংলা দেশ শস্য-শ্যামলা মলয়জশীতলা থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার কত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে, কতবার জনাকীর্ণ জনপদ মহামারীতে শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে, কতবার কত গহনারণ্য রাজধানীতে পরিণত হ'য়েছে, কতবার কত পর্ব্বতশৃঙ্গ ভূমধ্যে প্রোথিত হ'য়ে সরোবরের সৃষ্টি করেছে, আবার কত মহাসমুদ্র ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে দুর্গম পর্ব্বতে পরিণত হ'য়েছে। শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি একদা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার তাড়নে চক্ষের পলকে মন্বন্তরের বিভীষিকায় পূর্ণ হ'তে পারে, অন্নপূর্ণা মায়ের সন্তানেরা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট ক'রে রাস্তার পাশে ম'রে থাকতে পারে, দলে দলে দুগ্ধবঞ্চিত শিশু, বস্ত্রহীনা নারী, অন্নহীন পুরুষ পালে পালে শৃগাল-শকুনি-কুক্কুরের আহারীয় হ'তে পারে। সেই দুর্দ্দিনে একটী ক্ষুদ্র ফল-গাছের কুঁড়িটীও লক্ষ মুদ্রা মূল্যের এক একটী প্রাণরক্ষায় কাজে আসতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—অবশ্য এখানেও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কলম-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সম্ভব নয়। এখানে কাজটা প্রথম ধরা হচ্ছে, এই মাত্রই চাটগাঁয়ের গৌরব। কিন্তু হয়ত ভিন্নতর স্থানে ভিন্নতর পন্থায় ভিন্নতর সময়ে এমন এক প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হবে, যা, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ডিব্রুগড়-সদিয়া থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেকটী বর্গহাত ভূমিকে শ্যামল শস্যে কোমল ফলে সুরভি ফুলে পূর্ণ করার মহাযজ্ঞের এক প্রধান হোতা হবে। ভাব যেখানে সত্য, সেখানে অতি ক্ষুদ্র প্রারম্ভও একদা নিশ্চিত বিশাল ব্যাপকতা এবং সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর্ব্বে। ফলমূল খেয়েই ত' ঋষিরা তপস্যা কত্তেন। আজ ফলও নেই, মূলও নেই, ঋষিও নেই। ঋষিরা সব হ্যাট আর প্যাণ্টে বিশোভিত হ'য়ে মার্চ্চেন্ট-অফিসে কলম পিশ্‌ছেন, আর

অ-ঋষির বংশধরেরা গ্লাসে গ্লাসে বেদানার রস, আঙ্গুরের রস প্রেমভরে সেবা কচ্ছেন। এই দুর্দ্দশা ঘুচাবার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের।

একটা মূর্ত্তিতেই মন বসে না কেন?

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা জনৈক ভক্তসহ "দেশবন্ধু অনাথ-আশ্রম" নামক একটী প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য সহরের উপকণ্ঠে চন্দনপুরা নামক স্থানে যাইতেছেন। ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—একটী মূর্ত্তিতে মন বেশীদিন ব'সে থাকে না কেন? মন স্থির করার উদ্দেশ্যে একটা মূর্ত্তিকে হয়ত অবলম্বন ক'রে সাধন সুরু করি, দুদিন যেতে না যেতেই অন্য আর একটী মূর্ত্তির প্রতি মনের আকর্ষণ এসে পড়ে। সে আকর্ষণ এত প্রবল যে জোর ক'রেও পূর্ব্বগৃহীত মূর্ত্তিতে মনকে ধরে রাখতে পারি না। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর কারণ এই যে, যে মূর্ত্তিটীকে নিয়ে তুমি কাজ সুরু ক'রেছ, সেটী তোমারই নিজের সৃষ্টি, তোমারই মনের কল্পিত। মনে কর, তোমাকে কেউ একটী বিষয় নিয়ে একটী প্রবন্ধ লিখ্‌তে বলেছেন। প্রবন্ধ একটী লিখ্‌লেও। প্রথম প্রথম সে প্রবন্ধটী তোমার কাছে যে কত উপাদেয় বোধ হবে, তার তুলনা নেই। কিন্তু কিছুদিন যাবার পরে তুমি লক্ষ্য করবে যে, তোমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে যা প্রসূত হয়েছে, তার উপাদেয়ত্বও সীমাবদ্ধ। ফলে এই আশ্চর্য্য প্রবন্ধটীও আর তোমার কাছে আশ্চর্য্য ব'লে মনে হবে না, এমন কি ভালও লাগবে না। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে মন স্থির কত্তে যাওয়াও কতকটা সেই রকম ব্যাপার। তোমার কৃষ্ণ, তোমার বিষ্ণু, তোমার কালী, তোমার শিব সবই তোমার কল্পনার গড়া। তোমার কল্পনাশক্তি সসীম, তাই এই শক্তির সাহায্যে যে মূর্ত্তিকে গড়েছ, তাও সসীম-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। ফলে দুদিন পরে এ মূর্ত্তি আর ভাল লাগে না। সসীম একটা সৌন্দর্য্যের মাঝখানে তোমার অনন্ত-রস-পিপাসার পরিতৃপ্তি হয় না, রোজই তার ভিতরে নূতন এক একটা ক'রে রূপ-বিবর্ত্ত তুমি লক্ষ্য কত্তে পার না। তারই জন্য মনলেগে থাকে না, ছুটে আবার অন্য মূর্ত্তির পানে যেতে যায়।

নিষ্ঠার মহিমা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন কিন্তু নিষ্ঠার একটী মহিমা আছে। যে রূপটী তোমার

কল্পনার সৃষ্টি, সেই রূপটীও অসীম অনন্ত অপরূপেরই অংশ। অংশ কখনো পূর্ণের তুল্য নয়, কিন্তু পূর্ণের গুণাবলি অংশেও থাকে। এক গণ্ডূষ সমুদ্র-বারি কখনো সমুদ্র নয়, কিন্তু সমুদ্রের যা আস্বাদ, ঐ গণ্ডূষ-জলেরও তাই আস্বাদ। সমুদ্রে বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গ আছে, গণ্ডূষ-পরিমিত করধৃত স্বল্প সমুদ্র-জলে তুমি সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখ্‌তে পাও না সত্য, কিন্তু এই এক গণ্ডূষ জলের ভিতরেই নিখিল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভ, নিখিল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল অতি সূক্ষ্ম ও সহানুভূতি-চঞ্চল super-sensitive যন্ত্রে ধরা পড়ে। তোমার অগঠিত স্থূল মন যে রূপটাকে নিতান্ত সসীম, জড় বা বাজে জ্ঞান কত্তে বাধ্য হ'য়ে বারংবার অন্য দিকে রূপ-পিপাসা-পরিতৃপ্তির জন্য ঘুরে বেড়াতে চাচ্ছে, জোর ক'রে মনকে একটী জায়গায় বসিয়ে রাখ্‌বার আপ্রাণ অনুশীলনের ফলে এমন সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা মনটীর এসে যাবে যে, একই মূর্ত্তির ভিতরে নিত্য নিত্য নূতন নূতন রূপ-বিভাতি দেখ্‌তে পেয়ে বিস্ময়ে অবাক্ ও পুলকে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। এই খানেই নিষ্ঠার মহিমা। এই জন্যই যাঁরা রূপপন্থী তাঁদের পক্ষে নিত্য নূতন প্রতীকের চিন্তা কত্তে গিয়ে মনকে বৃথা নানা পথে প্রধাবিত না ক'রে,—"যাকে ধরেছি, তাকে নিয়েই ভাসি ত' ভাসব, ডুবি ত' ডুব্‌ব",—এইরূপ মনোভাব নিয়ে আমৃত্যু নিষ্ঠায় কাজ ক'রে যাওয়া উচিত। একজন লোক সঙ্গীত শিখ্‌তে চান। আমি বল্লুম,—"সারে গামা সাধো"। দুদিন সারে গামা ক'রেই সে এসে বল্ল,—"কৈ মশায়, একটী রাগিণী শেখান, একটী গান দিন।" দেখলুম, লোকটার ধৈর্য্য নেই, লেগে থাক্‌বার শক্তি নেই, নিষ্ঠার বল নেই, এক সারেগামা-র ভিতরেই অনন্ত কোটী গন্ধর্ব্বেরও সাধনার ধন যে শ্রুতি-বিভূতি রয়ে গিয়েছে, সে তার জন্য ব্যগ্র নয়। তখন তাকে একটী রাগিণী দেখিয়ে দিলুম, একটী গৎ শিখিয়ে দিলুম, একটী গানের training দিলুম। সে বেশ ওস্তাদ হ'য়ে আসরে আসরে গান গাইতে লাগ্‌ল, তামসিক সঙ্গীত-প্রিয়েরা বাহাবা দিল, ব্যস্ এই পর্য্যন্তই খতম। কিন্তু আর একজন এল গান শিখ্‌তে, তাকেও দিলাম সারেগামা সাধতে। সে সাধ্‌তে লাগ্‌ল। রাগিণী শেখাবার জন্য, গান পাওয়ার জন্য বা গৎ আয়ত্ত করার জন্য কোনো

আবার, অতি সোজা না হোক- অন্ততঃ চেষ্টার সাধ্য ব'লে প্রমাণিত হয়। যাঁরা বলেন,—"রূপাভিনিবেশহীন ঈশ্বর-চিন্তন কঠিন, তাই রূপধ্যানের পন্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে"--তাঁরাই আবার একটা নির্দ্দিষ্টরূপে মনকে বসাতে গিয়ে দেখেন যে, রূপের ভিতরে মনকে বসানও বড়ই কঠিন কাজ। যাঁরা বলেন,—"চরণ থেকে সুরু ক'রে ধ্যান আরম্ভ কর্লে কটিতটে পৌঁছুতে না পৌছুতেই চরণ দু'খানি ভুলে যাই, আবার শ্রীমুখ-চিন্তন সুরু কর্‌লে চরণ থেকে বক্ষ পর্য্যন্ত কিছুই মনে থাকে না, সুতরাং নিরাকার চিন্তনই সহজ পথ"—তারাই আবার নিরাকার চিন্তনে ব'সে দেখ্‌তে পান যে, মন অবিরাম রূপের পর রূপে বিলসিত হচ্ছে, নিমেষের তরেও রূপাতীত পরমতত্ত্বে লগ্ন হচ্ছে না, সেই তত্ত্বের স্বাদলাভ করা ত' দূরে থাকুক।

অখণ্ডের নাম-পন্থা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং এই সব পঞ্চাশ-ঝঞ্চাটে না গিয়ে তোমাদের কর্ত্তব্য নির্ঝঞ্চাট পথ খুঁজে নেওয়া। রূপ-ধ্যান কর্ব্বারও দরকার নেই, অরূপ-ধ্যান কর্ব্বারও দরকার নেই। তোমাদের কাছে রূপ-ধ্যানেরও সমাদর নেই, রূপ-বর্জ্জনেরও অনাদর নেই। অবিরাম নাম ক'রে যাও। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের কাণ খোলা রেখে অনুক্ষণ লক্ষ্য কর যে, তুমি যখন নাম কচ্ছ, তখন আর কিছু আপনা-আপনি প্রধ্বনিত হচ্ছে কি না,—ব্যস্, তোমার কর্ত্তব্য অতটুকুই। তারপরে নামের সঙ্গে সঙ্গে তোমার চ'খের সাম্‌নে কৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন, না বিষ্ণু এসে দাঁড়ালেন, না গণপতি এসে উপস্থিত হ'লেন, কিম্বা ভাস্বর-বপু্ সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ কর্লেন, অথবা অনির্ব্বচনীয় অব্যাখ্যান কোনও আশ্চর্য্য দীপ্তি ফুটে উঠ্‌লেন, এসব তেমোর ভাব্‌বার প্রয়োজন নেই। নাম ক'রে যাও, আর নামের ভিতর থেকে কর্ণরসায়ন কোনও মধুস্বর উৎসারিত হচ্ছে কিনা, কেবল তারই প্রতীক্ষায় থাক। শবরী জান্‌তেন না যে শ্রীরাম কেমন, তবু তাঁরই প্রতীক্ষায় যেমন ক'রে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন অনুক্ষণ "রাম" "রাম" জপ কত্তে কত্তে, ঠিক তেমনি অবিরাম অনুক্ষণ শুধু অমৃতময় নাম জ'পে যাও আর কাণ পেতে

প্রতীক্ষা কর, কোন্ ধ্বনি আসে, চোখ পেতে প্রতীক্ষা কর; কোন্ রূপ আসে। ধ্বনির লহরী ছুটবে, চঞ্চল হ'য়ো না। রূপের আলেয়া চল্‌বে, বিহ্বল হ'য়ো না। যে এসেছে, সে যাবে, যে আসেনি, সে আস্‌বে,—এভাবে রূপের লীলা সুরের লীলা কত বৈচিত্র্যে কত অত্যদ্ভুত মাধুর্য্যে কেবলি নিজেকে প্রসারিত কর্ব্বে। উৎফুল্লও হ'য়ো না, বিরক্তও হ'য়ো না,—অবিরাম নাম ক'রে যাও, অবিচ্ছেদ নাম জ'পে যাও, এই তোমার পথ,—ইহকালেরও পথ, পরকালেরও পথ। দর্শনশাস্ত্র নয়,—নামই তোমার উপজীব্য। রসশাস্ত্র নয়,—নামই তোমার উপজীব্য। সুরশিল্পও নয়,—নামই তোমার উপজীব্য। চিত্রবিদ্যাও নয়,—নামই তোমার উপজীব্য। অবিরাম নাম জপো, আর লক্ষ্য কর তার অনুভূতিকে, তারই ফলে আপনা আপনি সকল দর্শন, সকল রস, সকল সুর ও সকল রূপ তোমার চোখের কাছে, মুখের কাছে, কাণের কাছে, প্রাণের কাছে, সমগ্র অন্তরেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেবে।

নামব্রহ্মের ধ্যান

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ, নামে যদি মন বস্‌তে না চায়, তাহ'লে মনকে নামে বসাবার জন্য নামব্রহ্মকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ কর্ব্বে এবং প্রতিক্ষণে সেই প্রতীকেরই ধ্যান চালাবে। চ'খ বুজেও এই ধ্যান, চ'খ খু'লেও এই ধ্যান। সকল মূর্ত্তি ও সকল রূপকে বিস্মৃত হ'য়ে প্রত্যাহার-বলে নিমীলিত নয়নে শুধু এই একটী মাত্র মূর্ত্তিই চিন্তা কর্‌বে,—জপ করবে গভীর হুঙ্কারে অন্তরকে জাগরিত ক'রে, আর জপনীয় নামেরই শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্বে অন্তর-প্রদেশকে কল্পনার প্রভাবে আলোকিত ক'রে। উন্মীলিত নয়নে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একমাত্র নামকেই দর্শন কর। যাই দেখ, ধ্যানের বলে তারই মধ্যে জ্বলদোজ্জ্বল দিব্যসুন্দর ওঙ্কার-বিগ্রহ অঙ্কিত দেখ্‌তে প্রয়াসী হও। মানুষ, গরু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যাই দেখ, তাতেই দর্শন কর পবিত্র ওঙ্কার; দর্শন কর, আর সঙ্গে সঙ্গে নামের sound feeling-(ধ্বনিময় অনুভূতি)-টাও ভিতরে জাগাও। যখনি যা দেখ, তার মধ্যে নামকে কর প্রত্যক্ষ; যখনি নামকে দেখ, তারই সঙ্গে অখণ্ড নাদের ধ্বনিকে কল্পনার বলে অনুভবে

আন্‌বার চেষ্টা কর। এই প্রয়াসই তোমার জীবন-যজ্ঞ হোক্, এই যজ্ঞেরই তুমি পূর্ণাহুতি হও।

চট্টগ্রাম
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

পত্নীকে বন্ধু জ্ঞান কর

প্রাতে কধুরখিল-নিবাসী একটী দীক্ষার্থী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনের কতকগুলি সমস্যার বিষয় জানাইলে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন,— তোমার ধর্ম্মপত্নীকে তোমার শত্রু ব'লে জ্ঞান না ক'রে বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর। তার প্রতি প্রেম অর্পণ কর, কিন্তু সেই প্রেমকে ভগবানের মঙ্গলময় নামে আগে অভিসিঞ্চিত ক'রে নাও। ভালবাসা মাত্রেই পাপ নয়, ভগবন্নামের পবিত্র সান্নিধ্য হ'তে বঞ্চিত ভালবাসাই পাপ। ভগবানের নাম তোমার প্রাকৃত প্রেমকে অপ্রাকৃত প্রেমে রূপান্তরিত কর্ব্বে। সংসার ছেড়ে, স্ত্রী-ত্যাগ ক'রে হিমাচলের গহ্বরে গিয়ে তোমাকে জীবনের সাধনা উদ্‌যাপন কত্তে হবে না। গৃহই তোমার তপস্যার ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রে অবিরাম নামের হলকর্ষণে তোমার পত্নীকে তোমার অন্তরঙ্গ সহায়িকা ক'রে নাও। নামের হাল চালাও, নামের বীজ বোন, নামের ফসল তোল। যত ফসল উঠ্‌বে, চাষের জমি আরো তত বাড়াও, তত বেশী ক'রে বীজ বোন, তত বেশী ক'রে ফসল তোল।

নিত্য চাষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বাবা, ধানের ক্ষেতে, গমের ক্ষেতে, যবের ক্ষেতে, জনার ক্ষেতে যে অবিরাম গরীব চাষীদের চাষ কত্তে দেখ্‌ছ, তাদের দেখে এই শিক্ষা নাও যে,তোমাকেও চাষা হতে হবে। তবে এই অনিত্য ফসলের চাষ নিয়েই তুমি প্রমত্ত হয়ে থাক্‌তে পার না, তোমাকে নিত্য-ফসলের চাষ কত্তে হবে। নিত্য হালে, নিত্য বীজে তোমার চাষ। সেই নিত্য হাল হচ্ছে নামের স্মরণ, আর সেই নিত্য বীজ হচ্ছে নামের মনন। স্মরণে ফোটে রূপ, মননে ফোটে ধ্বনি। নামের রূপে আর নামের ধ্বনিতে হবে তোমার নিত্যকালের কৃষি-বিস্তার

অনুশীলন। এ অনুশীলনের আর শেষ নেই। অসিদ্ধ-এর অনুশীলন কর্ব্বে সিদ্ধ হবার জন্য, সিদ্ধও এর অনুশীলন কর্ব্বে তার সাধনময় সহজ স্বভাবের বশে। অসিদ্ধের সাধন সঙ্কল্প ক'রে, সিদ্ধের সাধন সঙ্কল্প-বিকল্পের অতীত, কিন্তু উভয়েই সাধন করে। দীক্ষাই যদি নিয়েছ বাপ্, নিত্য চাষে অভিনিবেশ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর।

ভয়কে জয়ের উপায়

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা কতকগুলি পত্র লিখিলেন।

একখানা পত্রে শ্রীশ্রীবাবা মালদহ-ইংলিশবাজার নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"ভয়কে জয় করিব বলিলেই ভয়কে জয় করা যায় না। তবে এইরূপ বলিতে বলিতে জয় করার সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে থাকে। এই জন্য ইহারও উপযোগিতা রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বভয় বিদূরণের প্রকৃষ্টতম এবং চূড়ান্ত সদুপায় হইতেছে, অভয়-স্বরূপের চরণাশ্রয় করা। সিংহ-ব্যাঘ্র-পরিবৃত ভীষণ বনানীতে ধ্রুব নির্ভীক রহিলেন কি করিয়া? হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত হইয়াও প্রহ্লাদ ভীত হইলেন না কিসের বলে? যদি ভয়কেই জয় করিতে হয়, এস আমরা সেই অভয় পরমপদের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

নামের নৌকায় আশ্রয় লও

হুগলী-বাবুগঞ্জ নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সকল মাঝির নৌকাই ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান্ মাঝির নৌকা কখনো ডোবে না। ঝড়-ঝঞ্ঝায় আকুল না হইয়া পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁর নামের তরী আশ্রয় কর। এ তরী ডুবিলেও ভাসিয়া উঠিতে পারে, ভাঙ্গিলেও অনায়াসে অকূলের কূলে পৌছাইয়া দিতে পারে। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত, তেমন নিশ্চিন্ত হইয়া নামের নৌকায় আশ্রয় লও। অনুকূল ও প্রতিকূল বাতাসে তিনি নিজের নৌকা নিজেই চালাইবেন, তুমি শুধু গলুই চাপিয়া দৃঢ় আসনে বসিয়া থাক।"

অতিভোজন, অল্পভোজন ও অপচয়

ময়মনসিংহ-ঘোষগাঁও নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"অতিভোজন ও অল্পভোজন উভয়ই ক্ষতিকর। অতিভোজনে আলস্য, তন্দ্রা ও তামসিকতা বর্দ্ধিত হয়। অত্যল্পভোজনে বায়ু, পিত্ত এবং রুক্ষতা প্রকোপিত হয়। অতিভোজনপ্রিয় ব্যক্তি ঘরে আগুন লাগিলেও এক বালতি জল আনিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণে রুচি অনুভব কদাচিৎ করিয়া থাকে। স্বল্পভোজন-কারী ব্যক্তি গুরুতর কাজের মুখে সহজেই মেজাজ খারাপ করে এবং প্রায় সর্ব্বদাই উষ্ণ অবস্থায় অবস্থান করে। এই কারণে মধ্যভোজী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ জানিও। ভোজনকে জীবনের প্রধান লক্ষ্যের অনুগত করিও, জীবনকে ভোজনের অনুগত করিও না। অধিকাংশ ভারতবাসী দুই বেলা আহার পায় না, এই কারণে এই দেশে অতিভোজনকে মহাপাতক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। আবার, সাধারণ ভারতবাসী যাহা খায়, তাহা খাইয়া বল-দুর্দ্ধর্ষ মহাবলীয়ান জাতি বলিয়া জগতে পরিচয় দিবার পথ নাই। এই কারণে স্থল-বিশেষে অত্যল্প ভোজনকেও পাপ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। এ জাতির পেট ভরিয়া খাইতে পারার পন্থা করিয়া দেওয়া প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীর কর্ত্তব্য। যিনি যেই পথ দিয়াই নিজ আন্দোলন পরিচালিত করুন, তাহার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য—দেশবাসীকে পেট ভরিয়া অন্নদান। যে যুগের তপস্বী মহাত্মারা বায়ু-ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেন, সেই যুগে এই ভারতে একটী লোকও অনাহারে মরিত না। যখন দেশ পঙ্গপালের ন্যায় জনতায় পরিপূর্ণ হইত, দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় এক একটী মহাযুদ্ধ হইয়া তখন লোক-সংখ্যা কিছু কমাইয়া দিত। লোক মরিত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত, নিজ গৃহাঙ্গনে পিতৃ পিতামহের নাম সকাতরে উচ্চারণ করিতে করিতে স্বহস্ত-রোপিত তুলসীর মঞ্চতলে কেহ অনাহারে মরিয়া পড়িয়া থাকিত না। সেই শুভদিন ভারতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহার জন্য অন্যান্য বহু সদুপায়ের সহিত এমন উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে যেন ধনী

বিলাসীরা অন্নের অপচয় না করিতে পারে এবং সঞ্চয়ক্ষম ব্যক্তির সঞ্চিত খাদ্য-নিচয় গিয়া সঞ্চয়ে অক্ষম ব্যক্তিদের ভগ্ন অন্ন-থালিকার কোণে কিছু কিছু করিয়াও পড়িতে পারে।"

অকিঞ্চন-বৃত্তি

যশোহর-গঙ্গারামপুর নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নিষ্কিঞ্চন-বৃত্তি ভগবন্নির্ভর লাভের এক অপূর্ব্ব সাধন। যাহার কিছুই নাই, ভগবানে নির্ভর তাহার অতি সহজে আসে। এই কারণেই, লক্ষ্য করিবে, দরিদ্র শ্রেণীর ভিতর হইতেই অধিকাংশ ভগবদ্‌ভক্তের অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে। জগতে যাহার নিজের বলিয়া কিছু সম্বল আছে, সে সহজে ভগবানের কথা স্মরণে আনিতে চাহে না ; কিন্তু যার সকল আশ্রয় ঘুচিয়াছে, সকল সম্বল টুটিয়াছে, সকল বস্তুর ও ব্যক্তির উপর হইতে ভরসার সাহস উঠিয়া আসিয়াছে একমাত্র সে-ই কাতর কণ্ঠে গাহিতে পারে,—

'সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমারি দুয়ারে এসেছি,
সকলের কাছে বঞ্চিত হ'য়ে
তোমারেই ভালবেসেছি।'

—নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না, নিজের কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করিও না, মনে প্রাণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও বিত্তহীন বলিয়া জ্ঞান করিবে, জাগতিক কোনও ভরসায় ভর করিও না, সকল আশার বল্লরী দৃঢ়হস্তে সমূলে উৎপাটন করিয়া, সকল আশ্বাসের মহীরুহ বিবেকের কুঠারাঘাতে ছিন্নমূল ও ভূতলশায়ী করিয়া নিজেকে ছাদহীন গৃহতলবাসীর ন্যায় একান্তই নিরাশ্রয় জ্ঞান করতঃ সেই পরমপাতা পরমবিধাতার চরণাশ্রয়ী কর। ইহাই প্রকৃত অকিঞ্চন-বৃত্তি বলিয়া জানিও। বৃত্তি বলিতে বাহিরের আচরণের অপেক্ষা মনের অবস্থার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিও। মনে মনে অকিঞ্চন হও, তাহা হইলেই সহজে ও স্বল্প সময়ে জীবনের উপরে ভগবৎ-করুণার প্রত্যক্ষ বর্ষণ সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে।"

অর্থ-পিপাসুর ধ্যান-জপ

ত্রিপুরা-ভলাকূট নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নিরন্তর অর্থ-পিপাসুর ধ্যান, জপ, তপ, আরাধনা অধিকাংশই ব্যর্থ হইয়া থাকে। চক্ষু বুজিলে সে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন না করিয়া শুধু রূপার চাক্তিই দেখিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশরীর পরিবর্ত্তে মনের কাণে সে অবিরাম টাকার ঝনৎকারই শ্রবণ করিতে থাকে। অর্থ সম্পর্কে লালসার কতক পরিনির্ব্বাণ না ঘটা পর্য্যন্ত এভাবে তাহার ধ্যান-জপের একটা প্রধান অংশ ইন্দুরের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় গুপ্ত পথে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই যত প্রকারে পার, অর্থ-লালসাকে হ্রস্বীভূত করিতে প্রযত্নশীল হও। অর্থ ছাড়া এ জগতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব, ইহা যেমন সত্য, অর্থই জগতের সকল অনর্থের মূল, ইহাও তেমন সত্য। অর্থ অর্জ্জন কর, কিন্তু অর্থ-পিপাসা বর্জ্জন করিয়া। অর্থ সংগ্রহ কর, কিন্তু অর্থের লালসাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া। সংগৃহীত অর্থকে প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্য নানা সঙ্গত প্রণালীতে তাহা নিয়োজিত কর, কিন্তু অর্থের ধ্যানে প্রমত্ত না হইয়া। তোমার উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত উদর বা ক্ষুদ্র একটী মাত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগুলির উদর পরিপূরণ করিবে, এই জাতীয় বুদ্ধি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া তোমার সকল অর্থার্জ্জন-চেষ্টার সাথে মনে মনে নিখিল বিশ্বের হিত-কল্পনাকে যুক্ত করিয়া লও। ইহার ফলে অর্থার্জ্জন একটা কামনার বিলাস না রহিয়া মহাযজ্ঞে পরিণত হইবে। লোক-হিতেরত ব্যক্তির অর্থার্জ্জন ধ্যান, জপ, তপ ও আরাধনার তেমন গুরুতর বিঘ্ন হয় না।"

সৎকার্য্যে রুচি

ত্রিপুরা-বাবুরহাট নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সৎকার্য্যে অরুচির কারণ সৎকার্য্যের অনভ্যাস। যে যাহাতে অনভ্যস্ত, তাহার তাহাতে রুচি আসে না। অভ্যাস বলিতে মানসিক, বাচিক ও কায়িক

এই ত্রিবিধ অভ্যাসকেই বুঝিতে হইবে। মনের দ্বারা সৎকার্য্যের অনুচিন্তন করিতে থাকা হইতেছে সৎকার্য্যের মানসিক অভ্যাস। মুখের দ্বারা সৎকাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকা হইতেছে সৎকার্য্যের বাচিক অভ্যাস। শরীরের দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের চেষ্টা হইতেছে কায়িক অভ্যাস। রুচি থাকুক আর না থাকুক, জোর করিয়া ইহা করিতে হইবে। জগতে যতজন যত সৎকাজ করিয়াছেন, সকলের সকল সদনুষ্ঠানকে মনে মনে আলোচনা করিতে থাক, মুখে মুখে বলিতে থাক, শুনিতে থাক এবং অল্লাধিক পরিমাণে প্রত্যহ কিছু না কিছু করিয়া অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর। প্রাত্যহিক অল্প চেষ্টা বছরের শেষে গিয়া একটা বিরাট রূপ ধারণ করে। ব্যাসদেবের মত মহাকবিও বিরাট মহাভারত একদিনে রচনা করেন নাই। প্রত্যহই কিছু না কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ তোমার তমোময় চরিত্রের অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে। তখন দেখিবে, সৎকার্য্যে রুচি যেন তোমার এক স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি, সৎকার্য্যে আত্মদান যেন তোমার এক নিত্যলব্ধ অধিকার। সুতরাং কায়মনোবাক্যে অভ্যাসের অনুশীলনকে অব্যাহত রাখিতে যত্নবান হও।"

অসৎকার্য্যে অরুচি

শ্রীশ্রীবাবা ঐ পত্রেরই একাংশে লিখিলেন,—

"অসৎ কার্য্যে যে অরুচি আসে না, তাহারও কারণ এই যে, নিজেকে সর্ব্ব প্রকার অসদনুষ্ঠান হইতে কায়-মনো-বাক্যে বিরত রাখিবার অভ্যাসকে আশ্রয় করিতেছ না। মনে মনে সঙ্কল্প জাগাও যে, অসৎকার্য্যে আসক্ত হইবে না। বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প বর্দ্ধন কর যে অসৎকার্য্য হইতে বিরত হইতেই হইবে, শরীরকে এমন সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে নিয়া নিক্ষিপ্ত কর যেন সে অসৎকার্য্য মাত্রকেই তপ্তাঙ্গারবৎ বর্জ্জন করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। প্রথম দিনে যাহা কঠিন বোধ হইবে, দ্বিতীয় দিনে আর তাহা তত কঠিন থাকিবে না, তৃতীয় দিনে তাহা আংশিক সহজ বলিয়া অনুমিত হইবে, চতুর্থ দিনে তাহা সহজ হইবে, পঞ্চম দিনে তাহা অতীব সহজ হইবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ অসৎকার্য্য বর্জ্জন তোমার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া যাইবে। যে কোনও

বস্তুতে বা কার্য্যে রুচি ও অরুচি চেষ্টা দ্বারাই সৃষ্টি করা যায় এবং সেই চেষ্টা তোমাকে অবিশ্রাম করিয়া যাইতে হইবে।"

রুচি-সৃষ্টির নির্ভর-সাধ্য উপায়

উক্ত পত্রের শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সৎ বিষয়ে রুচি এবং অসৎ বিষয়ে অরুচি সৃষ্টি করার সম্পর্কে পুরুষকার-সাধ্য উপায়ই মাত্র উপরে বর্ণিত হইল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উন্নততর একটী উপায় আছে, যাহা নির্ভর-সাধ্য। নিজেকে সৎ বা অসৎ যে-কোনও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করিবার জন্য নিজস্ব চেষ্টার কোনও আবশ্যকতাই পড়ে না, যদি এই নির্ভর-সাধ্য উপায় অবলম্বন করা যায়। যিনি সকল সত্যের উৎস এবং সকল অসৎ যাহাতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই সৎস্বরূপ, সেই সত্যস্বরূপ, সেই চির-নির্ম্মল, চির-পবিত্র, চির-সুন্দর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিবার সাধনে একাগ্র মনে একান্ত প্রাণে ব্রতী হইলে, যাহা অসৎ তাহাতে অরুচি সৃষ্টি এবং যাহা সৎ তাহাতে রুচি প্রদান শ্রীভগবান্ স্বয়ংই করিবেন। এই পন্থা পূর্ব্ববর্ণিত পন্থা অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুরুষকার-সাধ্য উপায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজে নির্ভর আসে। সুতরাং প্রথমে পুরুষকারের পথেই চলিও, পরে নির্ভরের পথে নামিও। ইহাতেই সিদ্ধির পূর্ণতা লব্ধ হইবে।"

ওঙ্কার ও অর্দ্ধমাত্রা

রৌদ্র না কমিতেই স্থানীয় যুবকেরা উপদেশ-লাভার্থ সমাগত হইলেন।

একজন ওঙ্কারের উপরস্থ অর্দ্ধমাত্রার বিষয়ে প্রশ্ন করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই বিষয়ে তান্ত্রিক আচার্য্যদের প্রমাণ-বচন এই যে,—

"অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা, উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে,
মকারো ভগবান্ রুদ্রো, প্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।"

অর্থাৎ—"ওঙ্কারের অ হচ্ছেন ব্রহ্মা, উ হচ্ছেন বিষ্ণু, ম হচ্ছেন মহেশ্বর, আর উপরের চন্দ্রবিন্দুটী হচ্ছেন মহেশ্বরী।" শ্লোকটী দেবভাষায় রচিত এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত। সুতরাং না মেনে আর উপায় কি? কিন্তু বাছা,

যুক্তি এবং অনুভূতি এই দুইটী জিনিষকে ত' আর গলা টিপে মারা চল্‌বে না। তান্ত্রিক সাধকেরা ত' ওঙ্কারের আচার্য্য নন। তাঁরা ত' প্রণবের সাধক নন। তবে কি ক'রে তাঁদের কথিত প্রণব-ব্যাখ্যা তোমার পক্ষে প্রামাণ্য হবে? এই প্রশ্নটী তোমার প্রথমেই আস্‌বে। হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং প্রভৃতি মন্ত্রের সাধনার ভিতর দিয়ে যাঁরা তত্ত্বদর্শন করেছেন, তাঁরা প্রণব-ব্যাখ্যা করেনই বা কি উদ্দেশ্যে? এই প্রশ্নও তোমাদের মনে জাগ্‌বে। আবার প্রণবের এই ব্যাখ্যার ভিতরে ব্রহ্মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, বিষ্ণুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মহেশ্বরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মহেশ্বরীকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি, মহালক্ষ্মীকে কেন দেখ্‌ব না? গোবিন্দকে যদি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবে লক্ষ্মী-গোবিন্দ কেন একত্র থাক্‌বেন না? তাঁরা ত' নিত্য-যুগল! তাঁদের একজনকে বাদ দিয়ে ত' আর একজনের পূজো হয় না!—এ সব প্রশ্নও তোমার মনে জাগ্‌বেই জাগ্‌বে। "অ মানে ব্রহ্মা, উ মানে বিষ্ণু, ম মানে মহেশ্বর, আর চন্দ্রবিন্দু মানে দুর্গা,"—যাঁরা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা তোমার প্রশ্ন শুনেই হয় ত' বিরক্ত হবেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রণব-ব্যাখ্যাচ্ছলে ব্রহ্মাদির কৌলীন্য-বৃদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বেদমন্ত্রের যখন আবির্ভাব বা সংগ্রথন, তার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব থেকেই ওঙ্কারের সাধন প্রচলিত রয়েছে। সেই সাধনেরই ফল নিখিল বেদ, সেই সাধনেরই ফল সর্ব্বোপনিষদ, সেই সাধনেরই ফল বা প্রভাব পরবর্ত্তী অধিকাংশ শাস্ত্র। কিন্তু সেই স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত খাঁটি প্রণব-সাধক প্রণবের ভিতরে ব্রহ্মাকেও খোঁজেন নি, বিষ্ণুকেও খোঁজেন নি, মহেশ্বরকেও খোঁজেন নি, মহেশ্বরীকে ত' দূরের কথা। প্রণব হচ্ছেন অখণ্ড-মহামন্ত্র, অখণ্ড-তত্ত্ব এঁর মহাসাধন, খণ্ড ভাবে তত্ত্বকে বা সত্যকে দর্শন প্রণব-সাধকের পন্থা নয়। সুতরাং প্রণবের ব্যাখ্যা স্বরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণকে আমদানী করার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রণবকে ব্যাখ্যা করা নয়, পরন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণেরই কৌলীন্য বৃদ্ধি করা। প্রণবের অসাধক সাধারণ তান্ত্রিকগণের পক্ষে এই কথা ধ্রুব সত্য জানবে।

প্রণব-ব্যাখ্যার প্রকৃত তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সর্ব্বমন্ত্রেরই চরম ফল প্রণব। তান্ত্রিক সিদ্ধ-সাধক তাঁর হ্রীং, ক্লীং, হ্রীং, শ্রীং, হৈং, হুং, ঐং প্রভৃতি বীজমন্ত্র জপ কত্তে কত্তে চরম ফল প্রণবকে দর্শন কত্তে সমর্থ হয়েছেন এবং প্রণবের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রণবের কৌলীন্য স্বীকার-ব্যপদেশে নিজের সাম্প্রদায়িক সংস্কার অনুযায়ী রূপকের ভিতর দিয়ে প্রণবের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃত কথাটা বল্‌তে চেয়েছেন এই যে, ব্রহ্মা থেকে যেমন সৃষ্টিই সুরু, অকারের উচ্চারণ থেকে তেমন প্রণবের অনুভূতির সুরু, বিষ্ণুকে দিয়ে যেমন স্থিতির প্রসার, উকারের উচ্চারণ দিয়ে তেমন প্রণবের অনুভূতিতে স্থিতি, মহেশ্বরকে দিয়ে যেমন সর্ব্বসৃষ্টির উপসংহার, মকারের উচ্চারণ দিয়ে তেমন প্রণবানুভূতির উপসংহার। কিন্তু প্রণব এম্‌নিই এক মন্ত্র যে, এর সুরু থাক্‌লেও শেষ নেই, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে এর সুরুও নেই শেষও নেই, তুমি তোমার সাধন-কার্য্যের সুবিধার জন্য এর একটা সুরু কল্পনা ক'রে নিচ্ছ মাত্র, কিন্তু এর সুরু নেই ব'লেই শেষ নেই। প্রণবের শেষ হয়েও যে শেষ হ'ল না, এই তত্ত্বটুকুকে বুঝবার জন্য তান্ত্রিক যোগাচার্য্য তান্ত্রিক রূপকের আমদানী ক'রে বল্লেন যে, 'ম' দিয়ে যদিও প্রণবানুভূতির উপসংহার হ'য়ে গেল ব'লে এইমাত্র বলেছি, তবু জান্‌বে, সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষের সমক্ষে যেমন প্রকৃতি চির-চঞ্চলা নৃত্য-বিলসিতা সদা লীলা-লাস্য-ময়ী অবিশ্রান্ত প্রবহমানা, ঠিক্ তেম্‌নি ওঙ্কারের অনুভূতিটী সুরু হ'য়ে, স্থির হ'য়ে, শেষ হ'য়ে গিয়েও অবিরাম ছন্দকুশলা, অবিরত ধারা-চঞ্চলা, অনিবার ক্রমবর্দ্ধনশীলা।

প্রণবই তোমার লক্ষ্য হউক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণব উচ্চারণে অ, উ, বা ম এদের কোনোটাই আসে না, অথবা এদের প্রত্যেকটাতেই অত্যল্প এবং স্বল্পকালস্থায়ী-ভাবে একটা আমেজ আসে। এটা হ'ল phonetics বা ধ্বনি-তত্ত্বের দিক্ থেকে কথা। কিন্তু সেই ধ্বনিতত্ত্বকে নিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে উপনীত করান ব্যাপারটী প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মাদির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি দেব-পরম্পরাকে মানেন, তিনি সর্ব্বদেবের সাধনার বস্তু, সর্ব্বদেবের দেবত্ব-বিধায়ক,

সর্ব্বদেবের চরম লক্ষ্য প্রণবকেও ঐ সব খণ্ড দেবতার মাঝ দিয়েই বুঝতে বা বুঝাতে চাইবেন, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কিন্তু তাই ব'লে প্রণবের সাধন কত্তে গিয়ে তোমরা আবার প্রণবের মাথায় একটী ব্রহ্মা, মধ্যে একটী বিষ্ণু, লাঙ্গুলে একটী শিব এবং উপরের চন্দ্রবিন্দুতে একটী মহেশ্বরী অঙ্কন ক'রে হট্ট-গোলে গিয়ে পতিত হয়ো না। যাঁরা একটী প্রণবের মাঝে চারিটী দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কন করেন, প্রণবের সাধন তাঁদের লক্ষ্য নয়, ঐ সব দেবতাদের সাধনই তাঁদের লক্ষ্য। প্রণবই তোমার লক্ষ্য হোক্, তুমি অন্য দিকে মন দিও না।

সকলে এক পরমেশ্বরকেই দর্শন করেন

অতঃপর অন্যান্য প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। একজনের একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ঈশ্বর-দর্শন ব্যাপারটার কখনো শেষ নেই জান্‌বে। দর্শন অসীম, অফুরন্ত, তাঁকে দেখে শেষ করা যায় না, দেখে দেখে নয়ন ক্লান্ত হয়, তবু দেখা ফুরায় না। তোমার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্বল্পশক্তি একটী মস্তিষ্ক কতখানি অনুভূতিকে নিজের ভিতরে পূরে রাখ্‌তে পারে? বাল্‌তি যত বড়ই হোক্, সমগ্র সমুদ্রটাকে তার ভিতরে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। সমাধিস্থ যোগী মস্তিষ্কের শক্তির ওপারে গিয়ে, মনোবুদ্ধির ঊর্দ্ধে আরোহণ ক'রে ভগবানকে যেরূপে এবং যেরূপ দর্শন করেন, ব্যুত্থান-কালে তার অতি অল্প একটু আভাষ মাত্র নিয়ে আস্‌তে পারেন। বিদ্যুদালোকের বিদ্যুৎটা যেমন চখ ঝল্‌সে দিয়েই পালিয়ে যায়, কিন্তু তার রূপের ছটাটুকু চখে লেগে থাকে। অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অসীম রূপানুভূতির হয় ত ব্যুত্থান-কালে শুধু কৃষ্ণবর্ণ টুকুই তোমার মনে রইল, তুমি বল্‌লে, "মহাকালীর মূর্ত্তি দর্শন কল্লুম।" হয়ত বা জলধর-শ্যাম বর্ণটুকুই তোমার মনে রইল, তুমি বল্‌লে,—"দ্বিভুজ-মুরলীধারী কৃষ্ণসুন্দরকে দেখে এলুম।" হয়ত বা দুর্ব্বাদল-শ্যাম বর্ণ টুকুই তোমার মনে রইল, তুমি বল্‌লে,—"নয়নাভিরাম রামরূপ দর্শন ক'রে এলাম।" হয়ত বা পীতবর্ণ টুকুই তোমার মনে রইল, তুমি বল্‌লে,—"দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গামাতাকে দর্শন ক'রে এলাম।" হয়ত বা শ্বেতবর্ণ টুকুই তোমার মনে রইল, তুমি বল্লে,—"বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি মাতা সরস্বতীকে দর্শন ক'রে এলাম।" হয়ত শ্বেত, পীত, কৃষ্ণাদি

কোনও বর্ণই তোমার মনে রইল না, বর্ণাতীত বর্ণস্মৃতিমাত্রবর্জ্জিত এক নিরপেক্ষ শান্ত ভাব তোমার সমগ্র মন জ'ড়ে রইল, তুমি বল্লে—"নিরাকার নিরঞ্জন, পরাৎপর, পরমাত্মাকে দর্শন ক'রে এলাম।" দেখে এসেছ প্রকৃত প্রস্তাবে যা, তার স্বল্পাংশই তোমার সীমাবদ্ধ মস্তিষ্কের ধারণাযোগ্য, তারও আবার স্বল্পতর অংশই তোমার ততোধিক সীমাবদ্ধ মনুষ্যভাষায় প্রকাশ-যোগ্য। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অনুভূতির বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়। অথচ সকলে এক পরমেশ্বরকেই দর্শন করেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই অনুভূতির কথা বর্ণনা করেন।

স্বপ্নলব্ধ দর্শনে ও ধ্যানলব্ধ দর্শনে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধন-পথে নেমে কত রকমের রূপদর্শন যে হবে, তার ইয়ত্তা নেই। ধ্যান কত্তে ব'সে কত দেখ্‌বে, ঘুমের ভিতরে স্বপ্নযোগেও কত দেখ্‌বে। কিন্তু ধ্যানকালীন এই দর্শনে এবং স্বপ্নকালীন এই দর্শনে তফাৎ রয়েছে। স্বপ্নকালে তোমার মনের দুটী জিনিষের মস্ত অভাব। প্রথমতঃ তোমার মন তখন নিষ্প্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক বিষয় সম্পর্কে প্রত্যাহারশীল বা সতর্ক নয়। দ্বিতীয়তঃ তোমার মন তখন একাগ্র বা এক-কেন্দ্রগ নয়। তাই স্বপ্নকালীন দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব্ব-সংস্কার, পাপ সংস্কার ও অবাঞ্ছিত সংস্কার নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা কর্ব্বে। এই জন্যই স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশ অনেক সময় সত্য হয় না, অথচ ধ্যানলব্ধ প্রত্যাদেশ সর্ব্বদাই সত্য হয়।

মহদ্‌ব্রতে আত্মাহুতি

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা কতিপয় ভক্তসহ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম দেখিতে চলিলেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন বাবু শ্রীশ্রীবাবার চরণ-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কত প্রেমভরে নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্ম আমরা কতটুকু কচ্ছি, তাতে কিছু আসে যায় না। We may not succeed in creating a wonderful thing but what we *must* do is perfect surrender of our whole

strength at the feet of a great ideal. There may be no light at all but let us be burnt out for a noble cause. [জগতে একটা আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান হয়ত' আমরা গড়িয়া যাইতে না পারি, কিন্তু যাহা আমাদের অবশ্যই করিতে হইবে, তাহা হইতেছে, আমাদের সমগ্র শক্তিকে একটা মহান্ আদর্শের চরণ-তলে নিঃশেষে সমর্পণ করা। হয়ত আলোক কিছুই হইবে না, কিন্তু আমাদিগকে মহদ্‌ব্রতার্থে দগ্ধিয়া ভস্মীভূত হইতে হইবে।]

ভাবের শক্তি

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক একটা ভাবের শক্তি জগতে মহা-বিপ্লবের সৃষ্টি করে। অতন্দ্রিত আলস্যে আসুন আমরা সেই ভাবের চর্চ্চা করি, সাধন করি, ধ্যান জমাই, যার বলে জগতের দুঃখ-নিচয় বিনাশ পাবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা অপর একটী প্রতিষ্ঠান দর্শন করিতে গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদিকে কর্ম্মহীন আলস্য পরতন্ত্র তামসিকতাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান নামে পরিচিত মঠ-মন্দিরাদি ও অপর দিকে রজঃকর্ম্মপরায়ণ, নিয়ত উত্তেজনায় চঞ্চল, হিংসা-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত-চিত্ত কর্ম্মীদের সমবায়ে গঠিত বহু প্রতিষ্ঠান,—এই দুই বিপরীত-পথগামিগণের মধ্যে অবস্থিত চাই আজ এমন প্রতিষ্ঠান, যেখানে কর্ম্ম হবে ব্রহ্মসমর্পিত, তপস্যা হবে বিশ্বের সাথে যোগ রেখে, বিশ্বের সাথে যোগ হবে তপস্যার সাথে যোগ রেখে।

পবিত্র হও

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা মৌনী হইলেন। রাত্রে দুইটী যুবক শ্রীচরণ দর্শনে আসিলে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"Are you improving in mind? I want a pure mind in you. I love you no doubt, but my love will never enter into an unholy alliance with anything impure. Be pure. Sanctity of purpose will breed sacrifice. I have much faith in my children. You are to fulfil my

hopes. Never believe, you cant. One failure is not all failure in life. You can re-create life by stubborn efforts" [তোমরা কি মানসিক উন্নতি সাধন করিতেছ ? তোমাদের ভিতরে আমি পবিত্র মনের বিকাশ দেখিতে চাহি। যদিও আমি তোমাদিগকে ভালবাসি, কিন্তু আমার এই প্রেম কোনও অপবিত্রতার সহিতই অনার্য্য সন্ধি স্থাপন করিবে না। পবিত্র হও। উদ্দেশ্যের পবিত্রতাই ত্যাগের জন্ম দিবে। আমার সন্তানদের উপরে আমার অনেক আশা। আমার সেই আশা তোমাদিগকেই পূরণ করিতে হইবে। তোমরা তাহা পার না, এরূপ বিশ্বাস করিও না। একবারের অসাফল্যই জীবনের চরম অসাফল্য নহে। প্রচণ্ড প্রয়াসের বলে নূতন করিয়া তোমরা জীবনকে গড়িতে পার।]

চট্টগ্রাম

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

নাম মঙ্গলময়

প্রাতে কধুরখিল হইতে সমাগত জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলে, শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধ্যানজপে বস্‌বার আগে চিন্তা ক'রে নেবে যে, নাম মঙ্গলময়, নাম চিরকল্যাণদাতা, নাম নিত্যকুশলান্বিত। এখন তুমি নামের মঙ্গলময়ত্বের প্রমাণ পাও আর না পাও, নামে লেগে থাকৃতে থাকৃতে নিশ্চয়ই এর অমৃত-রস আস্বাদিত হবে। এইরূপ চিন্তা বারংবার ক'রে নিলে নামে রুচি জন্মে এবং তার ফলে ধ্যান সহজে জন্মে।

নামজপকালীন অস্বস্তি

ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—নাম কত্তে বস্‌লে অনেক সময়ে বাহ্য উপদ্রবে বড় অস্বস্তি বোধ হয়। তখন কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের শব্দ ক [illegible] বিঘ্ন উৎপাদন কত্তে চাইলে, মনে মনে ভাব্‌বে, তোমার কাণ মোম [illegible] রেখেছ। শৈত্যবোধ হেতু যদি অস্বস্তি বোধ কর, মনে মা [illegible] রয়েছে। যদি উষ্ণতা-বোধ হেতু

হয়েছে। যদি দুর্গন্ধময় স্থানেই থাক্‌তে হয়, চিন্তা করবে, তোমার নাকে কর্ক অাঁটা রয়েছে। এরূপ বিরুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বাহ্য-উপদ্রবজনিত অস্বস্তি দূর হয়।

নামজপ ও ধ্যানের পার্থক্য

ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—নামজপা আর ধ্যান-করার তফাৎ কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের রূপময় দেহের চিন্তনের নাম ধ্যান, আর, শব্দময় দেহের চিন্তনের নাম জপ। তফাতের মধ্যে এইটুকুই। নইলে, ধ্যানের সময়ও নাম আসে, জপের সময়েও ধ্যান আসে। তাঁর রূপ চিন্তনের সময়ে আস্তে আস্তে মন থেকে সকল শব্দের স্মৃতি বা তরঙ্গ যেন লোপ পেতে আরম্ভ করে এবং একটা অনির্ব্বচনীয় ধ্বনির প্রবাহ মাত্র অনুভূত হয়। ঐ অনির্ব্বচনীয় ধ্বনির প্রবাহ নামেরই প্রবাহ। আবার, ভগবানের নাম জপ কত্তে কত্তে ক্রমশঃ যখন মন বহির্ম্মুখতা ত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখ হ'তে আরম্ভ করে, তখন বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রয়াসে অনির্ব্বচনীয় রূপবৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘট্‌তে থাকে। এই রূপও তাঁরই রূপ। ধ্যান-যোগী রূপের প্রবাহে মন ঢেলে দিয়ে দেখা পান অনাহত মহানামের, আর জপ-যোগী শব্দ-প্রবাহে মন ঢেলে দিয়ে দেখা পান স্বয়ম্প্রকাশ রূপের। এই অবস্থায় এসে নাম ও রূপ মিলে এক হয়, অভেদ হয়, দুটীর পার্থক্য কল্পনা করাও তখন অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। হাইড্রোজেন গ্যাস আর অক্সিজেন গ্যাস একত্র মিলে জল হ'য়ে যাবার পরে যেমন হাইড্রোজেনও থাকে না, অক্সিজেনও থাকে না, এখানে এসেও তাই হয়। তখন তাঁর রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মাপকাটির অনন্ত ঊর্দ্ধে, তাই আমরা তখন তাঁকে নাম দিই অরূপ। তখন তাঁর নাম আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দতত্ত্বের অতীতে, তাই আমরা তখন তাঁকে নাম দিই অনাম। ব্রহ্মকে যে নামরূপের অতীত বলা হয়, তা এই অবস্থাতেই।

জী ... ঘুর পরিমাণ

প্রাতঃকাল হইতে ... ার বক্সিরহাটে অবস্থিত বাসস্থানে ... দারুণভাবে ধরিয়াছেন। সময়ের ... বন বলিয়া কথা দিয়াছেন।

অতএব উক্ত ভক্ত যথাসময়ে একখানা গাড়ী করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে এবং অপর কতিপয় ভক্তকে লইয়া গেলেন। সেখানে নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবের কি আয়ুর কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মদ্বারা জীবের এই জন্মের আয়ু নির্দ্ধারিত হয়। কেউ দশ বছর, কেউ বিশ বছর, কেউ একশ বছর, কেউ একশ বিশ বছর পরমায়ু নিয়ে আসে। কিন্তু একজন পুলিশ-দারোগার যেমন নির্দ্দিষ্ট একটা মাইনে থাকে এবং চেষ্টা কর্ল্লে সে যেমন উপরিও কিছু উপার্জ্জন কত্তে পারে, তেমন জীব ইচ্ছা কর্ল্লে তার এই জন্মের কর্ম্মের দ্বারাই আয়ুর পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু সরকারী চাকুরের যেমন নিজের দোষে মাইনে কম্‌তে পারে বা গুরুতর অপরাধে হঠাৎ চাকুরী যেতে পারে, ঠিক্ তেম্‌নি জীবেরও এই জন্মের কর্ম্মের দোষেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে প্রাপ্ত দীর্ঘ আয়ু কমে যেতে পারে বা হঠাৎ মৃত্যুও ঘট্‌তে পারে।

আয়ুঃক্ষয়ের কারণ ও আয়ুর্বৃদ্ধির উপায়

বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কি কাজ কর্ল্লে আয়ুক্ষয় ঘটে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে কাজ কর্ল্লে মনের স্থিরতা নষ্ট হয়, চিত্তে তাপ ও মর্ম্মদাহ জন্মে, সে কাজেই আয়ুঃক্ষয় হয়। দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, শোক ও কাম-পরায়ণতা সদ্য-আয়ুর্নাশক। যে কাজে চিত্তের ধৈর্য্য জন্মে, চিত্ততাপ প্রশমিত হয়, দারুণ অশান্তি শান্ত হয়, শোকদুঃখ দূর হয়, সে কাজে আয়ুও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য আয়ুর বৃদ্ধিকর, অসংযম আয়ুর্নাশকর, কারণ, ব্রহ্মচর্য্য চিত্ত-প্রশান্তির সামর্থ্য জন্মায়, অসংযম চিত্তপ্রশান্তি নষ্ট করে। সস্ত্রীক পরিমিত সম্ভোগ এবং সামর্থ্যপক্ষে সস্ত্রীক অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য আয়ুর্বৃদ্ধিকর। কারণ এতে চিত্ত-প্রশান্তির আনুকূল্য আসে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে অপরিমিত সম্ভোগ এবং পরপুরুষ বা পরনারী গমন অত্যন্ত আয়ুর্নাশকর। কারণ এতে চিত্ত প্রশান্তির দারুণ বিঘ্ন ঘটে। বিষণ্ণতা, উৎসাহ-হীনতা, হতাশ নিরুদ্যম ভাব আয়ুর্নাশকর, প্রফুল্লতা, উৎসাহশীলতা, আশাপরায়ণতা আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সব চেয়ে বেশী আয়ুর্বৃদ্ধিকর কাজ কি এবং সব চেয়ে বেশী আয়ুঃক্ষয়ই বা হয় কিসে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কামচিন্তা সব চেয়ে বেশী আয়ুঃক্ষয়কর; আর ভগবৎ-চিন্তা সব চেয়ে বেশী আয়ুঃপ্রদ।

গায়ত্রীর ধ্যান

একজন ব্রাহ্মণ যুবক প্রশ্ন করিলেন,—গায়ত্রীর অর্থ-বিচার কর্লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই মন্ত্রে লক্ষিত হচ্ছেন পরমাত্মার তেজ কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা-কালে গায়ত্রীর জপকালীন স্ত্রীমূর্ত্তির আবাহন ও বিসর্জ্জন হ'য়ে থাকে কেন? উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গায়ত্রীর মন্ত্র হচ্ছে ধ্যানের অনুপ্রেরণা। "ধীমহি" মানে "ধ্যান কচ্ছি"। কার ধ্যান? ভর্গো বা তেজের। কার তেজ? না, ভূর্ভুবঃস্বঃ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যিনি সবিতা বা স্রষ্টা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের যিনি স্রষ্টা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের যিনি স্রষ্টা, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের যিনি স্রষ্টা। এইখানে ধ্যান একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতির, পরমাত্মার স্বয়ম্প্রকাশ তেজের, যে তেজ যে জ্যোতি সাধন কত্তে কত্তে সাধকের দিব্যনেত্রে আপনি ফুটে ওঠে। এই হ'ল বৈদিক যুগের উপনিষদের ঋষির গায়ত্রীধ্যান। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিক সাধনার প্রসার ও কৌলীন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাবে স্ত্রীবিগ্রহের ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাবার এবং দেখ্‌বার একটা সর্ব্বজনীন রুচি সৃষ্ট হয়। স্ত্রীমূর্ত্তি-রূপে গায়ত্রার পরিকল্পনা সেই যুগের ইতিহাস। সেই যুগেই গায়ত্রীর আবাহন ও গায়ত্রীর বিসর্জ্জন-বিধি সন্ধ্যামন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সন্ধ্যাবিধি বেদ এবং তন্ত্রের মধ্যে একটা আপোষের ফল মাত্র। বিশুদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীর সাধনকালে স্ত্রীমূর্ত্তির ধ্যান, আবাহন বা বিসর্জ্জন করেন না।

কে শ্রেষ্ঠ? প্রাচীন না নবীন?

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাহা কিছু প্রাচীনতর, তাহাই শ্রেষ্ঠ ব'লে একটা মত আছে। সেই মতানুসারে যদি চল, তাহ'লে শুদ্ধ বৈদিকের জ্যোতির্ধ্যানই

শ্রেষ্ঠ। যা-কিছু পরবর্ত্তী প্রবর্ত্তন, তাকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করারও একটা রেওয়াজ আছে। যেমন বলা হয়, বৈদিক ধর্ম্ম থেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এটা পরবর্ত্তী প্রবর্ত্তন ; বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ এতে পরবর্ত্তিতর সমস্যার সমাধান আছে ; খ্রীষ্টধর্ম্ম থেকে ইসলামধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এ ধর্ম্ম তার চেয়েও আধুনিক ; শিখধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মের চাইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ এটা একেবারে আধুনিকতম। সেই হিসাবে যদি বিচার কত্তে বস, তাহ'লে তান্ত্রিকের স্ত্রীমূর্ত্তি চিন্তনপূর্ব্বক গায়ত্রীধ্যানই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই ভাবে এই উভয় পথের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার কোনো মীমাংসা হবে না। যে ব্যক্তি যে ভাবে গায়ত্রী ধ্যান কত্তে সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে, তার পক্ষে সেই মত কাজ করে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ।

গায়ত্রী ও প্রণব

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—গায়ত্রীর সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণবেরই সাধনা। প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে দুই দিকে দুই প্লুতস্বরে উচ্চারিতব্য ওঙ্কার দাঁড় করিয়ে দিয়ে বৈদিক ঋষি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, ওঙ্কাররূপী পরমাত্মাই তোমার পরমোপাস্য, নাদব্রহ্মের সেবাই তোমার পরম পন্থা। সমগ্র বেদের সার ব্রহ্মগায়ত্রী, আর গায়ত্রীর সার প্রণব। গায়ত্রী হচ্ছেন ওঙ্কার-সাধনার সঙ্কল্প মন্ত্র। গায়ত্রী বল্‌ছেন, ধীমহি, অর্থাৎ ধ্যান করি। গায়ত্রীমন্ত্র নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, তোমার সাধ্য কে, সাধন কি, আর ওঙ্কার হচ্ছেন গায়ত্রী-নির্দ্দেশিত সেই সাধ্য ও সাধন। গায়ত্রী উচ্চারণ করার মানে হচ্ছে ওঙ্কার-ব্রহ্মের সাধনার ব্রত গ্রহণ। এইজন্যই প্রাচীনকালে গারত্রীমন্ত্র গানের সুরে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হতেন। যা গাইলে ত্রাণ হয় অর্থাৎ ত্রাণের পথে দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত ও আত্মা অগ্রসর হয়, তার নাম গায়ত্রী। আর্য্য ঋষিরা গায়ত্রী-মন্ত্র মনে মনে জপ কত্তেন না, গোপন ক'রে রাখ্‌তেন না, উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী গান ক'রে তারপরে স্বগত ওঙ্কার-সেবা কত্তেন। যেমন আজকাল উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ-হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি বত্রিশ-অক্ষরান্বিত নাম কীর্ত্তন ক'রে তারপরে বৈষ্ণব সাধক গুরুগুহ্য 'ক্লীং-কৃষ্ণায়' জপ কত্তে বসেন। প্রণবের সাধনা সূক্ষ্ম-প্রাণায়ামাদির অপেক্ষা রাখে, এই জন্য নিতান্তই গুরুগুহ্য ছিল।

ত্রিসন্ধ্যা না, দ্বিসন্ধ্যা

শ্রীযুক্ত ন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—বর্ত্তমান ব্রাহ্মণেরা তিনবার গায়ত্রীর উপাসনা করেন, অথচ আপনি আমাদিগকে চারিবার উপাসনা কর্ব্বার উপদেশ দিতেছেন। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সন্ধ্যা ত' আর তিনটা নয়। সন্ধ্যা দিবারাত্রিতে দু'বারই হয়। একবার ঊষাকালে, আর একবার গোধূলিতে। দিবা ও রাত্রির মিলন মুহূর্ত্তেরই নাম সন্ধ্যা। একটীর অবসান ও অপরটীর অভ্যুদয় চিত্তে স্বভাবতই একপ্রকার বৈরাগ্য ও নিঃস্পৃহতা জাগিয়ে দেয় ব'লে ভজন-সাধনের, ধ্যান-ধারণার পক্ষে এ দুটী সময় বিশেষ অনুকূল। এজন্য বৈদিক ঋষিরা দিবা ও রাত্রির দুই সন্ধিক্ষণকে গায়ত্রী উপাসনার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলেন এবং ঠিক্ এই দুই সন্ধ্যাকালেই উপাসনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ব'লে উপাসনা করাকে আমরা আজ "সন্ধ্যা করা" ব'লে থাকি। পরবর্ত্তী যুগে যখন গায়ত্রীকে স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে কল্পনা ক'রে সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত হল, তখন গাত্রীর সত্ত্বময়ী, রজোময়ী ও তমোময়ী তিনটী মূর্ত্তির ধ্যানের জন্য তিনটী পৃথক্ সময় নির্দ্ধারিত হ'ল। দ্বিপ্রহরে উপাসনা করার প্রথা সেই সময়ের প্রবর্ত্তন। দিবা দ্বিপ্রহরে উপাসনা করাকে আমি কতকটা অবৈজ্ঞানিক ব'লেই মনে করি। এক দিকে যেমন এই সময়টায় বর্ত্তমান মানবকে ঘোরতর কর্ম্মসংগ্রামে লিপ্ত থাক্‌তে হয়, কাউকে অফিসে ব'সে কলম পেষ্‌তে হয়, কাউকে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে কুলী খাট্‌তে হয়, তেমনি আবার কয়েকটা মাস ধ'রে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ শুধু দেহকেই তপ্ত করে না, মনকেও তপ্ত করে। এ সময়ে অনবসর ব্যক্তির পক্ষে উপাসনা কঠিন কাজই বটে। কিন্তু বৎসরের সবগুলি দিনেই দ্বিপ্রহরের উত্তাপ অসহনীয় নয়, কিম্বা তুমি সপ্তাহের সবগুলি দিনেই দ্বিপ্রহরকালে বিদ্যার্জ্জনে বা অন্নার্জ্জনে ব্যস্ত থাক না। প্রত্যহ দুপুরে একটু একটু ক'রে উপাসনার অভ্যাস থাক্‌লে স্নিগ্ধ দিনগুলিতে আর ছুটীর দিনগুলিতে মজা মেরে ধ্যানে বসা যায়। তাই আমি দ্বিপ্রহরের উপাসনাটা অবৈদিক রীতি হ'লেও জোর ক'রে সমর্থন করেছি।

নৈশ উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—তান্ত্রিক সাধক নৈশ উপাসনার জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন, দ্বিপ্রহরা রজনী। গভীর নিশীথে জগতের প্রায় সকল জীব নিদ্রিত, মন এসময়ে নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ ও সহজে একাগ্র। তাই তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে তপস্যার এমন উৎকৃষ্ট সময় আর নেই। কিন্তু রাত্রি জেগে সাধনের মন্দ দিক্‌ও আছে। তখন মন যত সহজেই স্থির হোক্, নিশা-জাগরণের ক্লান্তি দিনমানে দেহকে নিবীর্য্য ও দুর্ব্বল করে. তার ফলে, মনও দিবাভাগে কতকটা ক্লিন্ন হ'য়ে পড়ে। এজন্য আমি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া রাত্রিজাগরণ ক'রে ধ্যান-ভজনের সমর্থক নই। নিয়মিত শয়নকালে বিছানার উপরে ব'সে যাও, দুনিয়ার যত কুচিন্তা আর স্বার্থ-চিন্তা কত্তে কত্তে না ঘুমিয়ে, নাম কত্তে কত্তে নামের আমেজ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়। এইটী হচ্ছে আমার মত। এর সুফলও প্রত্যক্ষ। যে যা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমোয়, নিদ্রাকালে অর্দ্ধজাগ্রত (sub-conscious) মন সেই চিন্তাটাই অবিরত কত্তে থাকে। তাতে মনের সংস্কারসমূহ সেই চিন্তার অনুরূপভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। শয়নকালে নাম কত্তে কত্তে ঘুমুলে দেহের নিদ্রাবস্থায় মন নামের জগতেই শুধু ভ্রমণ ক'রে বেড়ায় এবং ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে এভাবে সমগ্র জীবনটাই নামময় হ'য়ে যায়। কামুকতা যে তোমাদের ছাড়ে না বাবা, তার এক মস্ত কারণ এই যে, শোবার সময়েই তোমরা সারাদিনের চেয়ে বেশী কামচিন্তা কর।

গায়ত্রী ও প্রণবে অধিকার

ব্রাহ্মণ যুবকটী প্রশ্ন করিলেন,—গায়ত্রী ও প্রণব কি সকলেই জপ কত্তে পারে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ, পারে। সদ্‌গুরুর আদেশ যে পেয়েছে, সে বালক হোক্, স্থবির হোক্, ব্রাহ্মণ-পুত্র হোক্ আর চণ্ডাল-পুত্র হোক্, পুরুষ হোক্ আর স্ত্রীলোক হোক্, গায়ত্রী ও প্রণবে তার পূর্ণ অধিকার।

সন্ধ্যা-বাদ বিধির তাৎপর্য্য

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,–পঞ্জিকায় লেখা আছে দ্বাদশী, অমাবস্যা,

পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে সায়ং-সন্ধ্যা নাস্তি। এর অর্থ কি? ঈশ্বরের আরাধনায় আবার দিন-বিশেষ নিষিদ্ধ হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঐসব তিথিতে প্রাচীনকালে বেদপাঠ বন্ধ থাক্‌ত, ঈশ্বরারাধনা বন্ধ থাক্‌ত না। আজকাল যেমন স্কুল কলেজে holiday (ছুটী) আছে, তদ্রূপ। বর্ত্তমান সন্ধ্যামন্ত্রগুলি হচ্ছে বেদমন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন। এজন্য এখনো ঐ নির্দ্দিষ্ট অনধ্যায়ের দিনে বেদমন্ত্রপাঠ বর্জ্জন করার রীতি রক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দিনে গায়ত্রীজপ বা প্রণবজপ কিম্বা কেউ যদি দীক্ষা দ্বারা অন্য মন্ত্র সাধনার্থে পেয়ে থাকে তবে সে মন্ত্র জপ নিষিদ্ধ নয়।

ভগবান্ কি বাঞ্ছাকল্পতরু?

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবান্ কি বাঞ্ছাকল্পতরু?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয়। তবে, চাওয়ার মত চাইতে হবে। মুখে বল্লাম,—"ধন দাও", আর ধনার্জ্জনের জন্য চেষ্টা কল্লাম না,—এমন আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ পূরণ করেন না। মুখে বল্লাম,—"দেখা দাও," অথচ তাঁকে দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠল না,—এমন প্রার্থনা তিনি শোনেন না। এই তনুমন তাঁরই জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হোক্, এই রকম দৃঢ়তা নিয়ে যে তাঁকে চায়, সে তাঁকে পায়ই পায়। ঢিলা মনকে চাঙ্গা ক'রে যে অহর্নিশ তাঁর জন্য জেগে থাকে, জাগ্রতেও তাঁকে চায়, নিদ্রায়ও তাঁকেই খুঁজে মরে, সে তাঁকে পায়।

বিকাল হইয়া আসিলে, শ্রীশ্রীবাবা পাথরঘাটা আশ্রমে ফিরিলেন

নাম-সেবাই শ্রেষ্ঠ-ব্রত

আশ্রমে ইতিমধ্যে বহু জনসমাগম ঘটিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা আসন গ্রহণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—দেখ, সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তু নেই, যার দাম তাঁর নামের সমান। হীরা, মণি, জহরৎ দিয়ে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। প্রাণ ভ'রে তাঁর নাম সাধো, তিনি জীবন্ত বিগ্রহ ধ'রে এসে তোমাকে কোলে তুলে নেবেন, স্নেহের বুকের পরশ দিয়ে তোমাকে প্রাণের প্রাণ, আপনার আপন ক'রে নেবেন। নামে যুক্ত হওয়াই

শ্রেষ্ঠ যোগ, নামে আত্মাহুতি দেওয়াই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, নামে লেগে থাকাই শ্রেষ্ঠ ব্রত, নামে আত্মদানই শ্রেষ্ঠ দান। এই নাম যে তাঁর, একথা স্মরণে রাখাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান; এই নামই যে তিনি, এ কথা প্রত্যয় করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; নামে রুচিসম্পন্ন হয়ে তাতে লেগে থাকাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; নামকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আত্মহারা হ'য়ে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ প্রেম। নামের প্রবাহে স্নান করাই গঙ্গাস্নান, নামের জ্যোতিতে অবস্থানই তীর্থবাস, নামের সেবায় কামনাহীন চিত্তকে সম্যক্ অর্পণ করাই গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান, নামের সেবায় ব্রহ্মাণ্ড বিস্মরণই জীবন্মুক্তি।

ভগবানের নাম সর্ব্বরোগের মহৌষধ

কয়েকজন লোক রোগের জন্য ঔষধ চাহিতে আসিয়াছেন। নামের মহিমা-কীর্ত্তন তাঁহাদের ভাল লাগিল না, তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামই সর্ব্বরোগের মহৌষধ। নামের সেবা দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনকেই সাম্যাবস্থায় আনে। নামের সেবা পাপ বিনাশ করে, কর্ম্ম-বন্ধন কাটে, প্রাক্তনের বিধান খণ্ডন করে। এই কথা যে বুঝ্‌বে না, শুধু ঔষধে তার শান্তি আসে না।

চট্টগ্রাম

২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিবাহিতের সংযম-ব্রতে স্ত্রীর সাহায্য

অদ্য প্রাতঃকালে একটী বিবাহিত কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সস্ত্রীক জীবন-যাপনকারী ব্যক্তি যদি সংযম-পালনের ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে তার প্রয়োজন স্ত্রীকে সংযমের প্রতি অনুরাগিণী করা। নইলে নানা প্রকার অশান্তি ও অসুবিধা অনিবার্য্য। তাই সংযম-ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে স্ত্রীর মনোভাবকে অনুকূল ও সহানুভূতিশীল করার জন্য স্বামীর যথেষ্ট খাটুনি চাই। বিরোধবতী স্ত্রীকে নিয়ে সংযম-পালনের চেষ্টা, আর ভাঙ্গা দাঁড় দিয়ে নৌকা ঠেলা সমান কথা। সম-মত-সম্পন্না স্ত্রীকে

নিয়ে সংযম-পালনের চেষ্টা, আর, বাদামের জোরে নৌ-চালনা এক কথা। বাদামের নৌকার সাথে ষ্টীমারগুলিও পেরে ওঠে না। স্বামী ও স্ত্রীর যেখানে সংযমসাধনে সমান সম্মতি ও সমান চেষ্টা, সেখানে অকৌমার ব্রহ্মচারীব্রতে-স্থিত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও হার মেনে যায়।

স্বামীর সংযম ও স্ত্রীর পরপুরুষাসক্তি

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—স্বামী সংযমী হ'লে তার ফলে স্ত্রীর পরপুরুষে অনুরাগ বৃদ্ধির কি ভয় নেই ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আমি হচ্ছি দুনিয়ার drain inspector (নর্দ্দামা পরিদর্শক)। কোন্ নর্দ্দামায় কতখানি ক্লেদ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমাকে তা' দেখে বেড়াতে হচ্ছে। কত প্রতপ্তচিত্ত শান্তির আশায় জীবনের কলুষ-কাহিনীর চিররুদ্ধ দুয়ার এখানে এসে খুলে দেখিয়েছে। তা থেকে আমি কি শিখেছি জানিস্? স্বামী সংযম-ব্রত পালনেচ্ছু ব'লে জগতের অতি অল্প মেয়েই পরপুরুষগামিনী হয়েছে। স্ত্রী স্বামীর সাথে ভোগাসক্ত হয়েছে কিন্তু স্বামী উপযুক্ত পুরুষত্বের অভাবে তাকে কিছুতেই তৃপ্ত কত্তে পারে নি, এরূপ ক্ষেত্রেই পরপুরুষে রুচি অত্যধিক।

কোন্ স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষ-গামিনী হয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কোন্ সব মেয়েরা পরপুরুষগামিনী হয়, জানিস্? মনুষ্য-জীবনটা শুধু ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জন্য এবং বিবাহটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের ছাড়পত্র মাত্র, এইরূপ শিক্ষা ও ধারণা যাদের, সেই সব মেয়েরাই স্বামীর কাছে ভোগের তৃপ্তি না পেলে অন্যের কাছে ভোগ-ভিখারিণী হয়। স্বামীকে যারা একটা জন্তু মাত্র মনে করে এবং স্বামীর কাছ থেকে যা-কিছু প্রাপ্য, সবই শুধু ইন্দ্রিয়ের পথে, এই বিশ্বাস যাদের, তারাই প্রয়োজনমাত্র পরপুরুষে অনুরাগিণী হয়। এ ছাড়াও কোনো কোনো নারীকে পরপুরুষ-গামিনী হ'তে হয়েছে, কিন্তু সে সব স্থলে নারী স্বেচ্ছায় তার সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নি।

সংযম-ব্রত গ্রহণান্তে কর্ত্তব্য কি ?

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সংযম-ব্রত গ্রহণের পরেও মনের ভিতরে সম্ভোগ-লালসা জাগ্রত হ'তে পারে। তার জন্য কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনের দিক্ দিয়ে কর্ত্তব্য সম্ভোগ সুখের অনিত্যতা বিচার। নীতির দিক্ দিয়ে কর্ত্তব্য স্ত্রীর প্রতি কন্যাবৎ ও স্বামীর প্রতি পুত্রবৎ আচরণ। শিক্ষার দিক্ দিয়ে কর্ত্তব্য সংযম-ব্রতের অনুকূল সাহিত্যের চর্চ্চা এবং প্রতিকূল সঙ্গ ও সাহিত্যের পরিহার। দেহের দিক্ দিয়ে কর্ত্তব্য, একের দেহ অপরে নিষ্প্রয়োজনে স্পর্শ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শয়নের জন্য পৃথক্ শয্যা এবং আবশ্যকমত দূরবর্ত্তী দেশে সাময়িকভাবে অবস্থানের দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত দৈহিক ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধটার মধ্যে সঙ্কোচ সৃষ্টি করা। স্ত্রী পিত্রালয়ে বা স্বামী কার্য্যস্থলে গমনের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ কত্তে পারে। কিন্তু এই দৈহিক দূরত্ব বিধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি দিনের পর দিন একে অপরের সংযম-রুচি বর্দ্ধনের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা না যোগায়, তাহ'লে দূরত্ব সব সময়ে উদ্দেশ্য-সহায়ক হয় না, বরং বিপরীত ফল প্রদান কত্তে পারে। তীর্থে, গুরু-গৃহে, দেবমন্দিরে, শ্মশানে ও দেবপূজোৎসব-ক্ষেত্রে সম্ভোগ নিষিদ্ধ এবং সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং নিজ নিজ রুচি ও সুযোগের অনুকূলভাবে সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণ, গুরুগৃহে বাস, দেবমন্দির দর্শন, শ্মশানে অবস্থান ও পূজোৎসবাদিতে যোগদান করা উচিত।

সংযম-ব্রতীর তীব্র সম্ভোগাকাঙ্ক্ষার কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সংযমব্রতী যদি তীব্র সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পীড়িত হয়, তাহ'লে তার দেহের উপরে খুব খারাপ ফল হ'তে পারে। লিঙ্গমূলে বা যোনিমূলে তীব্রসঙ্কোচ ও তলপেটে অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি হ'তে পারে। এসব ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য, নাভিতে ও গুপ্তস্থানে প্রচুর শীতল জলধারা নিয়মিতভাবে সপ্তাহ-কাল পর্য্যন্ত প্রদান ক'রে এর উপশম করা, কোষ্ঠপরিষ্কারক পথ্যাদি গ্রহণ ক'রে উত্তেজনা উপশান্ত করা এবং অশ্বিনী ও যোনিমুদ্রার ঘন ঘন অভ্যাস করা।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, পরিতৃপ্তিহীন কামোত্তেজনা থেকেই পুরুষের শুক্রপাথরী আর স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি হয়।

হঠাৎ সংযম-ব্রত গ্রহণ করিতে নাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই অত্যন্ত কামাতুর ব্যক্তিদের হঠাৎ সংযম-ব্রত গ্রহণ কত্তে নেই। বরং কিছুদিন ভোগ-সম্ভোগের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে মনকে তৈরী ক'রে নিয়ে সংযমের ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যারা সংযমের শিক্ষা পায় নাই, দাম্পত্য জীবনে যথেচ্ছ ভোগেই উন্মত্ত হয়ে রয়েছে, সংযম-ব্রতের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'লে প্রথমে তাদেব নিয়ম করা উচিত,—"অন্ত দিন যাই করি আর না করি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কিছুতেই সহবাস কর্ব্ব না।" তীব্র সঙ্কল্প নিয়ে এই নিয়মকে পালন কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে হবে। এক শয্যায় থেকে অসম্ভব হ'লে, ঐ তুইটী তিথিতে বিভিন্ন শয্যায় থেকে নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে হবে। কারো কারো কাম-সংস্কার এত প্রবল যে, ভিন্ন শয্যায় শয়ন কর্লেও নিদ্রাঘোরে শয্যা-ত্যাগ ক'রে নিদ্রাবস্থাতেই অপর শয্যায় শয়ান সঙ্গীর সাথে নিজ জ্ঞানবুদ্ধির অজ্ঞাতসারে সম্ভোগে প্রমত্ত হয়। তেমন ক্ষেত্রে ভিন্ন গৃহে অবস্থান ক'রে এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মটী রক্ষা কত্তে হবে। মনকেও সঙ্গে সঙ্গে শাসনে রাখ্‌বার জন্ম সেই দিন দিবারাত্রি উপবাস-ব্রত পালন কর্লে ভাল। উপবাসে মনের চাঞ্চল্য বড় সহজে দূরীভূত হয়। কিছুদিন চেষ্টার পরে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সম্ভোগ বর্জ্জন যখন সহজ হ'য়ে যাবে, তখন নিয়ম কত্তে হবে, "একাদশী তিথিতে কিছুতেই স্ত্রীসঙ্গ বা স্বামি-সহবাস কর্ব্ব না।" এই তিথিতেও উপবাস-পালন হিতকর। এইভাবে মাসে চারিটী প্রধান দিনে মৈথুন-বর্জ্জন অভ্যাসে এসে গেলে নিয়ম কর্ব্বে, স্ত্রী ও স্বামী এই তুজনের জন্মবারে সম্ভোগ নিষেধ। তুজনের জন্মবার যদি একই দিনে পড়ে, তবে মাসে চার দিন, আর যদি তু'দিনে পড়ে, তবে মাসে আটদিন ত' সম্ভোগ-বর্জ্জন এভাবেই হ'য়ে গেল। এটুকু যার আয়ত্তে এসে গেল, তার পক্ষে ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক সংযম-ব্রত গ্রহণ করা কঠিন নয়। এই ব্রতে সাফল্য এলে তখন বর্ষব্যাপী বা ত্রিবর্ষব্যাপী ব্রত

অনায়াসে গৃহীত হ'তে পারে। এতে যে সিদ্ধকাম হয়, তার পক্ষে দ্বাদশ বর্ষের সংযম ত' প্রায় ছেলেখেলা।

সংযম-ব্রতীর ব্যাধি-দমন

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্‌ছিলেন, সংযমব্রতী যদি দুরন্ত মনশ্চাঞ্চল্যে পীড়িত হয়, তাহ'লে ব্যাধি হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীবাবা।—হাঁ, এই জন্যই মনশ্চাঞ্চল্য এলেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার জন্য সংযম-ব্রতীকে উদ্যোগী হ'তে হয়। শুধু সঙ্কল্পের বলে কাম-দমন হয় না, কামদমনে সাধনের বল চাই। সংযম-ব্রতীকে গভীরভাবে সাধন-পরায়ণ হ'তে হবে। তাহ'লে সর্ব্বব্যাধির কারণ নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে। প্রচণ্ড কামোত্তেজনার মুহূর্ত্তেও জোর ক'রে ব'সে একঘণ্টা নামজপ ক'রে দেখ, প্রত্যক্ষ ফল দেখ্‌তে পাবে। মন নামে বসতে না চাইলে তার সঙ্গে লড়াই ক'রে নাম চালাবে, তবু পরাজয় স্বীকার কর্ব্বে না। এভাবে জিদ্ ক'রে দুচার দিন নাম-জপ কর্‌লে তার পরে ক্রমশঃ কামোত্তেজনার শক্তিহ্রাস ঘট্‌তে থাকে,—পরিশেষে কামের আর কোনও প্রভাবই থাকে না।

সযম-সাধনে বৃথা কৌতূহল-বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংযম-সাধনে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে বৃথা-কৌতূহল বর্জ্জনের। দৈহিক লালসাই যে সব সময়ে সংযম-বিরোধী-ভাবকে উত্তেজিত করে, তা নয়,—অনেক সময়ে কামাদিমূলক বিষয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় কৌতূহলই মনকে বিষে জর্জ্জরিত ক'রে থাকে। ঠিক্ সম্ভোগের জন্যই চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তা নয়,—তবু মনের ভিতরে কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল—"আচ্ছা উলঙ্গিনী নারী দেখ্‌তে কি প্রকার?" অসতর্কতা বশতঃ মনকে শাসন কর্‌লে না, ভাব্‌লে,—"এ চিন্তায় আর ক্ষতি কি?" চিন্তাটী কিন্তু মনকে পেয়ে বস্‌ল। শত কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে উলঙ্গিনী রমণীমূর্ত্তি দর্শনের লিপ্সা মনের মাঝে ক্ষণকাল পরে পরেই উঁকিঝুকি মার্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। শেষে এমন হ'ল যে, যাকে কাছে পাচ্ছ, তারই কটিদেশের বস্ত্র কেড়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। গোড়ায় যদি কৌতূহলকে বর্জ্জন কত্তে, তাহ'লে এই যন্ত্রণাপ্রদ অবস্থার উদ্ভবই

হ'তে পাত্ত না। সম্ভোগ-লালসা নেই ব'লে তুমি স্পষ্ট অনুভব কচ্ছ অথচ মনের ভিতরে কৌতূহল জেগে উঠল,—"আচ্ছা রতিসুখরত নরনারীকে সম্মিলিত অবস্থায় কেমন দেখায় ?" বিদ্যুতের মত কথাটা মনের উপরে ঝলক খেলে গেল, তুমি তাকে শাসন করার জন্য তদ্‌বিরুদ্ধ চিন্তা কিছুই কর্লে না। কিন্তু এসব কৌতূহলের ধর্ম্মই হ'ল মনকে একটু একটু ক'রে বাগে আনা। দুদিন পরে পুনরায় সেই কথাটাই তোমার মনে এল। তুমি বিশেষ গ্রাহ্য কর্লে না। চিন্তাটা কিন্তু পথ পেল। ক্রমে খুব ঘন ঘন আস্‌তে আরম্ভ কর্ল। শেষে তার দৌরাত্ম্য এমন বেড়ে গেল যে, নারী বা পুরুষ যাকেই তুমি দেখ্‌তে পাও, মনশ্চক্ষু তাকেই সম্ভোগরত অবস্থায় দেখ্‌তে থাকে। এ সব চিন্তা ও মানসিক ছবি ক্রমে তোমাকে দিয়ে তা করিয়ে নেয়, যা তুমি কর্ব্বে না ব'লেই ব্রত গ্রহণ করেছ। গোড়ায় সতর্ক হ'লে এ দুর্দ্দৈব ঘটত না। এসব কৌতূহল আরো যে কত ভঙ্গীতে জাগ্‌তে পারে, তার নিশ্চয়তা নেই। প্রশ্রয়ের পরিচর্য্যা পেলে কৌতূহল বাড়ে,—এজন্যই এই বিষয়ে যোগীদের দৃঢ় অনুশাসন হচ্ছে,—"কৌতূহলং বিবর্জ্জয়েৎ।"

কামমূলক কৌতূহলের পরিণাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—এসব কৌতূহলকে অত্যন্ত বাড়্‌তে দিলে তার পরিণাম কোনো কোনো স্থলে কিরূপ হ'তে পারে, তার একটী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্দ্ধমানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছেলে পাগল হ'য়ে আমার কাছে আসে। তার রোগের সৃষ্টির ইতিহাস এই যে, একদিন স্কুলে ব'সে পড়্‌তে পড়্‌তে জানালা দিয়ে মৈথুনরত কুক্কুর-কুক্কুরীকে দেখে তার মনে কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল,—"কুক্কুরীর যোনি দেখ্‌তে হবে।" আত্ম-শাসনের চেষ্টাও নেই, তদনুকূল শিক্ষা-দীক্ষাও নেই। ফলে এই কৌতূহল তাকে পেয়ে বস্‌ল। শেষটায় তার এমন অবস্থা হ'ল যে, যাবতীয় পশু-পক্ষীর যোনি দর্শন না কর্‌লে তার প্রাণ বাঁচে না। পশুপক্ষী ধ'রে ধ'রে তাদের যোনি সে দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কৌতূহলের তীব্রতা আরো বেড়ে উঠ্‌ল। মনুষ্য-যোনি দেখ্‌বার জন্য সে অধীর হ'ল। প্রথমটায় ও পল্লীর অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়েই তার

কাছে লাঞ্ছিতা হ'ল। কিন্তু তার কৌতূহল আর কম্‌ল না, যুবতীর যোনি দর্শনের জন্য সে অস্থির হ'য়ে পড়্‌ল। নিদ্রিতা এক প্রতিবেশিনীর লজ্জাশীলতার সে হানি কর্ল্ল, মামলা হ'ল, বয়স অল্প ব'লে মাত্র এক বছরের জেল হ'ল। জেলে সে গেল সত্য, কিন্তু আত্মদমনের শিক্ষাকে ত' সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নি। এক বছর পরে জেল থেকে সে যখন বেরিয়ে আস্‌ল, তখন তার কৌতূহল আর একদিকে মোড় ফিরিয়েছে। ইংরেজের যোনি কিরূপ, মুসলমানীর যোনি কিরূপ, পার্শীর যোনি কিরূপ, য়িহুদীর যোনি কিরূপ, এই হচ্ছে তার নিকটে এখন জগতের সব চেয়ে বড় সমস্যা। বাপের ছিল টাকা, দুহাতে খরচ হ'তে লাগ্‌ল। হিন্দু, মুস্লিম, খ্রীষ্টান, য়িহুদী সব জাতির পতিতাদের পল্লী তার তীর্থস্থান হ'য়ে পড়ল। পিতা-মাতা পুত্রের বিয়ে দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষটায় এই যোনিতত্ত্ব-বিশারদ বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হ'লেন, হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা হল।

মানবীর যোনি জগন্মাতারই যোনি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই রোগীর আরোগ্যের ইতিহাসও তদ্রূপ। বাগান থেকে একটা ফুল তুলে এনে তার সাম্‌নে ধ'রে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—"এটা কি হে?" পাগল বল্লে—"ফুল।" আমি বল্লাম—"এটা ফুলও বটে, যোনিও বটে। এটা দেবপূজার উপকরণ, দেবতা এতে বাস করেন।" পাগল ফুলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি বল্লাম,—"এই ফুলটী থেকে বীজ হয়, সেই বীজ থেকে গাছ হয়, দেখ ত' দেখি তাকিয়ে, এই ফুলটী কত সুন্দর, এই গাছগুলি কত সুন্দর!" পাগল বল্‌লে,—"যোনি, হাঁ, সুন্দর।" এই ভাবে একটীর পর একটী বস্তুর প্রতি পাগলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাকে বুঝান হ'তে লাগ্‌ল, "যোনিই জগতে একমাত্র সত্যবস্তু, যোনিই সব কিছুর সৃষ্টির কারণ, যোনি থেকে যা কিছু সৃষ্ট হয় সবই সুন্দর, সবই লোভনীয়, জগতের প্রত্যেক বস্তুই যোনি-স্বরূপ এবং যোনি-সঞ্জাত, যোনি-মাত্রেই জগন্মাতার অধিষ্ঠান।" পাগল যখন সামান্য প্রকৃতিস্থ থাকৃত, তখন এসব কথা গিয়ে তার মনের বদ্ধমূল সংস্কারের মধ্যে আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে কাজ কর্ত্ত।

ক্রমে প্রধানতঃ এভাবেই সে নিরাময় হ'য়ে গেল। যে যোনি তার কাছে অপবিত্রতার আকর, সেই যোনির সম্পর্কে একটু একটু ক'রে পবিত্র চিন্তা তার পক্ষে যখন সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন তার রোগের মূলে পড়্‌ল কুঠারাঘাত। তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে যোনি-পূজন, যোনি-চিন্তন এক সময়ে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাঁরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল্‌বার মতলবে এ পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্ত্রীযোনিকেই জগন্মাতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ব'লে তাঁরা ধ্যান কত্তেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে যোনিময় দর্শন কত্তেন। যোনি-চিন্তা-জর্জ্জর রুগ্ন মনকে সুস্থ কত্তে হ'লে এ পন্থা উৎকৃষ্ট। কিন্তু গোড়াতেই কৌতূহলকে দমন করা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর পন্থা।

কাম-মূলক কৌতূহলকে দমনের উপায়

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কামমূলক কৌতূহলকে দমনের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঠিক তার বিরোধী বিষয়ে কৌতূহলকে সৃষ্টি করা। জগতে জান্‌বার জিনিষ কত কিছু র'য়ে গেছে। তবু তোমার মন শুধু কাম-বিষয়েই কৌতূহলী হয় কেন? কারণ, তুমি কামমূলক কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, তোমার জ্ঞানের ঐ অপূর্ণতাটা তোমাকে সম্পূর্ণ টুকু জান্‌বার জন্য তাড়না দিচ্ছে। অথচ তোমার মনে পরমাত্মা কেমন, বিশ্বসৃষ্টির অপার রহস্য কি, সত্য কি, প্রেম কি, পবিত্রতা কি, সেবা কি, ধর্ম্ম কি, যোগ কি, সাধন কি, ভজন কি, এ সব বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল উদ্দীপিত হচ্ছে না। এর কারণ এই যে, এসব বিষয়ে তুমি কোনো চর্চ্চা, কোনো অনুশীলন, কোনো জ্ঞান সঞ্চয় কর নি। একটু একটু ক'রে এই সব বিষয়ের চর্চ্চা কত্তে থাক্‌লে ক্রমে মনে এই সব বিষয় সম্পর্কিত কৌতূহল জাগ্রত হ'য়ে মনকে অধিকার ক'রে বসে এবং তদনুযায়ী কর্ম্মে সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করে। ভাল বিষয়ের কৌতূহল যদি তোমাকে পেয়ে বসে, তাহ'লে মন্দ বিষয়ের কৌতূহলের আর বস্‌বার স্থানটুকুও থাকে না। একজন নিউটন বা একজন জগদীশ বসুর মত বৈজ্ঞানিকের মন পদার্থ-বিজ্ঞান বা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে এত তীব্র কৌতূহলী যে, কামবিষয়ে কৌতূহল ত' দূরের

কথা, নাওয়া-খাওয়ার কথাও তাঁদের মনে ঠাঁই পায় না। একজন রবীন্দ্রনাথ বা একজন গান্ধীর মন সর্ব্ববস্তুতে সৌন্দর্য্য দর্শনে বা সর্ব্বকর্ম্মে সত্যানুসন্ধানে এত কৌতূহলী যে, এসব অপরিচ্ছন্ন কৌতূহলের স্থান সেখানে হয় না। এক-জন অরবিন্দ বা একজন রামকৃষ্ণের মন জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে এত কৌতূহলী যে, এর চেয়ে ছোট চিন্তার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মনকে শ্রেষ্ঠ বিষয়ে কৌতূহলী কর, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের পিপাসু কর, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের দিকে গতিসম্পন্ন কর, সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র ভগবৎ-সাধন চালাও, আপনি চিত্ত ঊর্দ্ধগামী হবে, দেহ ঊর্দ্ধরেতা হবে।

দাম্পত্য-জীবনে সংযম-ব্রত রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার জনৈক প্রিয় গৃহী ভক্তকে পত্র লিখিলেন,—

"স্বামি-স্ত্রী মিলিয়া তোমরা উভয়ে তোমাদের সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত প্রাণপণ যত্নে পালন করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। দম্পতি যেখানে সংযম রক্ষাপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম-সম্পন্ন, সেখানে মহামায়ার মায়া কাটিয়া যায়, মহাশিব আসিয়া দম্পতীর মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হন, মহাশক্তি স্বয়ং আসিয়া উভয়ের পরিচর্য্যা আরম্ভ করেন। দাম্পত্যজীবনে সংযম-ব্রত গ্রহণই সকল ব্রত গ্রহণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। রাজসূয় বা অশ্বমেধ যেমন নৃপবর্গকে রাজচক্রবর্ত্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রলোভন-সঙ্কুল বিবাহিত জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সম্বৎসরব্যাপী এই অসিধারা-ব্রতও তেমন মানব-মানবীকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন করে। আমৃত্যু সংযমব্রত বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রের প্রতি ব্যবস্থেয় হওয়া হাস্যাস্পদ ব্যাপার কিন্তু সম্বৎসর-ব্যাপী সংযম-পালনের ব্রত প্রত্যেক নরনারীরই গ্রহণীয়। দেশ এই মহাব্রতের মহিমা আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সুস্পষ্টভাবে অবগত নহে, দীর্ঘকাল হইল ইহার মহিমা এ জাতি বিস্মৃত হইয়াছে। তোমরা দুই একটী দুর্ল্লভ-রুচিসম্পন্ন সাধক-সাধিকা যে এই ব্রতে দৃঢ়ধী হইয়া চলিতেছ, তাহাই ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে সমগ্র দেশকে তোমাদের ভাবের ভাবুক করিয়া তুলিবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ব্রত অটুট ও অক্ষতভাবে সম্যক্ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে উদ্‌যাপিত হউক।"

চাই দধীচি ও শিব-পার্ব্বতী

লক্ষ্ণৌ-হজরৎগঞ্জ নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"দানবের স্পর্দ্ধিত তাণ্ডবে যখন দেবতার বিজয়-কিরীট ধূলায় ধূসর হয়, তখন প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে আত্মবিস্মৃত, ভোগসুখরত পশুপ্রকৃতি নহে, নিবৃত্তি-সুন্দর, তপস্যার অগ্নিদাহনে শুচিশুদ্ধ, সংযত-গম্ভীর, প্রশান্ত-নির্ম্মল, কল্যাণ-সঙ্কল্প দাম্পত্য প্রেমই প্রয়োজন। নতুবা দানব-দলন কার্ত্তিকেয়ের জন্মলাভ হয় না। দেশের এই পরম-দুর্ভাগ্যের দিনে দিকে দিকে উদ্ভব হইতেছে শুধু কালাপাড়ের, শুধু বৃত্রাসুরের। তোমাদেরই ঔরসে-গর্ভে জন্মিয়া, তোমাদেরই অন্নে ও স্তন্যে পুষ্ট হইয়া তোমাদেরই গোত্র-গোষ্ঠির উত্তরাধিকার লইয়া তোমাদের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনে রত দৈত্যকুলের প্রাচুর্য্য বাড়িতেছে। তাই আজ একদিকে যেমন সন্ন্যাসী দধীচি অস্থি-দান করিবেন, অপর দিকে তেমনি শিব-পার্ব্বতীর যুগ-যুগ-ব্যাপী তপস্যার মধ্য দিয়া কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব হইবে। তোমাদের আত্মগঠন ইহা সম্ভব করুক।"

কাম কিরূপে প্রেম হয়

গয়া কাচারি-রোড-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শ্রেষ্ঠতর অভিপ্রায়ের চরণে ব্যক্তিগত ছোট-বড় সকল অভিপ্রায়ের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই কাম প্রেম হয়, আত্মসুখ জীবসেবায় পরিণত হয়।"

আদর্শ বিবাহিত জীবন

নদীয়া-মেহেরপুর নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকেই প্রকৃত জগৎকল্যাণ-কামনা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটী কার্য্য জগৎকল্যাণ কামনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে কি না, সেই হিসাবটী রাখিতে হইবে। এমন কি তোমার দাম্পত্য জীবনের যে অংশটুকু মানব-চক্ষুর অন্তরালে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাতেও জগৎকল্যাণেরই প্রেরণা সর্ব্ববিজয়িনী কি না, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। আসঙ্গলিপ্সারও সকল আয়তন জুড়িয়া

যে ইচ্ছাটী প্রবল রহিয়াছে, তাহাকেই তোমার জীবনে জয়িনী বলিয়া স্বীকার করিব। সেই জীবনকেই আদর্শ বিবাহিত জীবন বলিয়া মানিব, যাহার গোপনতম কোণটীতেও আঁধারে-মাণিকের মত জগৎ-কল্যাণ-কামনাই জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।”

বিবাহের প্রীতি-উপহার

ত্রিপুরা জেলার কোনও গ্রাম-নিবাসী জনৈক ভক্তের এক পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“বিবাহের প্রীতি-উপহার ছাপান এবং অভ্যাগতদের মধ্যে তাহা বিতরণ একটা অর্থহীন প্রথামাত্র। ইহার ভিতরে একটা বাহাদুরী দেখান ছাড়া প্রায়শঃই আর কোনও উদ্দেশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অধিকাংশ রচনার ভিতরেই কোনও মঙ্গল-বাণী নাই এবং সাধারণতঃ অতি তরল ও অদৈব ভাবেরই ইহাতে ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। এমতাবস্থায় এই প্রথাটার সহিত হয় তোমাদের সকল সংশ্রব বর্জ্জন করা উচিত, নতুবা প্রীতি-উপহারের ভাব ও ভাষাকে উন্নত আদর্শের অধীন করিয়া তবে গ্রহণ করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বিবাহ-ব্যাপারটাকেও সেই উন্নত আদর্শবাদের ভিত্তিতে দাঁড় করান আবশ্যক, বিবাহ-সম্পর্কিত প্রত্যেকটী স্ত্রী-আচারকে পর্য্যন্ত এতল্লক্ষ্যে পরিশোধিত করা প্রয়োজন।

“যাহা হউক, শ্রীমান স—র বিবাহে তোমরা যখন একটা প্রীতিউপহার দিবেই বলিয়া স্থির করিয়াছ, তখন উহার আদর্শ কিরূপ হওয়া সঙ্গত, তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে আমার নিজের রচিত একটী কবিতা প্রেরণ করিতেছি। বাংলা ১৩৩২ সালে শ্রীমান্ মো—র একান্ত আগ্রহে ইহা আমাকে রচনা করিতে হইয়াছিল।

“বন্ধো, আজিকে সবার আশীষ পড়ুক তোমার মাথে,
জীবনের চির-সঙ্গিনী আজি মিলিবে তোমার সাথে।
ভরা ভাদ্রের বরষা ধারায়
আত্মা যে আজ আত্মারে চায়,

দ্বৈত-ব্রহ্ম একীভূত হবে আজি মধুময়ী রাতে,
নিত্য-পুরুষ ধরিবে আজিকে চির-প্রকৃতির হাতে।

"এই যে বাজিছে শানাই, শঙ্খ,—এই যে আলোর মেলা,
জানো কি বন্ধো, কি এর অর্থ ? একি শুধু ছেলেখেলা ?
পশুর মতন জীবন যাপন,—
একি ভাই শুধু তারি আয়োজন ?
একি ভাই শুধু বিলাসে ব্যসনে কাটানো জীবন-বেলা ?
পত্নী কি শুধু ভোগেরি বস্তু, শুধু মাংসের ঢেলা ?

"মহাশিব আজি মহাকালী সনে মিলিবে সৃষ্টি-হেতু—
'বিবাহ' তাহার পুণ্যায়োজন, বিবাহ প্রেমের সেতু।
এ নহে ভোগীর অন্ধ-লালসা,
এ নহে কামের অদমিত কষা,
সংযম এ'র সুরভি-স্নিগ্ধ চির-কল্যাণ-কেতু ;
সাধনা ইহার মঙ্গল-মধু, চির-আনন্দ-হেতু।

"জানিও বন্ধো, ব্রহ্ম-পুরুষ রয়েছে তোমার মাঝে,
ব্রহ্ম-প্রকৃতি চাহিছে মিলন সহধর্ম্মিণী-সাজে।
তোমা উভয়ের পুণ্য সাধনা
যুগল-জীবনে ব্রহ্মারাধনা ;
হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া লহ আজি এ পুণ্য সাঁঝে,
সাধনা-শুদ্ধ জীবনে তোমার অমৃতই যেন রাজে।"

এই সময়ে বুলক ব্রাদার্সের বড়বাবু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে যাইবার জন্য গাড়ী আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা লেখনী পরিত্যাগ করিয়া অশ্বশকটে আরোহণ করিলেন।

ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় আসিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হইল।

তীর্থ-পর্য্যটন ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মবাদ

পণ্ডিতসার নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘোষাল মহাশয়ের বাসার থাকেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে বিরাজিত, প্রতি পরমাণুতে উপস্থিত, দেশকালাদির অতীত, এই অনুভূতি যাঁর আছে, তীর্থ পর্য্যটন তাঁর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজেতেই নিজে তৃপ্ত, আত্মারাম মহাপুরুষ। কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বে যার প্রত্যক্ষ অনুভূতি নেই অথচ তীব্র বিশ্বাস আছে, তার পক্ষে তীর্থ-পর্য্যটনাদির দ্বারা সাধনে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তীর্থবাসী সাধুসন্তদের দর্শন-স্পর্শনের দারা, ভগবদ্‌ভক্তি বাড়ে এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। এজন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাসীর পক্ষেও তীর্থ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রত্যেক মহাপুরুষকেই সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে হইয়াছে

ঘোষাল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের প্রত্যেক মহাপুরুষকেই প্রচণ্ড সংগ্রাম ক'রে বড় হ'তে হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে কামের সঙ্গে আচ্ছা লড়াই দিতে হয়েছে। বিবেকানন্দ একদিন কামের যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে আত্মদমনের মানসে আগুনের হাঁড়িতে গিয়ে ব'সে পড়্‌লেন, তাঁর নিতম্বদেশ পুড়ে ছ্যাচড়াপোড়া গন্ধ বেরুতে লাগ্‌ল, তবে তিনি উঠ্‌লেন। কাঠিয়া-বাবা কঠোরতা অভ্যাসের জন্য কোমরে কাঠের মালা প'রে থাক্‌তেন, যেন নিদ্রাবস্থাতেও পাপচিন্তা না আস্‌তে পারে, বিলাস-লালসা না জাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংস মায়ের মন্দিরে মাথা খুঁড়ে রক্ত বে'র ক'রে ফেল্‌লেন যেন আর কখনো মনে পাপ-বাসনা না আসে। সিদ্ধিলাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের পিছনে পিছনে "মার" ঘু'রে বেড়িয়েছে। যীশুকে বার বার বল্‌তে হয়েছে,—"Satan, get Thee behind, সয়তান তুই দূর হ।" মোট কথা, লড়াই ছাড়া কেউ কখনো বড় হ'তে পারে নি, বড় হ'তে পারে

না। এই সব দৃষ্টান্ত দেখে প্রত্যেক সাধকের নবীন উৎসাহ সঞ্চয় করা উচিত, হাত-পা ছেড়ে না দিয়ে নববলে আগুয়ান্ হওয়া উচিত।

দীক্ষাই নবজন্ম লাভ

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তত্ত্বদর্শী যোগী পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ আর পুনর্জ্জন্মলাভ একই কথা। যোগী পুরুষের চরণাশ্রয় গ্রহণ মাত্র শিষ্য নূতন মানুষে পরিণত হয়। ভিতরটা যার শুদ্ধ, চিত্ত যার অমলিন, প্রশান্ত, সে শিষ্য দীক্ষামাত্র এ পরিবর্ত্তনটাকে অনুভব করে, সদ্গুরু-কৃপাজনিত আধ্যাত্মিক স্ফুরণের উপলব্ধি তাকে বিস্মিত, চমকিত ও উদ্দীপিত করে। উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধির যেখানে অভাব, সেখানে দীক্ষা ধীরে ধীরে অজ্ঞাত-সারে চিত্তের পরিশোধন করে এবং পরিবর্ত্তন আনে। শিষ্যের একাগ্র সাধন গুরুর যোগশক্তিকে শিষ্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত করিবার সাহায্য করে।

নিষ্ঠার লক্ষণ

পণ্ডিত মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—'নিষ্ঠা' মানে নিজের সাধনে প্রাণপণে লেগে থাকা, বাধা না মেনে, বিঘ্নকে গ্রাহ্য না ক'রে, নিন্দায় নিষ্প্রভ না হ'য়ে, প্রশংসায় শিথিল না হ'য়ে, ঝড়ঝঞ্ঝায় উপেক্ষা ক'রে, একাগ্র মনে, একতান চিত্তে নিজের সাধন নিজে ক'রে যাওয়া। অন্য মতের নিন্দায়, অন্য পথের সমালোচনায় বা ভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অসম্ভ্রমসূচক বাক্যবাণ বর্ষণ করায় নিষ্ঠার কোনো পরিচয় নেই, তাতে চিত্তের বিক্ষিপ্ততারই পরিচয় পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান্ পুরুষ নিজের কাজ নিয়ে নিজে মগ্ন থাকেন, পরের চর্চ্চায় তাঁর অবসর কম।

অপরের আচরণের প্রতি অন্ধ হও

ঘোষাল মহাশয়ের বাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীবাবা স্তূপীকৃত পত্রাদির উত্তর দিতে বসিলেন।

ত্রিপুরা জেলা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভোগাসক্তির দুর্গন্ধময় সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ ব্রত ভুলিও না, নাম ভুলিও না। নাম তোমাকে তোমার উপযুক্ত বল, বীর্য্য, সাহস, উৎসাহ

ও চেতনা প্রদান করিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়, তবে তাতে তোমার কি ?' জগতের প্রত্যেকটী প্রাণী যদি ভোগলালসায় দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হয়, তাতে তোমার কি ? সুখ-লালসার তীব্র তাড়নে হিতাহিতবুদ্ধি হারাইয়া সকলেই যদি ইতর সুখের চর্চ্চায় গা ভাসাইয়া দেয়, তাতে তোমার কি ? ইন্দ্রিয়-সুখের পঙ্কসেবায় যাহাদের আনন্দ, শূকর-শূকরীর ন্যায় তাহারা বিষ্ঠার কুণ্ডে গড়াগড়ি যাক্, তুমি সেই দিকে ভ্রূক্ষেপও করিও না। তুমি তোমার প্রাণ-দেবতার ধ্যান জমাও, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জীবনারাধ্যের পূজা কর, অনুরাগের চন্দন দিয়া তাঁর শ্রীপাদপদ্ম চর্চ্চিত কর, প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁর কল্যাণময়ী মূরতির আরতি কর, ওঙ্কারশ্রাবী শঙ্খনিনাদে গগন পবন মুখরিত করিয়া তাঁর মহিমা প্রচার কর, বাহিরের সহস্র উদ্ধত কোলাহলের সমুন্নত শির ডুবাইয়া দিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁর মঙ্গলময় মহানাম গান কর। কে ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে, কে পাপানুষ্ঠান করিয়া কদর্য্যতায় সর্ব্বাঙ্গ পূতিগন্ধাচ্ছাদিত করিতেছে, কে অসার-বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগের জঘন্যতম অপব্যবহার করিতেছে, তার পানে একবারও তাকাইয়া দেখিও না। তাহাদের প্রতি অন্ধ হও, তাহাদের লালসা-তুর বচনাবলির প্রতি বধির হও, তাহাদের সংসর্গ সম্পর্কে স্পর্শশক্তিরহিত হও, তাহাদের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য কর। মনে জান, ইহারা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, ইহারা বিকার-রোগীর অর্থহীন প্রলাপ মাত্র, ইহারা অলীক কল্পনা মাত্র। মনের মন্দির হইতে ইহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর। জান,—জগতে থাকিবার মধ্যে তুমি আছ আর তোমার প্রভু আছেন। জান, জগতে পাইবার বস্তু একমাত্র তিনি, দেখিবার দৃশ্য একমাত্র তিনি, বুকে ধরিয়া প্রাণ জুড়াইবার প্রাণাধিক আপনার জন একমাত্র তিনি। তাঁর চিন্তাকে চিরসহচর কর, তাঁর চিন্তার ক্ষুদ্র বিন্দুকে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও অভ্যাসযোগের বলে পারাপারহীন বিশাল সিন্ধুতে পরিণত করিয়া সেই সিন্ধুতে ডুব দাও, ডুব দিয়া মর, মরিয়া আত্ম-বিস্মৃত হও, অহংহীন হও, অভিমান-বর্জ্জিত হও, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া পাইবার বস্তুকে চিরতরে পাও, দেখিবার বস্তুকে অনন্তকাল নয়ন ভরিয়া দেখ,

জানিবার বস্তুকে সম্যক্ জান। কারণ, আত্মসমর্পণ ও আত্মবিসর্জ্জনই আত্মাকে তার পরম পূর্ণতায় প্রাপ্ত হইবার পন্থা।"

শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শিষ্য-সংখ্যা ত' বাবা বন্যার জলের শফরী-মৎস্যের মত অফুরন্তভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু সাধকের সংখ্যা বাড়িতেছে কি? দীক্ষা নিয়া যদি তোমরা সাধন না কর, তবে দীক্ষা দিয়া কি লাভ? তোমরা দল-বৃদ্ধির মোহে পড়িয়া আমাকে প্রচার করিয়া বেড়াইও না, দলবৃদ্ধি কখনো আমার কাম্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না। শিষ্যের সংখ্যা লক্ষের ঘর পূরণ করিলে বৈঠকে বসিয়া বলিবার মত একটা কথা হয় বটে, কিন্তু কল্যাণের ভাণ্ডারে এক কণা বস্তুও সঞ্চিত হয় না। লক্ষ বা কোটি অসাধক শিষ্য নহে, একটী বা দুইটী সাধক শিষ্যই আমার কাম্য। দল বাড়াইবার কুবুদ্ধি তোমরা এই মূহূর্ত্তে পরিহার কর, নিজেরা প্রত্যেকে সাধনার এক একটা জীবন্ত বিগ্রহ হইতে চেষ্টা কর, তোমাদের দেহে মনে তপস্যার তীব্র তেজ সঞ্চারিত হউক, সংবর্দ্ধিত হউক। তোমাদের জীবনের জ্বলন্ত ত্যাগ যখন মানুষকে আকৃষ্ট করিবে, সত্যিকার মানুষেরা তখনি তোমাদের সহিত মিলিত হইবেন,—বিজ্ঞাপনের প্ররোচনায় নয়, প্রচারকর্ম্মের ঢক্কানিনাদে আকৃষ্ট হইয়া নয়, প্রাণের অলঙ্ঘনীয় আধ্যাত্মিক আকর্ষণে। শিষ্য আমি চাহি না, সাধক চাহি, তপস্বী চাহি, একাগ্র, উদগ্র, নিষ্ঠাবান নামের সেবক চাহি। যাহা চাহি, তাহা দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই তোমাদের জন্য যুগান্ত ধরিয়া যে শ্রমস্বীকার করিয়া আসিতেছি, তাহা সার্থক হইবে, সফল হইবে। যাহা চাহি না, তাহা দিবার চেষ্টা করিও না।"

পুরুষ-সাধকের স্ত্রীভাবে সাধন এবং তদ্বিপরীত

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সাধকের ভিতরে রমণলিপ্সা অত্যন্ত তীব্রভাবে জাগ্রত হইলে এমন একটা অবস্থা আসে, যেই সময়ে পুরুষ-সাধক নিজেকে স্ত্রীলোক বলিয়া কল্পনা করিলে

এবং স্ত্রী-সাধক নিজেকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলে সহজে রমণ-লিপ্সা দূর হয়। নিজেকে স্ত্রীলোক বা পুরুষ বলিয়া কল্পনার কালে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া একটা বিশ্বাস মনোমধ্যে রোপণ করিতে হয়। ইহার ফলে পুরুষ-সাধকের আর স্ত্রী-দেহের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা অনুভূত হয় না, স্ত্রী-সাধকের পুরুষদেহের প্রতি প্রবল লিপ্সা থাকে না। নিজেকে সন্তানবতী জননী বলিয়া চিন্তা করতঃ শিশুরূপে কোনও প্রিয়জনকে স্তন্যপান করাইতেছে, এইরূপ কল্পনা করিলে, পুরুষের রমণ-লিপ্সা আরও দ্রুততর দূরীভূত হয়। নিজেকে জগজ্জননী বলিয়া ভাবিয়া যোনিপথে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকা প্রভৃতি প্রসব করিতেছে, এইরূপ কল্পনার দ্বারা কামান্ধ রমণীরত বহু পুরুষ প্রবল রমণ-লিপ্সা হইতে রক্ষা পাইয়াছে।"

স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক সম্ভোগাসক্তি নিবারণের চরম উপায়

অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক সম্ভোগাসক্তি নিবারণের চরম উপায় তাঁর যোনি-প্রদেশের ধ্যান করতঃ তন্মধ্যে ওঙ্কাররূপী সদ্‌গুরুর জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহের চৈতন্য-ময়ী স্থিতির অনুচিন্তন। অপর সকল উপায় যেখানে ব্যর্থ, একমাত্র সেইখানেই এই উপায় অবলম্বনীয়, অন্যত্র নহে। কারণ, যোনি-চিন্তনের প্রারম্ভ সময়ে মন তার চিরপোষিত সংস্কারের আবেগে দূষিত ও আবিল হইয়া যাইতে চাহিবেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই আবিলতা ওঙ্কাররূপী সদ্‌গুরুর চিন্তনপ্রভাবে অপসারিত না হইতেছে, ততক্ষণ তুমি কলির জীব, ততক্ষণ তুমি যোনির কীট। যখনি সদ্‌গুরুর অবস্থিতির প্রত্যক্ষ অনুভূতি অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনি এই যোনিচিন্তন জগজ্জননী দেবী-কামাখ্যার পূজায় পরিণত হইল। যোনি-পীঠে যে অর্চ্চনার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিতে পারে, সে আর রক্ত-মাংসের মানুষ থাকে না, নিমেষে সে ত্রিগুণাতীত সেই উমানন্দ-ভৈরবে পরিণত হয়, পুরুষ হইয়াও যিনি পুরুষকারহীন, কামরূপ হইয়াও যিনি কামনাহীন।

নারীর দেহেই একান্ন দেবী-পীঠ

"এই যে নারী নিয়ত তোমার মনকে ভোগের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে,

ভ্রূযুগের ভঙ্গিমায়, কটাক্ষের নীলিমায়, বিম্বোষ্ঠের রক্তিমায়, মুখের লাবণ্যে, দশনপংক্তির মুক্তাবিনিন্দিত শুভ্রতায় তোমার চিত্ত উচাটন করিতেছে, দেহের সৌষ্ঠবে, স্তনের পীনতায়, বাহুর সুবলিততায়, নিতম্বের পীবরতায় তোমাকে কামোন্মাদ-গ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে, ইহার প্রতি অঙ্গে এক একটী তীর্থ বিরাজমান, ইহার প্রতি অঙ্গে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি এক একটী পীঠদেবীর মূর্ত্তিতে বিদ্যমানা। শতবার তোমার চক্ষু এই নারীর প্রতি অঙ্গ দর্শন করিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি কিন্তু তীর্থ-দর্শনই করিতেছ। সহস্রবার তোমার মন এই রমণীর প্রতি অঙ্গে বিচরণ করিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি কিন্তু তীর্থপর্য্যটনই করিতেছ। কিন্তু তুমি জান না, তুমি কি করিতেছ, তাই তুমি কামের ক্রীতদাস, কামের ক্রীড়ণক, কামের কৃমিকীট। যেই মুহূর্ত্তে জানিবে, কোন্ অঙ্গে কোন্ পীঠ, কোন্ অঙ্গে কোন্ দেবতা, সেই মূহূর্ত্তে শতবার সহস্রবার লক্ষ বার কোটিবার নারীদেহ দর্শন করিয়াও তুমি তীর্থদর্শী কামজিৎ মহাপুরুষ, অসংখ্যবার নারীদেহ চিন্তন করিয়াও পুণ্য-তীর্থ-জলাবগাহী সিদ্ধাত্মা যতি। যেই গণ্ডস্থলে কামোন্মত্ত হইয়া শতবার চুম্বন করিয়াও তৃপ্তি মিটে না, চাহিয়া দেখ, উহাই 'গোদাবরী'-তট, সুখে বা দুঃখে; আনন্দে, বা বিষাদে, প্রেমে বা বিরহে ঐখান বাহিয়াই নয়নাসারের গোদাবরী-ধারা কুলুকুলু নিনাদে দুকুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়, উহাই পীঠদেবী 'বিশ্বেশী'র অধিষ্ঠানভূমি,—ঐ গণ্ডদেশের যৌবন-সুষমা-শোভিত মনোজ্ঞ রক্তিম আভা যখন দর্শন কর, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শন কর জগন্মাতা 'দেবেশীর'ই সর্ব্বকামনাপূরিকা সর্ব্বকামবিদূরিকা পবিত্র মুখমণ্ডলের জ্যোৎস্নাময়ী আভা। ঐ যে কোমল-কমল-সম প্রাণ-মনোহারী চপল নয়ন, যাহার সৌন্দর্য্য তোমার চিত্ত-সমুদ্রে বাসনার উত্তাল ঊর্ম্মিমালা সৃষ্টি করে, চাহিয়া দেখ, উহা শুধু একটা ক্ষণভঙ্গুর রমণী-নয়নই নহে, ইহাই মহাতীর্থ করবীরপুর, ইহাই শর্করার-পীঠ, ইহাই পীঠদেবী 'মহিষমর্দ্দিনীর' অধিষ্ঠান-ভূমি,—এই নয়ন যখন তোমাকে মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে, তখন জানিও, সে আকর্ষণ আসিতেছে জগন্মাতার সিদ্ধপীঠাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর নয়ন-জ্যোতি হইতে। এইভাবে রমণীমাত্রেরই প্রতি অঙ্গে

এক একটী করিয়া পীঠস্থান অবস্থিত বলিয়া জানিতে চেষ্টা কর, প্রতি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে মাতৃত্বশক্তিশালিনী জানিয়া সম্ভ্রমভরে প্রণাম কর, ওঙ্কার-রূপী মন্ত্ররাজকে ভৈরবহুঙ্কারে উচ্চারণ করিয়া পীঠদেবীর অর্চ্চনা কর, পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তপস্যার বলে ওঙ্কার-বিগ্রহে রূপবতী করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন কর, নয়ন সার্থক কর। শাস্ত্রে তীর্থ-দর্শনের প্রশংসা আছে, তীর্থভ্রমণের ফলশ্রুতি সালঙ্কারে বর্ণিত আছে, বিদেশী রেল কোম্পানীকে পারের কড়ি গণিয়া দিয়া সেই তীর্থ তোমাকে দেখিতে হইবে না, যে একান্ন পীঠ তোমাকে সন্দর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্রকারের এত আগ্রহ, সেই তীর্থ তোমার গৃহস্থিতা ঐ পতি-পরায়ণা রমণীর দেহে বিরাজমান। একান্ন তীর্থ একটা কথার কথা, ঐ রমণীর সমগ্র দেহের প্রত্যেকটা রোমকূপে এক একটা তীর্থ বিরাজিত। যোগদৃষ্টি উন্মেষিত করিয়া সেই তীর্থ দর্শন কর, অভ্যাসের শক্তিতে ওঙ্কাররূপী সদ্‌গুরুর অবস্থিতি সেখানে অনুভব কর, প্রণবের গভীর আরাবে তীর্থদেবতার বন্দনা কর, কামজিৎ হও, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী হও, জীবন্মুক্ত হও। নারীর সর্ব্ব-দেহে সদ্‌গুরু দর্শনের এই প্রয়াসই জানিও সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা।”

দারিদ্র্য ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি-বিশেষ

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ভুলিয়া যাইও না, বাবা, দারিদ্র্য আজ তোমার প্রতি বিধাতারই দান এবং দারিদ্র্যের রুক্ষ-কঠোর মূর্ত্তি ধরিয়া তিনিই আজ তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছেন। হুতাশ বা অধীর না হইয়া সহস্র দুঃখের মধ্যেও পরমকৃপাল পরমপ্রভুর শরণাপন্ন হও। উপবাসী উদরেও তাঁকেই প্রাণের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁর আশ্রিতকে যদি তিনি অনশনে রাখিয়াই সুখ পান, তাতেই তুমি নিজ সুখ স্বীকার কর।”

নামের স্বরূপ

কালই শ্রীশ্রীবাবা প্রাতে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন। এজন্য জনৈক আশ্রমবাসিনী শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে উপদেশ শ্রবণের জন্য বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামকে শুধু একটা শব্দমাত্র মনে ক’রো না, মনে

করবে তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় মহাবস্তু ব'লে। নাম হচ্ছেন শ্রীভগবানের শব্দময় দেহ। নামকে ভগবানেরই শব্দময়ী প্রতিমা মনে ক'রে তাঁর সেবা কর। নাম ত ভগবানের? ভগবানই নামের প্রকৃত অর্থ। "নামের অর্থ স্মরণ" বল্‌তে বুঝবে "ভগবানকে স্মরণ।"

নামজপ করার মানে ; নামজপ ও ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামজপ করার মানে কি? নামের প্রাণ-স্বরূপ শ্রীভগবানে মনকে যুক্ত করাই নামজপের উদ্দেশ্য। নামজপ আর ধ্যান একই কথা। এক একবার জপের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার ক'রে ঈশ্বর-মনন হচ্ছে। জপের পূর্ণাভিনিবিষ্ট অবস্থায় এই মনন অবিচ্ছেদ। তাকেই বলা হয় ধ্যান। জপ যেন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, ধ্যান যেন মূষলধারে বৃষ্টি। জিনিষ একই, তফাৎ শুধু গভীরতায়।

নামের ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রূপের ধ্যান কত্তে চাও? বেশ ত! আমি কি সাকার উপাসনার নিন্দা কখনো করেছি। আমাকে ধ্যান করার প্রয়োজন কি? নামেরও ত' রূপ আছে! নামের একটা মূর্ত্তি শব্দময়ী,—আর একটা মূর্ত্তি তার রূপময়ী। শব্দময়ী মূর্ত্তির ধ্যান হয় নামের ধ্বনিতে প্রাণমন সংযোগ ক'রে, আর, রূপময়ী মূর্ত্তির ধ্যান হয় নামের অক্ষরটীর চিন্তা ক'রে। শাব্দিক ধ্যান তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, রৌপিক ধ্যানেও গতি সেই এক।

নামই সব

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনো দিকে দৃক্‌পাত ক'রো না। নামই সব। যে নাম পেয়েছ, বিশ্বাস কর, সে নাম প্রাণহীন শবের অচেতন কঙ্কাল নয়, এ নাম পরমাত্মার চৈতন্যময় দেহ, এ নাম সর্ব্বশক্তির আকর, এ নাম প্রাণবান্ এবং প্রত্যক্ষ-মঙ্গল-প্রদ। বিশ্বাস কর, এর শক্তি অব্যর্থ, প্রভাব অমোঘ, বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে, জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে প্রাণপণে নাম ক'রে যাও, নামকে ভালবাস্‌তে শিখ, নামের রসে ডুবে যাও, নামকে প্রাণের প্রাণ ব'লে গ্রহণ কর। অটুট আস্থার সাথে নামজপ কর,

ভিতরে আপনি চিত্তশুদ্ধির বিকাশ হবে, মনের ময়লা কেটে যাবে, দর্পণের ন্যায় মন স্বচ্ছ হবে। নাম তোমার অন্তরের দুর্ব্বলতাকে লোপ করবে, পাপ-প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর কর্ব্বে, লালসার জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন কর্ব্বে, দুরাশার মরীচিকা দূর কর্ব্বে। নাম তোমার সৎপ্রবৃত্তিকে উৎফুল্ল কর্ব্বে, সংযমকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, বৈরাগ্যকে উজ্জ্বল কর্ব্বে, সদ্‌গুরুর সাথে শিষ্যের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে।

২১ শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিচার, সাধন ও ভক্তি

কয়েকজন ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাকে চট্টগ্রাম ষ্টেশনে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। ট্রেণ ছাড়িতে এখনো দেরী আছে।

গাড়ীতে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—প্রবল বিচার-শক্তি চাই এবং এ শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা চাই। তুমি আর তোমার প্রবৃত্তি যে এক নয়, তোমার প্রবৃত্তির প্রভুত্বের বৃদ্ধি যে তোমার নিজ প্রভুত্বের সঙ্কোচ, এই বিষয়টা বিচার দিয়ে স্পষ্ট বুঝা চাই। তবে ত' প্রবৃত্তিকে শাসনের নিগড়ে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা হবে! এখানেই জ্ঞানমার্গের জয়। কিন্তু তার পরে চাই সাধন। বিচারের দ্বারা প্রবৃত্তির অসারতা বুঝ্‌তে পাচ্ছ, কিন্তু চির-কালের সংস্কার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়ে নিচ্ছে। এই সংস্কারকে মুছে ফেলার জন্য চাই সুতীব্র সাধনা, উদগ্র তপস্যা, একাগ্র উদ্যম। এইখানে কর্ম্মমার্গের জয়। কিন্তু এক সময়ে সাধনে ঢিল প'ড়ে যেতে পারে। কারণ, চেষ্টাটা কৃত্রিম, ইচ্ছাকৃত, যত্নসাপেক্ষ,—স্বাভাবিক নয়। সাধন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে নিত্য বস্তুতে পরিণত না হচ্ছে, সাধন করা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার স্বভাবের অঙ্গীভূত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনর্মূষিক হবার ভয় দূর হচ্ছে কৈ? তোমার সাধনকে এমন একটা সুমধুর, সুস্বাদু, সুখসেব্য অনুরাগের স্রোতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিতে হবে, যে স্রোত কোনো দিন থামে না, কোনো দিন নিজ মাধুর্য্যকে, নিজ বৈচিত্র্যকে, নিজ সৌষ্ঠবকে হারায় না। এইখানেই ভক্তিমার্গের জয়। তপস্বীর জীবন পূর্ণতা

লাভের জীবন, এই জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি একত্র মিশেছে সেই বিরাটের আকর্ষণে, ভূমার স্পন্দনে। এখানে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির দ্বন্দ্ব ত' আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারি না। যেখানে এ দ্বন্দ্ব প্রকাশমান, সেখানে তপস্যার পঞ্চমী বা একাদশী, পূর্ণিমা নয়।

বিচারমার্গ ও কর্ম্মমার্গে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিচার হচ্ছে, Judicial Department, ডিক্রি সে দিতে পারে,—execution পুলিশের হাতে। বিচার যখন ব'লে দিল,—"এই তোমার aim", অম্‌নি এল লম্বা লম্বা লাঠিওয়ালা লালপাগড়ীর দল,—সাধনমার্গ। তখন শুধু রব,—"সাধন কর, সাধন কর,"—"go forward, march onward." বিচারই কর আর বিতর্কই কর, যতক্ষণ অনবদ্য-রস-স্বরূপ শ্রীভগবানকে না পাচ্ছ, ততক্ষণ আর জীবনের সুনিয়ন্ত্রণ নেই, শুধু falls and pitfalls.

এই সময়ে ট্রেণ ছাড়িল, ভক্তগণ প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

দীক্ষা না INJECTION (সূচীবেধ)?

পরের ষ্টেশনই পাহাড়তলী। এখানে গাড়ী দুই তিন মিনিট থামে, কয়েকটী সাধন-প্রার্থী যুবক ষ্টেশনে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ বন্দনা করিতেই শ্রীশ্রীবাবা প্লাটফর্ম্মে নামিলেন। বলিলেন,—জুতো ছেড়ে দাঁড়া। চোখ বোজ্।

যুবকগণ আদেশ পালন করিতেই শ্রীশ্রীবাবা তাহাদের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে 'অখণ্ড মহামন্ত্র' প্রদান করিলেন।

এদিকে গাড়ী ছাড়িতেছে। গাড়ীর হাতল ধরিয়া উঠিতে উঠিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এটা দীক্ষা নয় রে বেটা এটা হচ্ছে injection. গুরুর যা কিছু সম্পদ, একটী নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ ক'রে অলক্ষ্যে তার কাজ করে। এইজন্যই এতে গুরুর পাদ্য-অর্ঘ্য নেই, গুরুবরণের বস্ত্র নেই, উত্তরীয় নেই, গুরুদক্ষিণার স্বর্ণ বা রজতখণ্ড নেই।

সংযম-সাধনার পরম পন্থা

ট্রেণ ছাড়িল, দেখিতে দেখিতে পাহাড়তলী ষ্টেশন অদৃশ্য হইল। তখন শ্রীশ্রীবাবা সুটকেস হইতে পুঞ্জীভূত চিঠিপত্র বাহির করিয়া তার জবাব দিতে বসিলেন। ট্রেণে বসিয়া চিঠি লেখা অসুবিধাজনক হইলেও কাজের চাপ বশতঃ সর্ব্বদা শ্রীশ্রীবাবাকে এইরূপ অসুবিধার মধ্যেই চিঠিপত্র লিখিতে হয়। জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবচ্চরণে আত্ম-নিবেদনই সংযম-সাধনার পরম পন্থা। নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া জান, সব অসংযম দূরে পলাইবে। শরীরের ভালমন্দের চিন্তা বর্জ্জন করিয়া সমগ্র মনন-শক্তি শ্রীভগবানে অর্পণ কর। ভগবচ্চিন্তার গভীরতাই ব্রহ্মচর্য্যের গভীরতা সম্পাদন করিবে। ভগবৎ-প্রেম কামুকতার সমূল উচ্ছেদ সাধন করে। 'অসম্ভব' বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। গৃহে বসিয়াই তোমাকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জনের সাধনা করিতে হইবে। যাহাকে দেখিলে মন কাম-জর্জ্জর হয়, তাহার মধ্যে মাতৃচিন্তা আরম্ভ কর। যাহার ঘনিষ্ঠতা চিত্তকে লালসা-বিহ্বল করে, তাহার মধ্যে ইষ্টধ্যান জমাও। অভ্যাসই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জনয়িতা। অভ্যাস-বলে পূর্ব্ব-সংস্কারকে পদানত কর।"

নামে নিবিষ্ট মনই শ্রীবৃন্দাবন

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নামে নিবিষ্ট মনই শ্রীবৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে আজও শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী বাজিতেছে। যার কাণ আছে, সে শুনিতে পায়। ষোড়শ সহস্র গোপী এই বৃন্দাবনেই প্রাণের গোপনতম বাসনারাশির পুষ্পাঞ্জলি আজও কেলি-কদম্ব-মূলে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে দণ্ডায়মান রসরাজ প্রাণ-বল্লভের পায়ে ঢালিতেছে। আজও যমুনার জল তেমনি উজান বহিতেছে, গাগরী ভরিয়া জল আনিতে গিয়া আজও কুলবালা বাঁশীর রবে চেতনা হারাইয়া লাজ-কুল-শীল-মান বংশীবদনের প্রসারিত বাহুর প্রেমালিঙ্গনে অবহেলে বিসর্জ্জন দিতেছে। নামে নিবিষ্ট হও, সেই নিত্যলীলা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।"

সর্ব্ব-ত্যাগই অমৃতত্ব-লাভের পন্থা

অপর এক পত্রে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ত্যাগই তোমাদের পথ, শুধু তনুত্যাগই নহে, যশ পর্য্যন্ত ত্যাগ। কারণ, ত্যাগই অমৃতত্ব, ত্যাগই পরমমোক্ষ, ত্যাগই জীবন্মুক্তি। যশোলোভহীন যশস্বী জীবন যাপন কর, এই আশীষ জানিও।"

স্ত্রীসঙ্গম ও সুপ্তিস্খলন

অপর এক পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্ত্রীসঙ্গম করিলে স্বপ্নদোষ কিছু কমে, একথা সত্য কিন্তু বীর্য্যক্ষয় ত' হয়ই! স্বপ্নদোষে যে বস্তু যায়, তার মধ্যে বীর্য্যভাগ কম ও রসভাগ বেশী থাকে, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তুর ক্ষয় প্রকৃত প্রস্তাবে কম হয়। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গমে যাহা যায়, তাহাতে বীর্য্যের পরিমাণ অধিক। আরও একটা দিক্ দেখিবার আছে। স্বপ্নদোষ স্বেচ্ছায় হয় না, নিজের ইচ্ছার অজ্ঞাতসারে সুপ্তিস্খলন ঘটিয়া থাকে। জগতের সব চেয়ে জঘন্য কামুকও কখনো স্বপ্ন-যোগে বীর্য্যক্ষয় কামনা করে না। অতএব এই ব্যাপারে তোমার নৈতিক দায়িত্ব অল্প। কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গম-জনিত বীর্য্যক্ষয় স্বেচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। এই বীর্য্যক্ষয়ে তোমার নৈতিক দায়িত্ব ষোল আনা। স্বপ্নযোগে বীর্য্যক্ষয় যত বারই তোমার ঘটুক না কেন, তাহা তোমার দৈহিক সঙ্গমের অভ্যাসকে বর্দ্ধিত করিতে পারে না কিন্তু স্ত্রীসঙ্গম একবার করিয়া পুনরায় তাহা করিতে গেলে দেহকে একটা নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসের দাসত্বাধীন হইতে হয়। ফলে, এমন অবস্থার উদ্ভব কখনো কখনো হইয়া থাকে যে, স্ত্রীসঙ্গম একটা প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া যায় এবং প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারাও এই কদভ্যাসকে দমিত করা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গমের দ্বারা স্বপ্নদোষ রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করিতে যাওয়া নিতান্ত নিরাপদ নহে। সর্ব্বশেষে বিবেচ্য এই কথা যে, যেস্থলে স্ত্রী তপঃসাধনাদি দ্বারা স্বকীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ যত্নে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন করিয়া দৈহিক পবিত্রতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেই স্থলে শুধু রোগারোগ্যের জন্য স্ত্রীসঙ্গমের উপদেশ

দেওয়া আর তোমার সহধর্ম্মিণীর মহৎ ব্রতে কলঙ্কলেপন করা এক কথা হইয়া পড়িবে। নামের সেবায় অধিকতর অভিনিবেশ প্রদান কর, সৎসঙ্গ ও সদাচার পালনে অধিকতর দৃষ্টিশীল হও, যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ কারণকে আশ্রয় করিয়া তোমার দেহস্থ বীর্য্য-ধাতু অজ্ঞাতসারে ক্ষয়িত হইবার সুযোগ পাইতেছে, সেই সকল কারণের তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লও এবং উপযুক্ত প্রযত্নে তাহাদের অভ্যুদয়কে নিবারণ কর। স্ত্রী যেখানে স্বামীর সর্ব্বকল্যাণের সহযাত্রিণী, স্ত্রী যেখানে স্বামীর সর্ব্বকর্ম্মের সহযোগিনী, স্ত্রী যেখানে স্বামীর সর্ব্বযজ্ঞে সহধর্ম্মিণী, স্ত্রী যেখানে স্বামীর সর্ব্বব্রতে জীবন-সঙ্গিনী, সেখানে এত সামান্য প্রয়োজনে স্ত্রীর তপঃপবিত্র দেহকে মৈথুনরত হইতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে।"

ত্যাগশক্তিই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের মূল

অপর এক পত্রলেখকের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এতদ্‌ভুক্ত শিষ্যদের সংখ্যাধিক্য দিয়াও নির্ণীত হয় না, শিষ্যদের বিষয়-বৈভব দিয়াও নয়। ইহা হয় তাহাদের সাধন-নিষ্ঠা, অকপট ইষ্টপ্রীতি এবং ত্যাগের শক্তি দিয়া। এই যে আমি যথায় তথায় নির্ব্বিচারে ব্রহ্মবীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছি, সংখ্যাধিক এক সুবিশাল সম্প্রদায় সৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য নয়। সে উদ্দেশ্য থাকিলে দীক্ষিত শিষ্যদের তালিকা সংরক্ষণে আমার প্রচুর যত্ন দেখিতে। আমি চাই ব্যক্তির জীবনে ত্যাগের শক্তিকে জাগাইয়া দিতে। কারণ, পাঁচজন ত্যাগী একটা সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডে যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে, সহস্র লক্ষপতি ভোগীর ধনসম্মেলনেও তাহা সম্ভব নহে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে ত্যাগের সহিত বিদ্যাবল, জনবল ও ধনবলের সম্মেলন অতুলনীয় আনুকূল্যই সৃষ্টি করে।"

নাম ও কাম

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কাম তোমাকে চঞ্চল করিতেছে? করুক। জোর্‌সে নাম চালাও। পরিণামে নামেরই জয় হইবে। এই ব্যাপারে তোমার পুরুষকার যেমন প্রয়োজন, ধৈর্য্যের প্রয়োজন তার চেয়ে কম নহে। দৈব ও পুরুষকারের

চির-প্রচলিত কলহের প্রতি কর্ণপাত করিও না। ভগবানের মঙ্গলময় অখণ্ড নাম স্বয়ং সর্ব্ব দৈবেরও দৈবত-স্বরূপ। সমগ্র পুরুষকার দিয়া এই পরম দৈবের সেবা কর। অটল সহিষ্ণুতা সহকারে ফল-প্রতীক্ষা করিয়া সজোরে নাম চালাইয়া যাও। কাম পালাইবার পথ পাইবে না।”

যশোলিপ্সা কখন প্রশংসনীয়?

বেলা একটার সময়ে ট্রেণ আসিয়া ফেণী পৌছিল।

বিকাল বেলা অনেক কলেজী ছাত্র উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বিশেষ করিয়া চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যশের লোভ দোষের নয়, যদি এর ফলে তুমি আত্মগঠনে ব্রতী হও, চরিত্র-গঠনে অধ্যবসায়ী হও। যশোলাভের প্রেরণায় জগতে অনেক নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তি কর্ম্মবীরে পরিণত হয়েছে, দশজনের করতালির লোভে অনেক ভীরু কাপুরুষ অসামান্য সাহসের কাজ করেছে, অনেক আর্ত্তের উদ্ধার ও অনেক দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করেছে। এসব ক্ষেত্রে যশোলোভ দোষনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু সস্তায় যশ অর্জ্জন কত্তে গিয়ে তুমি যদি অসত্যাশ্রয়ী হও, পরপীড়ক হও, প্রতারক হও, এ যশোলিপ্সা তোমাকে নরকের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে।

গুরু-শিষ্যের পরিচয়

রাজবাড়ীর এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ দীক্ষার ভিতর দিয়ে। সাধন পেয়েও শিষ্য যদি কাজ না করে, তবে এ সম্বন্ধ দৃঢ় হবে কি ক'রে? গুরু রইলেন নামকে-ওয়াস্তে গুরু, শিষ্য রইলেন নামকে-ওয়াস্তে শিষ্য। চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছ তুমি অমুক যশস্বী যোগীর শিষ্য, অথচ তাঁর কথামত কাজ কচ্ছ না, এ চীৎকার ত' গুরুকে জুতো মারা। আমি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছি, অমুক জজসাহেব আমার শিষ্য, অথচ সে সাধন করেই না, এ প্রচার ত নিজের কান নিজে ম'লে দেওয়া। দুটী ছেলে মেয়ের বিয়ে হ'ল, লোকে জান্‌ল তারা স্বামি-স্ত্রী, অথচ ছেলেটী স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিলে না, স্ত্রী ও স্বামীকে সেবা

ও আনুগত্য দিলে না, স্বামী রইল আর একটী মেয়ে-মানুষ নিয়ে, স্ত্রী রইল আর একটী পুরুষ মানুষ নিয়ে,—এতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া ত' দূরের কথা, বজায়ই থাক্‌তে পারে না। মন্ত্র দিয়েই গুরুর ছুটী নেই, নিজ তপস্যার শক্তি দিয়ে শিষ্যের কল্যাণ কত্তে হবে, তার ধর্ম্ম-বোধকে পুষ্টি দিতে হবে, তার সাধন-নিষ্ঠাকে বর্দ্ধন কত্তে হবে। মন্ত্র নিয়েই শিষ্যের ছুটী নেই, সেই মন্ত্রের সাধন কত্তে হবে, গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে সদ্‌গুরুর বাক্য বেদবাক্য জ্ঞান ক'রে তৎকথিত কাজ কত্তে হবে। যেখানে এরূপ, সেখানেই গুরু-শিষ্য ব'লে পরিচয় দেওয়া সার্থক এবং সেখানেই এই সম্বন্ধ তার সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

ভগবদ্-ভক্তের জাতি

রাজবাড়ীর পেস্কারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্-ভক্তের জাতি জিজ্ঞাসা করাও অপরাধ। ভক্তদের আবার জাত কি? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যবন হরিদাসের মৃতদেহ স্বয়ং কাঁধে ক'রে নিয়ে সমুদ্র তীরে সমাধিস্থ করেছিলেন। জাত-বিচার করেন নি। আচার্য্য-প্রবর অদ্বৈত তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন যবন হরিদাসকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বরণীয় আসনে বসিয়ে ব্রাহ্মণ্যদেব জ্ঞানে ভোজন করিয়েছিলেন। সমাজ মানেন নি। শ্রীরামচন্দ্র গুহক-চণ্ডাল বা সিদ্ধ-শবরীকে নীচ জাতি ভেবে উপেক্ষা করেন নি, অনার্য্য বিভীষণকে অনাদর করেন নি। এসব দেখেও যদি আপনাদের চোখ না ফোটে, তবে আর কিসে ফুট্‌বে?

মহাপুরুষের লক্ষণ দুর্জ্ঞেয়

রাজবাড়ীর আইন-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—

"মহাপুরুষদের চেনা কঠিন। কে যে কিভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকেন, ঠিক্ নেই। কেউ বিলাসিতার ঢং দেখিয়ে সিল্কের গেরুয়ার নীচে লুকিয়ে থাকেন, কেউ বা সর্ব্বশরীরে গোময় লেপন ক'রে পাগল সেজে আত্মগোপন করেন। আবার কেউ পূরা সংসারীর খোলস গায়ে দিয়ে লোককে দেখান যেন তিনিও বদ্ধ জীব। তবে যাদের উপরে তাঁদের কৃপা হয়, তাদের

কাছে ধরা দেন। কেউ প্রচণ্ড বিলাসিতার অভ্যন্তরে দধীচির অস্থি দেখ্‌তে পেয়ে, কেউ গোময়ের নীচে চন্দনের গন্ধ পেয়ে, কেউ বাহ্য সংসার-বদ্ধতার অন্তরালে জীবন্মুক্ত পুরুষকে দেখ্‌তে পেয়ে আত্মসমর্পণ করে। মহাপুরুষদের আচার-ব্যবহার বড়ই বিচিত্র, কিছু বুঝে উঠ্‌বার উপায় নেই।

ফেণী

২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

প্রাতঃকালীন ধ্যান-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাবা মুলতুবী পত্রসমূহের উত্তর দিতে বসিলেন।

ধর্ম্ম-প্রচারকের আত্মবিচার ও ঈশ্বরমুখিতা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নিজের চিত্তশুদ্ধিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অপরকে চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে উপদেশ দিবে. নিজের ধর্ম্ম-সাধনায় জোর বাঁধিবার উদ্দেশ্যেই অপরকে ধর্ম্মসাধনে উৎসাহিত করিবে। ভগবানের কথা বলিবার কালে, পরমাত্মার বাণী বিস্তার সময়ে দেখিতে হইবে তুমি আবার পরমাত্মাকে না ছাড়িয়া দাও। প্রচারকের মুখ যাহাকেই উপদেশ প্রদান করুক, মন যেন পরমপুরুষেই লগ্ন থাকে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নাম-প্রচারার্থে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে দেখিতেন যে, মন ঈশ্বর ছাড়িয়া কতকগুলি বাক্যে ও উচ্চ চীৎকারেই লাগিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর উদ্দণ্ড ভাব কাটিয়া যাইত, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় তিনি স্থির হইতেন এবং পুনরায় মনকে পরমাত্মায় সংলগ্ন করিয়া লইয়া তবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। এই আত্মদৃষ্টি, এই আত্মবিচার, এই আত্মবিশ্লেষণ প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রধানতম সদ্‌গুণ বলিয়া জানিও। মনোরম দেহকান্তি নহে, নয়ন-ধাঁধান বেশভূষা নহে, জটা-জূট-গৈরিক নহে, ত্রিলোক-বশীকরণক্ষম বচন-মাধুরী নহে, অত্যাশ্চর্য্য বাগ্‌বিভূতি নহে, প্রচারকালে মনকে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল উৎস শ্রীভগবানে সংলগ্ন রাখিবার ক্ষমতাই প্রচারকের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যকীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তবু তিনি জগদ্‌গুরুর আসন পাইয়াছিলেন, শুধু এই একটী ক্ষমতার বলে।"

রমণীর কাছে রমণী হও

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"রমণীর কাছে রমণী হও, কাম-ভয় আর থাকিবে না। ভুলিয়া যাও, তুমি পুরুষ; ভুলিয়া যাও, তোমার গুম্ফ-শ্মশ্রু প্রভৃতি আছে। মহামায়ার সন্তান তুমি, মায়ের শক্তি তোমাতে আছে, ইচ্ছামাত্রেই তুমি মা সাজিতে পার, মনকে মায়ের মনের মত মাধুরীময়, কমনীয় ও কোমল করিতে পার, ইচ্ছা করিলেই মায়ের মত ক্রোড় বিস্তার করিয়া লালসাময়ী কন্যাকেও বুকে তুলিয়া স্তন্য-সুধা পান করাইতে পার। শিশুর কাছে শিশু আর নারীর কাছে নারী যে হইতে পারে, মহামায়ার মায়াজাল তার স্পর্শে ছিঁড়িয়া শতখণ্ড হইয়া যায়।"

প্রণবের উচ্চারণ ও অর্থ

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ওঙ্কারের উচ্চারণকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করিবার কৃত্রিম চেষ্টা যোগ-সাধন-তত্ত্বের বিরোধী। অ, উ, ম এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে বিভিন্ন করিয়া ইহার উচ্চারণ করাও যেমন ভুল, তিনটী অক্ষরকে বিভিন্ন মনে করিয়া তার ব্যাখ্যা করাও তেমন ভুল। গুরুমুখশ্রুত প্রণব ধীর চিত্তে জপিতে থাকিলে মনের স্থৈর্য্য-বৃদ্ধির সাথে সাথে নামও দীর্ঘোচ্চারিত হইতে থাকে। তখন এক অফুরন্ত নাদপ্রবাহ অবিচ্ছেদ গতিতে চলিতেছে বলিয়া অনুভূত হয়। তাহাতে অকার, উকার এবং মকার এই তিনটী বর্ণেরই একত্র সমাবেশ যুগপৎ উপলব্ধ হয়। তানপূরার চারিটী ভিন্ন ভিন্ন তারে চারিটী ধ্বনি উৎপন্ন হইলেও সঙ্গীত-সাধকের লক্ষ্য যেমন সেই ধ্বনিগুলির মিলনফলজাত অবিচ্ছেদ নির্ব্বিরোধ নাদ, প্রণব-সম্বন্ধেও তাহাই। অবিচ্ছেদ অফুরন্ত অনির্ব্বচনীয় নাদে মনঃ-সংনিবেশনই প্রণব-সাধনার গূঢ় কথা—অ, উ, মের পার্থক্য-কোলাহলের মধ্যে যাইবার তার প্রয়োজন কি? ওঙ্কার পরমাত্মার নাম, আমার পরমোপাস্যের নাম, আমার সর্ব্বসন্তাপহারী পরমারাধ্যের নাম,—ইহাই প্রশস্য যুক্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামধেয় তিনটী তত্ত্ব ডাকিয়া আনিয়া মনের এক-

মুখিনী গতিকে ত্রিমুখিনী করিবার চেষ্টাও যোগ-বিজ্ঞান-বিরোধী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের প্রতীক। ওঙ্কার ত্রিগুণময়ের অর্থাৎ ত্রিগুণাতীতের প্রতীক। দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারের সময়ে এই সকল কথার অবতারণা অহিতকর নহে। পরন্তু তপঃসাধনকালে এত দার্শনিকতার আমদানী করিতে গেলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের খোঁচাখুঁচিতে ইষ্ট-মন্ত্রের শ্রদ্ধা লাজবতী কুল-বধূর মত অবগুণ্ঠনতলে মুখ লুকাইবে। জানিয়া রাখ, গুরুমুখশ্রুত নাম একাগ্রচিত্তে জপিতে জপিতে স্বভাবতঃ যে নাদ অবিচ্ছেদ ধ্বনিতে নিজেরই ভিতরে ফুটিয়া ওঠে, তাহাই ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ এবং তোমার পরমাভীষ্টই ওঙ্কারের প্রকৃত অর্থ। এইটুকু স্মরণে রাখিয়া একাগ্র মনে সাধন করিয়া যাও, সিদ্ধি করামলকবৎ বশীভূতা হইবে।"

সম্মুখেও জন্মজন্মান্তর রহিয়াছে

একটী মহিলা ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এ জন্মে অনেককে অপটু দুর্ব্বল দেহ লইয়া আসিতে হয়। ইহা এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু তার জন্য মা হতাশ হওয়া নিতান্ত ভুল। সম্মুখেও মা জন্মজন্মান্তর রহিয়াছে। এ জন্মের কর্ম্মের দ্বারা আগামী জন্মের জন্য যোগ-সাধনক্ষম দেহ, মন ও অনুকূল অবস্থা সৃজন করিতে হইবে। শ্বাসের জমিতে নামের বীজ বপন করিতে থাক। অহর্নিশ এই কর্ম্মে লাগিয়া থাক। সহস্র সহস্র বীজও যদি বৃথা হইয়া যায়, কোনও ক্রমে একটী মাত্র বীজ যদি অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে, তবেই ত্রিতাপজ্বালা ঘুচিয়া গেল। বীজে প্রেমের বারিসিঞ্চন করিতে হয়, বিশ্বাসের মলয় হিল্লোল লাগাইতে হয়, তাহা হইলে ইহা সহজেই মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে।"

কাম-কোলাহল থামিবে কিসে ?

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মানুষ যদি একবার ভাবিয়া দেখিত, এই রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার জীব-দেহ কেমন ক্ষণিক, রজোবীর্য্যের পরিণাম-ফল এই দেহ কেমন ভঙ্গুর, ইন্দ্রিয়-সেবার পরিতৃপ্তি কেমন অস্থায়ী, তাহা হইলে আপনিই তার সকল কামকোলাহল

থামিয়া যাইত। অবশ্য ইহা হইল বিচার-মার্গের কথা। বিচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অপরূপ ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াও কাম আসে। তখন তাহাকে চিনিয়া ওঠা শক্ত কথা। স্নেহ, প্রেম, দয়া, মমতা প্রভৃতি কত রূপ যে সে ধরিতে জানে, তাহা বলিবার নহে। মস্তকের কেশদাম বা আকাশের তারকা-রাজী গণিয়া শেষ করিতে পারিবে, সমুদ্রসৈকতের বালুকারাশির সংখ্যা-নির্ণয় করিতে পারিবে, কিন্তু একমাত্র কামপ্রবৃত্তিই যে কত সময়ে কত রূপ ধরিয়া মনুষ্যের মনের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিবে না। অনঙ্গ যখন এ-ভাবে আসে, তখন যুক্তির প্রখরতা কমিয়া যায়, তেজস্বী যোদ্ধার হস্তচ্যুত অসির ন্যায় তার সকল তীক্ষ্ণতা নিরর্থক হয়। এই সময়ে কাম-কোলাহলের উৎসমুখ কে রুদ্ধ করিবে জান ? ভগবৎ-প্রেম ও নিরন্তর ভগবন্নাম-সেবা। যুক্তি যেখানে সংগ্রামে অনিচ্ছুক বা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অচেতন, নাম-সেবা সেখানে মনকে এক অতীন্দ্রিয় দৈব বিভূতিতে শক্তিমান্ করে, নামসেবার ফলে এক অতি সূক্ষ্ম আত্মরক্ষিণী শক্তি সঞ্জীবিত হয়, ছদ্মবেশী কামকে সে ধরিয়া ফেলে এবং অতি সহজেই পরাজিত করে। সুতরাং সর্ব্ব-প্রযত্নে নাম সেবায়ই অভিনিবিষ্ট হও, ভগবন্নামের মধু-রসে নিমজ্জিত হও।"

নামে মন বসে না কেন ?

এই সময়ে কতিপয় ভক্ত-যুবক শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে আসিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—নামে মন বসে না কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীসম্ভোগ-চিন্তায় মন বসে ত ?

যুবকটী লজ্জিতভাবে উত্তর দিলেন,—বসে। বলিতে কি ঐ চিন্তা ছাড়্তেই পারি না।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রী-সম্ভোগ কখনো করেছ ?

যুবক বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীদেহ কখনো স্পর্শ করেছ ?

যুবক বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,- স্ত্রী-যোনি কখনো দর্শন করেছ?

যুবক বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তথাপি কেন স্ত্রী-সম্ভোগের জন্য চিত্ত আকুল, তা বল্‌তে পারো?

যুবক বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যারা স্ত্রী-সম্ভোগ-সুখে সুখী, তাদের মুখ থেকে বাল্যাবধি শুনে এসেছ যে, এতে বড় সুখ, বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি। তাদের কথা বারংবার শুনে শুনে তোমার ঐ কথায় গভীর আস্থা এসেছে। দেখতেও পাচ্ছ যে, জগতের কোটি কোটি লোক এই সুখেরই জন্য পাগল। তাই এই সুখটীকে লাভ করার জন্য তোমার চিত্ত এত ব্যাকুল। যারা ব্রহ্ম-সম্ভোগ-সুখে সুখী, তাঁদের মুখ থেকে বারংবার যদি শ্রবণ কর, ব্রহ্মলাভে কি সুখ, কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, যাঁরা ব্রহ্ম-কৃপা লাভের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, যদি লক্ষ্য কর যে তাঁরা কত দ্রুত কত ত্রস্ত তাঁদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, যদি লক্ষ্য কর, কেমন তাঁরা নির্ভীক, কেমন তাঁরা নিশ্চিন্ত, কেমন তাঁরা নির্ভরশীল, যদি লক্ষ্য কর যে, শত সুন্দরীর সঙ্গসুখ তাঁদের নিকটে কত তুচ্ছ, গন্ধর্ব্ব-কুমারীর কলকণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান তাঁদের নিকটে কেমন ব্যর্থ, যদি এঁদের জীবন আলোচনা কর, এঁদের চরিত্র চিন্তা কর, এঁদের সঙ্গ কর, পরমাত্মাকে লাভ করার জন্যও তোমার চিত্ত তেমন ব্যাকুল হবে। নামে রুচি আন্‌তে হলে, নামে মন বসাতে হলে, যাঁরা নামের সেবা ক'রে সুখী হয়েছেন, আনন্দ পেয়েছেন, তাঁদের বাক্যে আস্থা স্থাপন কত্তে হবে, তাঁদের কার্য্যের অনুসরণ কত্তে হবে।

স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ

অপর একজন যুবক প্রশ্ন করিলেন,—স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ কি নেই?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আছে। চিরকালই থাকবে। কিন্তু সে আকর্ষণে আর সম্ভোগ-লিপ্সায় অনেক তফাৎ। নারী পুরুষকে চায়, পুরুষ নারীকে চায়, তার দেহকে চায়, তার মনকে চায়, তার আত্মাকে চায়, তাকে সমগ্রভাবে

চায়, তার কোনও অংশকে নিয়ে এই আকর্ষণের উদ্ভব নয়। সমগ্রকে পাওয়ার জন্য, সমগ্রভাবে পাওয়ার জন্য এই যে আকর্ষণ, এটা, পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য জীবের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, তারই অংশ মাত্র। কিন্তু অন্য কারো কাছ থেকে তুমি যখন শিক্ষা পাও, দেহচর্মে কি সুখ রয়েছে, শরীরের বিশেষ কোনও একটা গুপ্ত অঙ্গ থেকে কি সুখ পাওয়া যায়, তখন তোমার চিত্তের আকর্ষণ সমগ্রকে ছেড়ে একটা ক্ষুদ্র ভোগকেন্দ্রে গিয়ে আটক্ পড়ে। এই অবস্থাটাই নরক। যতক্ষণ সমগ্রকে নিয়ে ছিলে, বেশ ছিলে, পবিত্র ছিলে, নির্ম্মল ছিলে, অচঞ্চল ছিলে। যাই তুমি সমগ্রকে উপেক্ষা ক'রে অংশের ভিতরে ডুব দিলে, তোমার সুস্থতা গেল, স্বাচ্ছন্দ্য গেল, পবিত্রতা গেল, ধীরতা গেল, এল বন্যার আবিল দূষিত পূতিগন্ধময় প্রবাহ। একজন বালব্রহ্মচারী গুরুগৃহ থেকে গ্রামে ভিক্ষা কত্তে বেরুল। আজন্ম সে স্ত্রীমুখ দর্শন করে নি, স্ত্রীদেহের বর্ণনা শোনে নি। ভিক্ষাদান-নিরতা মমতাময়ী নারীমূর্ত্তি তাকে আকৃষ্ট কল্ল, কিন্তু এ আকর্ষণে আবিলতা নেই। কুলবধূর স্তনযুগ দেখে সে মনে কল্ল বিল্বফল। এইটী হচ্ছে সরলমনা স্বভাব-শিশুর নারীজাতির প্রতি আকর্ষণ, যা নারীদেহের অংশবিশেষের মধ্যে মনকে বেঁধে রাখে না ব'লে সম্ভোগ-লিপ্সাও জাগায় না। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে হবে, তাই রাজা দশরথ বারাঙ্গনা পাঠালেন ঋষির তপোবনে তাঁর তপোভঙ্গ কত্তে। ঋষি-জীবনে কখনো রমণী-মুখ দেখেন নি, রমণী-দেহের কিছু জানেন নি, এ বিষয়ে কারো মুখে কিছু শোনেন নি, তবু তিনি এক অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব কর্ল্লেন। রমণী ভেবে নয়, দেবতা ভেবে তিনি তার অভ্যর্থনা কর্ল্লেন। এই যে আকর্ষণ, এর ভিতরে সম্ভোগলিপ্সার স্থান নেই। সম্ভোগ-লিপ্সা জাগে তখন, যখন রমণীর সমগ্র রূপ তোমার চোখের সম্মুখ থেকে স'রে যায়, পড়ে তার অস্তিত্বের ক্ষুদ্র কয়েকটা অংশ। যখন তোমার দৃষ্টি সমুদ্রচারিণী, তখন তুমি নিষ্কাম, যখন তোমার দৃষ্টি ডোবার আবদ্ধ জলে, তখন তুমি সম্ভোগকামী। পশু-পক্ষীদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে পাশ্চাত্য রতি-তত্ত্ববিদেরা ব'লে থাকেন বটে যে, সম্ভোগ-লালসাই মানুষের প্রেরয়িত্রী শক্তি, কিন্তু সে কথা ভুল। আদিম যুগের মানব-মানবী প্রিয়জনকে

বুকে তুলে নিতে শিখ্‌বার বহু পরে সম্ভোগ করা শিখেছে ; স্বাভাবিক আকর্ষণ একজনকে আর একজনের অতি নিকটে এনে দেবার বহু পরে এরা জান্‌তে পেরেছে যে সম্ভোগ একটা ব্যাপার হ'তে পারে। পরবর্ত্তীরা সম্ভোগ-তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নি, শিখেছে সম্ভোগ-রসিক পূর্ব্ববর্ত্তীদের মুখ থেকে শুনে। তাই এদের সম্ভোগ-লিপ্সা নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণের সহজ গতিকে ভঙ্গ ক'রে দিয়ে অস্বাভাবিকরূপে উদ্রিক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকে আলোকিত এই যুগেও দুই একটী অতি সদাচারী পরিবারে এমন বয়ঃস্থা মেয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্ব্বে যাদের কাণে সম্ভোগের তত্ত্ব মা-বোনেরা ঢেলে না দিলে বাসর-ঘর কবি কালিদাসের ফুলশয্যার রজনীর ন্যায় একটা হাস্যকর ঘটনার সৃষ্টি কত্ত। কবি কালিদাস্‌-সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি অত্যন্ত বোকা ছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে বিয়ে হ'ল তার এক রাজকন্যার সঙ্গে। মশারীর ভিতরে কি ক'রে ঢুক্‌তে হয় তা তাঁর জানা নেই, লম্ফ দিয়ে তিনি মশারীর ছাদের উপরে উঠ্‌তেই হুড়মুড়িয়ে পড়লেন গিয়ে শয্যাশায়িনী রাজকন্যার গায়ে। এই রাজকন্যার পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল তার বোকারাম স্বামীটীকে সম্ভোগ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়ে সংসারী করার। কবি কালিদাস সম্বন্ধীয় এই গল্পটী কিছুতেই সত্য হ'তে পারে না, কিন্তু আদিম মানব-দম্পতীর মনে সম্ভোগাসক্তির উদ্ভব যে সমগ্রের প্রতি সমগ্রের আকর্ষণের অনেক পরে হয়েছিল, তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত এই ক্ষুদ্র কাহিনীটুকুর মধ্যেই রয়েছে। একেবারে সব সময়েই পশুর প্রবৃত্তির সঙ্গে মানুষের তুলনা দিতে যাওয়াও এক প্রকারের পাশবিকতা।

সম্ভোগাসক্তি নিবারণের উপায়

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—সম্ভোগাসক্তি নিবারণের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৌন্দর্য্য-পিপাসা আর সম্ভোগ-পিপাসা এক নয়। সৌন্দর্য্য-পিপাসাই সঙ্কীর্ণ হ'লে সম্ভোগ-লালসায় পরিণত হয়। এই কথা থেকেই সম্ভোগ-লালসা বর্জ্জনের উপায় পাচ্ছ। নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব কচ্ছ ? বেশ ত ! সেই নারীর প্রতি তোমার আকর্ষণটাকে সঙ্কীর্ণ হ'তে

দিও না। তার সমগ্র মাধুর্য্যে তার প্রতি আকৃষ্ট হও, নীচ লালসা দূর হ'য়ে যাবে। এই একটী নারীর ভিতর দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র স্নিগ্ধতাকে যে চায়, তার কাছে নারী আর দেহধারিণী-মাত্রই থাকে না, নারী তখন হয় একটা স্বচ্ছ শক্তি-বিশেষ। তার দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায় তখন সে নারীর বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি দেখে, যে মূর্ত্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় সপ্তর্ষির তপোবন সৃষ্ট হয়েছে।

মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য

ফেণী-কলেজ-হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের আমন্ত্রণে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা লোকনাথ হলে শুভাগমন করিলেন। ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী শ্রীশ্রীবাবাকে পরম যত্ন ও সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার জন্য পৃথক্ একখানা উচ্চ আসন রচিত হইয়াছিল, শ্রীশ্রীবাবা তাহাতে উপবেশন করিলে ছাত্রগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। নিকটেই একটী টেবিলের উপরে ধূপদানী রক্ষিত হইল।

প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপী উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ হওয়াই মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য। পশুভাবের যে সব সংস্কার মানুষের ঊর্দ্ধ-মুখিনী গতিকে অবরুদ্ধ করে, সেই সব সংস্কারকে জয় করাই মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য।

২৩শে শ্রাবণ,
১৩৩৯

আমি যাঁর, জয় দাও তাঁর

সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই ধ্যান-জপাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাবা বিলনিয়া রওনা হইলেন। ট্রেণ ৫টার সময় ছাড়িয়া ৬৷৷৹টায় বিলনিয়া পৌছিল। বিলনিয়া স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী মহকুমা। শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দাস শ্রীশ্রীবাবার আশ্রিত সন্তান, স্থানীয় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি কয়েকজন শিক্ষক ও বহু ছাত্র সমভিব্যহারে ষ্টেশনে অভ্যর্থন' করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতেই সকলে সমস্বরে শ্রীশ্রীবাবার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—জয়োচ্চারণ আমার নামে নয়। আমি যাঁর, জয় দাও তাঁর।

নামের চাষার আনন্দ কিসে?

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাসের আবাসে শ্রীশ্রীবাবা শুভাগমন করিলেন। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের অনেকেই আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়া গেলেন। বিলনিয়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রায় বর্ম্মণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবার নিকট অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন।

ভিড় কমিয়া একটু নিড়িবিলি হইলে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস বলিলেন,—বাবার কৃপায় প্রিয়বালার (শ্রীযুক্ত দ্বিজদাসের স্ত্রী) শুচিবায়ু চ'লে গেছে, ছেলেমেয়ের অসুখ হ'লে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌ত, সান্ত্বনা দেওয়া চল্‌ত না, এখন কিন্তু "জয়গুরু"র দোহাই দিয়ে শক্ত হ'য়ে থাকে। ফলও দেখ্‌তে পাচ্ছি অদ্ভুত। ডাক্তার-কবিরাজের সাহায্য ছাড়া ছেলেমেয়ের অসুখ সেরে যাচ্ছে।

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস শ্রীশ্রীবাবার হাতে শ্রীযুক্তা প্রিয়বালার লিখিত একখানা পত্র দিলেন।

পত্রখানা পড়িয়া শ্রীশ্রীবাবা প্রফুল্ল আননে বলিলেন,—এসব উত্তম আধারের লক্ষণ। দীক্ষা আর পুনর্জ্জন্ম একই কথা। উত্তম আধারে ব্রহ্মবীজ পড়ামাত্র তার ভিতরে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনে দেয়। মধ্যম আধারে সামান্য সাধনের পরে এ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। অধম আধারে দীর্ঘকাল সাধনের পরে এ পরিবর্ত্তন আসে। প্রিয়বালার আধার অত্যুৎকৃষ্ট, তাই মেয়ে মানুষ হ'লেও একদিনের মধ্যে শুচিবায়ু গেল, ভয় গেল, দুশ্চিন্তা গেল। এই রকম আর একটী উত্তম আধার পরমাত্মা আমাকে দিয়েছিলেন। তখন আমি বাঘাউড়া থাকি। মূলগ্রামের একটী ছেলে বাঘাউড়া থাকৃত, প্রায়ই সে আমার কাছে আস্‌ত। বড় ভীরু ছিল ছেলেটী। সন্ধ্যার পরে রোজ তাকে লোক দিয়ে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হত, একা যেতে পারৃত না। বাড়ী খুব দূর নয়, তবু তার ভয় ছিল অসাধারণ। ভগবানের কৃপা হ'ল, একদিন সে দীক্ষা পেল।

তারপর দিন বিকেল বেলা আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বার জন্য তাকে মাঠে একটা জায়গায় অপেক্ষা কত্তে ব'লে দিলাম। শ্রীমান্ ত যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির। আমি কিন্তু সেকথা ভুলেই গেছি। নিকটেই অনেকগুলি লোকের শ্মশান, দিন কয়েক আগে একটা মরা সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে। শ্রীমান্ আমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে রাত্রি বারোটার সময়ে আমার কাছে এসে হাজির। তাকে দেখে আমার সব কথা মনে হল। জিজ্ঞেস কল্লাম,—"তোর ভয় করে নি?" সে বল্লে,—"অণুক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম, তাই ভয়-ভাবনা আমার কাছ ঘেঁষতে পারে নি।"—এই রকম আধারে ব্রহ্মবীজ বপন কত্তে পার্লেই নামের চাষার আনন্দ।

আহার কমাইবার উপায়

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস একাকী থাকেন, পরিবারবর্গ দেশে রহিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবার সেবার ব্যবস্থা তাঁর গৃহেই হইয়াছে। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর বৃদ্ধা মাতা অতি যত্ন সহকারে শ্রীশ্রীবাবার আহারীয় প্রস্তুত করিয়াছেন। ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর কুমারী কন্যা সলিলা ও অনিলা পাখার বাতাস করিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা আহারীয় রূপে অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্যই গ্রহণ করিলেন দেখিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর মাতা বলিলেন,—"বাবা, অত অল্প আহার করবেন না, শরীর রক্ষার জন্য আহার চাই। মেহারের হরিদাস বাবাজী শেষটায় আহার একেবারে ছেড়েই দিলেন। সারাদিনে এক চুমুক দুধ, কিম্বা কোনো দিন আধখানা কি সিকিখানা ফল খেয়ে থাকতেন। ফলে তার শরীর একেবারে শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, যেন একখানা পাটকাঠি।"

আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হরিদাস বাবাজীর মত উগ্রতপা যোগী পুরুষরা ইচ্ছা ক'রে কখনো আহার কমান না। বাহ্য জগতের শ্রম কম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগতের খাদ্যের প্রয়োজনও ক'মে যেতে থাকে। চেষ্টা ক'রে কমাতে যাওয়াও বিপজ্জনক। সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে যার যার প্রয়োজন মত আপনি আহার কম্‌তে থাকে। তবে যে কারো কারো দেহ অত্যন্ত শীর্ণ হ'য়ে

যায়, তার কারণ তাঁদের দেহের গঠন। হরিদাস বাবাজী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির মত ব্যক্তিরা দৈনিক দশ মণ ছানা-সন্দেশ খেলেও কখনো স্থূলকায় হবেন না। আবার ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, হাতীয়া-বাবা-সচ্চিদানন্দের মত পুরুষেরা একেবারে অনাহারে থাক্‌লেও কখনো শীর্ণকায় হবেন না। অবশ্য এরা সকলেই যোগীশ্বরও ব্রহ্মকল্প পুরুষ।

হাতীয়া বাবা সচ্চিদানন্দ

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাতীয়া বাবা সচ্চিদানন্দ কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইনি একজন পশ্চিমা মহাপুরুষ। জন্মকালেই ইনি এত বিরাট দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যে, প্রসব কত্তেই তাঁর মা মারা যান। তাঁর পিতা ছিলেন স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর এত দুঃখ উপস্থিত হ'ল যে তিনি এই অলক্ষুণে ছেলেকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিয়ে ফেলে এলেন। এদিকে এক সাধুপুরুষ বনের মধ্যে ফল-মূল-কাঠ সংগ্রহ কত্তে বেরিয়ে এক অস্বাভাবিক ক্রন্দন শুন্‌তে পান। ক্রন্দনের শব্দ অনুসরণ ক'রে কাছে এসে দেখেন, একটী বিশালকায় শিশু প'ড়ে আছে, আর একটা শৃগাল তার হাতে কামড় দিয়ে টেনে নেবার চেষ্টা কচ্ছে কিন্তু শিশু অত্যন্ত ভারী ব'লে টেনে নিতে পাচ্ছে না। সাধুমহাত্মা শৃগালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে শিশুটীকে নিয়ে এলেন এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ বেঁধে দিলেন। তাঁর কাছেই এই শিশু প্রতিপালিত হলেন এবং ক্রমে বড় হ'য়ে হাতিয়া বাবা বা বাবা সচ্চিদানন্দ নামে বিখ্যাত হলেন। এই মহাত্মার শরীরখানা ছিল যেন একটা ছোটখাটো পাহাড়, হাতের এক একখানা অস্থি ছিল যেন এক একটা মুগুর। শুনা যায়, একদিনে ইনি আধমণ আটার রুটী খেয়ে ফেল্‌তেন, আবার তিনমাস উপবাস ক'রেও থাকৃতে পারতেন।

কুমারী কন্যার কেমন বর চাই ?

দিবাভাগে শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রাম প্রায়ই করেন না। ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর মায়ের অনুরোধে তিনি বিছানায় একটু কাত হইলেন। অনিলা ও সলিলা তালপাতার পাখায় বাতাস করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—থাক্ মা, দরকার নেই। কিন্তু সেবাকার্য্যে সুশিক্ষিতা মেয়ে দুটী বিরত হইল না।

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর মা বলিলেন,—বাবা আশীর্ব্বাদ করুন, ওদের যেন ভাল বর মিলে। কুলীনের মেয়ে ত! বিয়ে দেওয়া এক বিষম সঙ্কট।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তথাস্তু! তারপরে সলিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন মা, তোর চাই এমন বর যার বুকটা সমুদ্রতটের মত বিশাল, শত তরঙ্গের আঘাতেও যা ভাঙ্গে না। অনিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আর তোর চাই এমন বর, হিমালয়ের মত যে অভ্রভেদী উচ্চ, শত ঝঞ্ঝা বায়ুতেও টলে না। তাই নয় মা? বালিকাদ্বয় লাজে মুখ নত করিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, তথাস্তু! তথাস্তু!

হাতীয়া বাবার তপস্যা

কথায় কথায় পুনরায় হাতীয়া বাবা সচ্চিদানন্দের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাতীয়া বাবা একজন অদ্ভুত যোগী ছিলেন। কি কঠোর যে তপস্যা তিনি করেছেন, বল্‌বার নয়। ঈশ্বরের বিধান তিনি উপযুক্ত গুরু পাবেন, তাই তার বাপ পত্নীশোকে অন্ধ হ'য়ে ছেলেকে পরিত্যাগ কর্‌লেন। সদ্‌গুরু তাঁকে গ'ড়েও তুল্‌লেন অদ্ভুত কঠোরতার ভিতর দিয়ে। ছুরি দিয়ে শরীরের দশ বারোটা স্থান চিরে তাতে গোলমরিচ চূর্ণ ঘ'সে দিয়ে তারপরে গুরু আদেশ কত্তেন তাঁকে ধ্যানে বস্‌তে। গুরু বল্‌তেন,—"মরিচের জ্বালা যে ভগবানের নামের গুণে ভুলতে পার্‌বে না, সে আবার রমণী-মোহ অতিক্রম কর্ব্বে কি করে?" কোনো গাছের ডালে হয় ত ভীমরুলে বাসা বেঁধেছে, ভীমরুলের বাসায় কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে তারপরে হাতীয়া বাবাকে হুকুম দিতেন ঐ গাছতলায় ব'সে ধ্যান কত্তে। গুরু বলতেন,—"বিষয় বাসনার জ্বালা মধুমক্ষিকার দংশনের চেয়েও শতগুণ বেশী। মৌমাছির দংশনে যে ঈশ্বরকে ভু'লে যাবে, সে কি কখনো বিষয়-তৃষ্ণাকে জয় কত্তে পারে?" মাঘ মাসের হাড়ভাঙ্গা পাহাড়ে শীত, তার মধ্যে শরীরের বহু জায়গায় বড়শী বিঁধিয়ে দিয়ে গুরু বল্‌লেন,—"জলে নামো।" তারপরে বড়শীর সূতোগুলি গাছের ডালে

এমনভাবে টেনে বেঁধে দিলেন যেন শরীরটী জলের ভিতরে ঝুল্‌তে থাকে, মাত্র মাথাটী উপরে জেগে থাকে। বল্‌তেন,—"এতটুকু দুঃখকে যে দুঃখ মনে করে, সে কি কখনো ভগবান্‌কে পায়?" এই সব উগ্রতার ভিতর দিয়েও যখন হাতীয়া বাবার ধ্যান জম্‌তে থাক্‌ল, শরীর বাহ্যচেতনাহীন হ'য়ে পড়তে আরম্ভ কল্ল, তখন গুরু বল্‌লেন,—"কেল্লা তুমি ফতে করেছ, এখন নির্ভয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চল।"

কৃচ্ছ্র-সাধন ও মহাপুরুষত্ব

প্রসঙ্গান্তর উঠিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কৃচ্ছ্র-সাধনই যে মহাপুরুষত্বের অভ্রান্ত লক্ষণ, তা' নয়। অনেক মহাপুরুষেরা মনকে একনিষ্ঠ রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, এ হচ্ছে ইতিহাসের কথা। কিন্তু কৃচ্ছ্র-সাধন করুন আর না করুন, মন যিনি ভগবানে সমর্পণ কত্তে পেরেছেন, প্রকৃত মহাপুরুষ তিনিই। লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, হাতীয়া বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সাধারণ মানবের অসাধ্য, এমন কি সাধারণ মানবের কল্পনারও অতীত, কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন। কিন্তু কৃচ্ছ্রের জন্যই তাঁরা মহাপুরুষ নন, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ব্রহ্মদর্শনের হেতুতেই তাঁরা মহাপুরুষ। যুগের অগ্রগতির মুখে ভবিষ্যতে কৃচ্ছ্র মানবের ব্রহ্ম-সাধনের অনুকূল ব'লে বিবেচিত নাও হ'তে পারে।

ভগবদুপাসনাই আত্মগঠনের মূল ভিত্তি

এই সময়ে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রায় বর্ম্মণ মহাশয় আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, স্কুলের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সভা-গৃহ প্রস্তুত এবং সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা গাত্রোত্থান করিলেন এবং অচিরে বিদ্যালয়-গৃহে উপনীত হইলেন। ছাত্রেরা শ্রীশ্রীবাবাকে মাল্যভূষিত করিবার পরে একটী "অভিনন্দন" পাঠ করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের উপকারিতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তারিত উপদেশ দিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা উপসংহারীয় অংশে বলিলেন,—মনে রেখো, উপাসনা-পরায়ণতাই আত্মগঠনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে যে জীবন গ'ড়ে উঠ্‌বে, সে জীবন অমৃতের জীবন, আনন্দের জীবম, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বিকাশের

জীবন,—এ জীবনের লয় নেই, ক্ষয় নেই, অধোগতি নেই। মনে রেখো, ভগবদুপাসনা-পরায়ণতা যার মেরুদণ্ডকে শক্ত ক'রে দেয়, জীবন-যুদ্ধে সে হয় দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক, নির্ভীক সৈনিক, মৃত্যুজয়ী সৈনিক, ঝঞ্চার গর্জ্জনে সে বিচলিত হয় না, বজ্রের পতনে সে চমকিত হয় না, ত্রিলোক-বিধ্বংসী ভূকম্পের ভয়াবহ বিদারণে সে পদস্খলিত বা পথভ্রষ্ট হয় না। সত্যি সত্যি জীবনকে যে ঈশ্বর-পরায়ণ করে, মনকে যে ঈশ্বর-চেতনায় পূর্ণ করে, প্রবৃত্তিকে যে ঈশ্বর-মুখিনী করে, আত্মজয় সেই করে, রিপুজয় সেই করে, বিশ্বজয় সেই করে।

উপাসনা-কালে মনের গঠন

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—মনকে এমনভাবে গঠন ক'রে নাও, যেন উপাসনা-কালে পরমেশ্বরকে একেবারে প্রত্যক্ষ ব'লে সে বিশ্বাস করে। মনে ক'রো না যে পরমেশ্বর সাত সমুদ্র তের নদী পারে আছেন, ভাবতে যেয়ো না যে তিনি বায়ান্ন ব্রহ্মাণ্ড দূরে রয়েছেন। উপাসনা আরম্ভ করার আগে প্রশান্ত চিত্তে কতক্ষণ চিন্তা ক'রে নেবে যে, তিনি তোমার সমক্ষে আছেন, তোমার ইষ্ট তোমার কাছে বসে আছেন, তোমার নিঃশ্বাসের শব্দটী তিনি শুন্‌তে পান, তোমার প্রাণের নিবেদন তিনি বুঝতে পারেন, তিনি বধির নন। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ নিবিষ্ট মনে চিন্তা ক'রে নেবে যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সব-কিছু কত্তে পারেন, তোমার সকল পূর্ণতা-বিধান তাঁরই হাতে, তিনি কোনো ভক্তকে তার বাঞ্ছিত থেকে বঞ্চিত করেন না। ভেবে নেবে,—এক সঙ্গে তিনি হাজার লোকের প্রার্থনা শুন্‌তে পারেন, হাজার লোকের প্রার্থনা পূর্ণ কত্তে পারেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন। তার পরে উপাসনা আরম্ভ কর্ব্বে। উপাসনা-কালে মনকে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় থেকে সকল বস্তু থেকে টেনে আন্‌বে, ভাব্‌তে থাকবে, জগতে একমাত্র তুমি আছ আর তোমার উপাস্য আছেন। প্রতিবার পরমোপাস্যের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তোমার আপন হচ্ছেন, তুমি তাঁর আপন হচ্ছ। তোমার এই উপাসনা, তাঁতে আর তোমাতে নিত্য প্রেমের লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সাথে সাথে হুঙ্কার ক'রে নদী-স্বরূপ তুমি সমুদ্র-স্বরূপ পরমাত্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছ, প্রশ্বাস ত্যাগ

তোমার আত্মনিবেদন, তোমার আত্মসমর্পণ, তোমার আত্মাহুতি, মহাযজ্ঞে তোমার আত্মবলি। প্রত্যেকটী নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মধুময় নামের অমৃতময় ঝঙ্কার তু'লে তিনি তোমার বুকে মাথা রেখে প্রেম-নিবেদন কচ্ছেন, ভালবাসার বিচিত্র লীলা কচ্ছেন, তোমাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্ম্মল কচ্ছেন, তোমাকে ধন্য কচ্ছেন, তোমার জীবন যৌবন সার্থক কচ্ছেন, তোমার কোটি জন্মের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পূরণ কচ্ছেন, তোমার সবকিছু তাঁর নিজের জিনিষ ব'লে দাবী কচ্ছেন। এই মনোভাব নিয়ে, মনের এই গঠন নিয়ে উপাসনা ক'রো, দেখ্‌বে, শত জন্ম চীৎকারেও যা লাভ হয় না, দুদিনে তা' পেয়ে যাবে।

দীক্ষালাভের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবার এই উপদেশ-ভাষণের পরে স্থানীয় বহু ভদ্রলোক এবং ছাত্রদের মধ্যে দীক্ষালাভের জন্য একটা বিপুল ব্যগ্রতা দেখা গেল। জয়নগর, জয়পুর, টেটেশ্বর, কোলাপাড়া, কালীনগর, বিজয়পুর, মণিপুর, লুংথুং, বাবুপুর, দুব্‌লা-চাঁদ প্রভৃতি গ্রামের বহু দীক্ষার্থী সাধন-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। আবার অনেককে শ্রীশ্রীবাবা ফিরাইয়াও দিলেন। বলিলেন,—সত্য সত্যই সাধন কর্ব্বার জন্য যার চিত্ত ব্যাকুল, "সাধন ক'রে ভগবানকে লাভ কর্ব্ব"—এই সঙ্কল্প যার প্রকৃতই প্রবল, গুরুবাক্য মৃত্যুতেও লঙ্ঘন কর্ব্ব না এই প্রতিজ্ঞা যার সুদৃঢ়, দীক্ষালাভে সুধু তারই অধিকার।

সংসার ত্যাগ করিতে চাই

একটী যুবক আসিয়া প্রার্থনা জানাইল যে সে সংসার ত্যাগ করিতে চাহে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসার যে কি বস্তু, তা আগে বেশ ক'রে বুঝে নাও। ত্যাগ কত্তে হয়, তার পরে কর্ব্বে। যে বস্তুকে বুঝতে পার নি, তাকে এখন ঝোঁকের বশে ত্যাগ কল্লে'ও দুদিন পরে আবার চেখে দেখ্‌তে ইচ্ছা হবে।

সৎসঙ্গের অভাব দূরীকরণের উপায়

একটী যুবক বলিল,—সৎসঙ্গের অভাবেই জীবন গ'ড়ে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৎসঙ্গ সৃষ্টি ক'রে নাও। খুব ভাল ভাল গ্রন্থ, যা

পাঠ কর্ল্লে'ই সৎ হবার প্রেরণা জাগে, সাধন করার রুচি আসে, পরনিন্দাকে গর্হিত ব'লে বোধ জন্মে, এমন সব গ্রন্থ এনে তোমার চেয়ে কচি যাদের মন, জড় ক'রে রোজ বা সপ্তাহে দুদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প'ড়ে প'ড়ে শোনাও। মহতের জীবনী, তাপসদের কাহিনী, সাধকদের বাণী আলোচনা ক'রে শুনাও। ছোট ছোট সৎ-লোক সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা কর। ক্রমে দেখ্‌বে, চতুর্দ্দিকের দূষিত আবহাওয়া যেমন পরিষ্কার হচ্ছে, তেমন তোমার মনও নির্ম্মল হচ্ছে।

গুরুগিরির লোভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর ভিতরে একটা অবশ্য আশঙ্কার বিষয় রয়েছে। সেইটী হচ্ছে গুরুগিরির লোভ। তোমার চাইতে বয়সে বা বিদ্যায় যাঁরা বড়, তাঁদের এনে সৎকথা শুনাতে হ'লে ব্যক্তিত্বের যে অসামান্য প্রভাব দরকার, তা হয়ত তোমার না থাক্‌তে পারে, অথবা তারা হয়ত নিজ নিজ মিথ্যা অভিমানে আঘাত পেতে পারেন। তাই বাধ্য হ'য়ে তোমাকে ছোটদের মধ্যেই কাজ কর্ত্তে হবে। কিন্তু সৎকথা শুনাতে শুনাতে শেষে কারো কারো মনে হয় যেন সে একজন কেষ্ট-বিষ্টু হ'য়ে গেছে, শ্রোতারা সব তার শিষ্যস্থানীয়। এ ভাব বড় বিপজ্জনক। এতে আত্মগঠনের দারুণ বিঘ্ন জন্মায়। তাই, পরকে সৎকথা শুনাবার কালে, অপরকে সৎপথে চালিত কর্ব্বার সময়ে, অনুক্ষণ মনে রাখ্‌বে, এই শ্রমস্বীকারের মূলগত উদ্দেশ্য কি। সব সময় মনে রাখ্‌তে হবে যে নিজেকে গড়াই তোমার লক্ষ্য, পরকে সাহায্য করা উপলক্ষ্য মাত্র,—আত্মগঠনের জন্যই পরগঠনের প্রযত্ন।

অভ্যাসগত স্ত্রী-সম্ভোগ

স্থানীয় একজন ভূতপূর্ব্ব বর্ষীয়ান রাজকর্ম্মচারী স্বকীয় দাম্পত্য জীবনের এমন কতকগুলি গুরুতর সমস্যার কথা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে নিভৃতে নিবেদন করিলেন, যাহার সম্পূর্ণটুকু এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে যে সুবিস্তারিত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার অংশ মাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীসম্ভোগ যখন ভোগ-তৃষ্ণার তৃপ্তিরূপে না হ'য়ে

অভ্যাসের অন্ধ অনুসরণে পরিণত হয়, তখন শত যুক্তি, বিচার, বিতর্ক দিয়েও দেহকে শাসন করা অসম্ভব। এই অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক দূরত্ব-বিধান। পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে বা নিজে তীর্থাদি ভ্রমণে বহির্গত হ'য়ে চার ছয় মাস দূরে দূরে কাটিয়ে দেওয়ার পন্থাই উত্তম। এর সঙ্গে সঙ্গে আত্মজয় করার জন্য প্রাণপণে আধ্যাত্মিক সাধনও করা চাই। দূরে গিয়ে তারপরে স্ত্রীসম্ভোগের বিরুদ্ধে যত যুক্তি-বিচার-বিতর্ক কর্‌বে, সবই কাজে আস্‌বে, সবই মনকে দৃঢ় কর্ব্বে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও ভবিষ্যতে পবিত্র জীবন যাপনে সাহায্য করার জন্য প্রেরণা-পূর্ণ পত্রাদি দেবে।

ভোগবতী নারী ও ভগবতী নারী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নারীদের মধ্যে দুটা শ্রেণী আছে। একটা ভগবতীর থাক্, আর একটা ভোগবতীর থাক্। ভগবতীর থাকের মেয়েরা সহজে সংযমের আদর্শকে ধরে, সংযমের মহিমাকে অনায়াসে বোঝে এবং সামর্থ্যে কুলাক আর না কুলাক, স্বামীকে সাহায্য কত্তে চেষ্টা করে। ভোগবতীরা এর বিপরীত। শুক্রস্রাব হ'য়ে হ'য়ে স্বামী বেচারী মারা যাচ্ছে, কিম্বা যক্ষ্মা রোগ হ'য়ে অভাগা স্বামী প্রত্যহ রক্তবমন কচ্ছে, তবু তারা স্বামীকে রেহাই দিতে চায় না। এই রমণীরা নারীজাতির কলঙ্ক। স্বামীর বিন্দুমাত্র সংযম দেখ্‌লে এরা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়, অভিমানে সাতদিন মুখ বাঁকিয়ে থাকে। এই মেয়েগুলি আসল রাক্ষসী। এমন রমণীকে যারা বিয়ে করে, তাদের একটু দৃঢ়তা প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে। স্বামীকে সংযমী দেখে যদি পরনারী-রত ব'লে অপবাদও কীর্ত্তন করে, তবু কখনো এদের কথায় বাধ্য হ'তে নেই। দুদিন দশদিন, বিশ দিন এভাবে তাদিগকে প্রত্যাখ্যান কত্তে কত্তে আপনি তারা বুঝ্‌তে পারে যে অভিমানরূপ অস্ত্র এখানে নিষ্ফল। তখন তারা পথে আসে।

ভোগবতীর চরিত্র-পরিবর্ত্তনে সদ্‌গুরুর শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভোগবতীদের আমি গালমন্দ দিলাম সত্য, কিন্তু তাদেরও যে নিজ চরিত্রকে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নেই, তা নয়। ক্ষমতা আছে, কিন্তু বিকাশের পথ জানে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। সদ্‌গুরুর কৃপা এই বিকাশের

পথ খুলে দেয়। জগতের অনেক লালসাময়ী রমণী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা বাবা গম্ভীরনাথের মত গুরুর পাদস্পর্শ পাওয়া মাত্র একদিনে সব লালসা বর্জ্জন কত্তে সমর্থ হয়েছে। বিধবা হ'লে প্রত্যেক রমণী যেমন নিমেষে ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে ফেলে, সদ্‌গুরুর কৃপাতেও সেইমত হয়। তফাৎ এই যে বিধবার ইন্দ্রিয়-সংযমে' রস নেই, আনন্দ নেই, আছে প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা মাত্র, কিন্তু সধবার এই ইন্দ্রিয়-সংযমে রস আছে, আনন্দ আছে, অথচ প্রথার বাঁধন-কষণ কিছুই নেই।

ভোগবতীর চরিত্র-পরিবর্ত্তনের উপায়

ভদ্রলোক কতিপয় মাইল দূরবর্ত্তী কোনও মঠের এক ত্যাগী মহাপুরুষের শিষ্য। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাও ছুটে তোমার গুরুর কাছে। প্রাণের দুঃখ নিবেদন কর। বল, তোমার স্ত্রীকে তিনি কৃপা করুন। প্রার্থনা কর,—তিনি তোমার স্ত্রীকে অকুণ্ঠিত ভাবে সংযম বিষয়ে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করুন, তোমার স্ত্রীকে রুচি পরিবর্ত্তনে প্রেরণা দান করুন, জীবনের লক্ষ্য চিনে নিতে সাহায্য করুন। ত্যাগী গুরুর বজ্রতুল্য অব্যর্থ আশীষ নিয়ে এসে তারপরে লেগে যাও তীব্র সাধনে। স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে। পূজা কর একাসনে বসে, পুষ্পাঞ্জলি দাও দুজনে সমস্বরে মন্ত্র পাঠ ক'রে, আরতি কর উভয়ে একযোগে। এভাবে সাধন-পথে উভয়ের অভ্যাসের নৈকট্য, প্রাণের নৈকট্য সৃষ্টি কর। এ নৈকট্য সম্ভোগের নৈকট্যকে ক্রমশঃ শিথিল ক'রে দেবেই দেবে।

বিলনিয়া

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ পাইবার জন্য বহু জন-সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক। শ্রীশ্রীবাবা ব্রহ্মচর্য্য-সহায়ক কতিপয় আসন-মুদ্রা শিক্ষা দিয়া সংযম-বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান সমাপন করিয়াছেন, এই সময়ে হেডমাষ্টার প্রহ্লাদ বাবু আসিয়া

প্রার্থনা জানাইলেন, আজিকার প্রাতঃকালীন প্রসাদদান তাঁহার গৃহে হউক। শ্রীশ্রীবাবা গাত্রোত্থান করিলেন।

মানুষের চাষ

প্রহ্লাদ বাবুর কৃষিকর্ম্মের দিকে প্রবল অনুরাগ। নিজ বাসাখানার এক হাত পরিমিত ভূমিও তাঁর বৃথা পড়িয়া নাই, হয় কোনও শাকসব্জী নতুবা কোনও পুষ্পবৃক্ষ স্থানটী জুড়িয়া আছে। শ্রীশ্রীবাবা প্রহ্লাদবাবুর গৃহে পদার্পণ করিতেই একগুচ্ছ সুগন্ধি গোলাপ প্রহ্লাদবাবু শ্রীশ্রীবাবার শ্রীপাদোপরি অর্পণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা খুব আনন্দসহকারে প্রহ্লাদবাবুর বাগান দেখিতে লাগিলেন। একটী গাছের গোড়ায়ও ঘাস জন্মিতে পারে নাই, প্রহ্লাদবাবুর অধ্যবসায়ী হস্ত প্রত্যহ কুটাগাছটী পর্য্যন্ত বাগান হইতে কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— মানুষের চাষ এই প্রকার। জীবন-বৃক্ষের গোড়া থেকে অসৎসঙ্গের অসৎপ্রবৃত্তির কণাটুকু পর্য্যন্ত কুড়িয়ে নিকিয়ে দূরে ফেলতে হয়। একাজ যিনি কত্তে পারেন, তিনিই প্রকৃত চাষী, তিনিই সদ্‌গুরু।

গীতার ধর্ম্ম—জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের পূর্ণ সামঞ্জস্য

শ্রীশ্রীবাবার শুভাগমন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় দ্বিপ্রহরে নানা গ্রাম হইতে বহু বর্ষীয়ান্ পুরুষ ও যুবকেরা সমাগত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বেলা দুই ঘটিকা হইতে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত গীতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গীতার ধর্ম্ম—কর্ম্মযোগ। ভাগবতী-বুদ্ধি-বর্জ্জিত স্বার্থান্ধ জীবের কর্ম্ম নয়, ভাগবতী চেতনায় ওতঃপ্রোতচেতা নিষ্কাম পুরুষের কর্ম্মই গীতার লক্ষ্য। যে কর্ম্ম যোগের সাধক, যোগের অনুপূরক, যোগের প্রবর্দ্ধক, সেই কর্ম্মই গীতার লক্ষ্য। পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত, ভক্তি-জ্ঞানাদি-বিরহিত, তপস্যা ও শ্রদ্ধা-বর্জ্জিত কর্ম্ম গীতার লক্ষ্য নয়। তাই গীতার ধর্ম্মোপদেশে কর্ম্মপ্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান ও ভক্তির এত বড় উচ্চ অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে। ভগবানকে ভুলে কাজ করাও যেমন নিরর্থক, কর্ম্মকে বাদ দিয়ে জ্ঞান-সাধন বা ভক্তি-সাধনও তেমন নিরর্থক,—এই হচ্ছে গীতার মর্ম্মার্থ। জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমে বিরোধ নেই, সাধকের

স্তর-ভেদে একটী প্রধান অপর দুইটী অপ্রধান হ'তে পারে, কিন্তু তিনটীর পূর্ণ নামঞ্জস্যই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতার পরিচয়। অবশ্য, জ্ঞান ও ভক্তি যাঁদের মধ্যে যুগপৎ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, তাঁদের কর্ম্ম স্থূল জগৎকে ছাড়িয়ে সূক্ষ্মেও বিচরণ কত্তে পারে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অবলম্বন ক'রেই পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

ফেণী

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

সূর্য্যোদয়ের পরে বহু সমাগত যুবককে যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা প্রাতের ট্রেণেই ফেণী রওনা হইলেন।

প্রতি শব্দে ইষ্টনাম স্মরণ

দিবা আড়াই ঘটিকার সময়ে স্থানীয় গুহ-পরিবারের মহিলারা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ দর্শন-মানসে আগমন করিলেন। একজন মহিলা প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানকে পাই কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাণে ধ'রে টান্‌লে যেমন মাথাটা আপনি আসে, নাম ধ'রে টান্‌লে তেমন ভগবান এসে হাজির হবেন।

মহিলাটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁকে ডাক্‌বার কৌশল কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যখন যেভাবে যে শব্দটী শুন্‌তে পাও, তাতেই ইষ্টনাম স্মরণ কর। হাঁসের প্যাক্ প্যাক্ শব্দে, শিয়ালের হুক্কা-হুয়া শব্দে, পথ চলার ধুপ্ ধাপ শব্দে, রান্নার হাতাবেড়ির ঠন্‌ঠনানি শব্দে তোমার ইষ্টনামেরই ঝঙ্কার যেন উঠ্‌ছে, অবিরত এরূপ অনুভব করার চেষ্টা কর। অবিরাম যে শ্বাস-প্রশ্বাস চল্‌ছে, তার মধ্যেও নামের ধ্বনি খুঁজে বের কর। এই চেষ্টার মধ্য থেকেই ভগবানের সাক্ষাৎকার পাবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসে দ্বিত্বমূলক নামজপে উপাস্যের দ্বিত্ব কল্পনা

একটী মহিলা বলিলেন, তিনি কোনও গ্রন্থে হংসমন্ত্র জপের বিধি দেখিয়াছেন। মন্ত্রটীর এক অক্ষর শ্বাসে, অপর অক্ষর প্রশ্বাসে জপিতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তার মানে, পরমোপাস্যকে এখানে ভেঙ্গে দুই করা হয়েছে। এসব স্থলে লীলাময়ী মহাশক্তির নামাংশটুকু শ্বাসে আর লয়-স্বরূপ

পুরুষ বা মহাশিবের নামাংশটুকু প্রশ্বাসে জপ কত্তে হয়; শ্বাস গ্রহণকালে শক্তির, সৃষ্টির, পার্ব্বতীর বা রাধার চিন্তা কত্তে হয় এবং প্রশ্বাস ত্যাগকালে পুরুষের, লয়ের, শিবের বা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কত্তে হয়। এ সাধনে সাধক নিজে দ্রষ্টা হয়ে দূরে থেকে প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করে। এর চেয়েও রসমধুর একাক্ষর নামেরই শ্বাসে ও প্রশ্বাসে স্মরণ, কারণ শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগে একজনেরই অবিরাম স্মরণ হচ্ছে এবং তাঁর সঙ্গে প্রেমলীলা চল্‌ছে শ্রীরাধার বা পার্ব্বতীর নয়, সাধকের নিজের।

একার্থক নামজপে শ্বাসে ও প্রশ্বাসে রস-বৈচিত্র্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি যখন শ্বাসটী গ্রহণ কর্ব্বে, তখন জানবে, রসেশ্বর আরাধ্য দেবতা তোমার অন্তরে বিহার কচ্ছেন, তোমার সকল কামনা তৃপ্ত কচ্ছেন, তোমার সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষা তোমার নিজ গৃহে এসে পূরণ কচ্ছেন। তুমি যখন প্রশ্বাসটী পরিত্যাগ কর্ব্বে, তখন জানবে, রাসেশ্বর প্রেমময়ের বুকে তুমি নিজে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছ, সাধ-আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁর তৃপ্তিকেই নিজের তৃপ্তি জেনে তাঁর কোলে আত্মসমর্পণ কচ্ছ, নিজের মান, অভিমান, লালসা, বাসনা সব ইতি ক'রে দিয়ে তাঁর মাঝে নিমজ্জমান হচ্ছ। শ্বাস-গ্রহণে তুমি সকাম, প্রশ্বাস ত্যাগে তুমি নিষ্কাম, কিন্তু উভয় সময়েই তুমি প্রেমিক। এরূপ রসময় সুমধুর সাধনা জগতে আর কিছুই নেই।

ভগবানকে যে চায়, সে পায়

বৈকালিক ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইল। ইতিমধ্যে বহু জ্ঞানোপদেশ-লুব্ধ ব্যক্তি জমা হইয়াছেন।

সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ভগবানকে যে চায়, সে পায়। যে চায় না, সে পায়ও না।

ভগবান্‌কে চাহিবার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু চাওয়ার লক্ষণ কি? হা-হুতাশও নয়, মালা-ঝোলাও নয়। তাঁকে পাওয়ার যা বিঘ্ন, তাকে পরিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্পই তাঁকে

চাওয়ার লক্ষণ।

ভগবান্‌কে পাওয়ার বিঘ্ন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা। ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন ভগবান ছাড়া অন্য বস্তুতে আসক্তি, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্টপ্রবৃত্তি। ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে জীবন ধারণ বা কুপথে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা। ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন পরদারগমন, পরপুরুষ-গমন ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা। ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন ভগবানে অবিশ্বাস, তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তাঁর কৃপায় অবিশ্বাস, তাঁর শক্তিতে অবিশ্বাস, তাঁর মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস। ভগবানকে পাওয়ার বিঘ্ন নাম-যশের লোভ, অসহিষ্ণুতা এবং যৌগিক ঐশ্বর্য্যাদিতে মত্ততা। এ সব বিঘ্নগুলিকে বর্জ্জন কত্তে যে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছে, বুঝতে হবে, ভগবানকে সত্যি সত্যি সে চাচ্ছে। এসব বিঘ্ন বর্জ্জন ক'রে দিনান্তে যে একটীবার ভগবানের নামোচ্চারণ করে, তার ঐ একটীবার ডাকাতেই কোটিবার ডাকার ফল হয়।

যৌগিক বিভূতির বিপদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সব বিপদ কাটিয়ে যে এগিয়ে গেছে, তার শেষ বিপদ হচ্ছে যৌগিক বিভূতি। ভয় তুমি অসীম অধ্যবসায়ে দূর করেছ, ভূত, প্রেত, সিংহ, ব্যাঘ্র, মানুষ-অমানুষ সকলের ভয়কে তুমি অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করেছ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-অসম্মান, দণ্ড-মৃত্যুর ভয়কে তুমি পদতলে পিষে মেরে ফেলেছ, এখন তুমি পরমাত্মার অতি সন্নিকট। কিন্তু দৈব ঐশ্বর্য্য এসে এ সময়ে তোমাকে ভগবান থেকে কোটি যোজন দূর-পথে চালিয়ে দিতে পারে আপ্রাণ যত্নে তুমি পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্ট-বুদ্ধি, পরোপকার-চেষ্টা দূর করেছ, আপ্রাণ যত্নে তুমি জীবিকার্জ্জন থেকে অসত্য ও অধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করেছ, পরনারীতে মাতৃবুদ্ধি, পরপুরুষে সন্তানবুদ্ধি তুমি প্রতিষ্ঠিত করেছ, ইন্দ্রিয়কে তুমি শাসিত ও সংযত করেছ,—এই সময়ে তুমি ভগবানের চরণ-ছায়ার অতি কাছে। কিন্তু যৌগিক বিতিভূ এসে তোমাকে সেই সুশীতল

চরণচ্ছায়া থেকে কোটি জন্মের জন্য বঞ্চিত ক'রে দিতে পারে। এজন্যই প্রকৃত সাধকেরা ভগবানের কাছে চেয়েছেন দীনতা আর শুদ্ধা-ভক্তি, এই জন্যই যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিকেরা ঐশ্বর্য্যের সম্ভাবনাকে বিষভুজঙ্গের মত বিপজ্জনক জ্ঞান ক'রে কেবলি প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন এসব না দান করেন।

প্রকৃত প্রেমিক ও যৌগিক বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত প্রেমিক নিজের ভিতরে যৌগিক বিভূতির বিকাশ দেখ্‌লে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন যে, কি ক'রে একে গোপন করা যায়। কারো মনের কথা জানতে পারলেও, তাঁরা প্রকাশ করেন না। কারো রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা থাক্‌লেও তাঁরা ভগবানের উপ্‌রে ভার দিয়ে রাখেন। একই সময়ে তিনটী স্থানে স্বমূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেলেও ঘটনার বিষয় গুপ্ত রাখেন। ছোট থেকে বড় সকল রকমের অলৌকিক ব্যাপার অহরহ প্রত্যক্ষ ক'রেও সব খবর তাঁরা পেটের ভিতরেই পূরে রাখেন, বাইরে প্রকাশ পেতে দেন না।

পরমহংস ভোলানন্দ গিরির যৌগিক বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আধুনিক প্রসিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে ভোলাগিরি বাবার মধ্যে আশ্চর্য্য যৌগিক বিভূতির প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর শত শত শিষ্য এসব যৌগিক বিভূতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এসব প্রচার করার বিরুদ্ধে গুরুর কঠোর নিষেধ ছিল, তাই বাইরে কিছুই প্রকাশ পায় নি। যক্ষ্মারোগীর কঠিন রোগ নিজ শরীরে গ্রহণ ক'রে তাকে দীক্ষাদান তিনি অনেক ক্ষেত্রে করেছেন। সসর্পে গৃহবাস ক'রে তপস্যা তিনি অনেককাল করেছেন কিন্তু বিষধর সর্পেরা কিছুই তাকে বলে নি, নত শিরে পায়ের তলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বাইরে তাকে ভোগী, বিলাসী ব'লেই সবাই দেখেছে, হাতে পনের বিশ হাজার টাকা দামের হীরার আংটি, গায়ে বহুমূল্য সিল্কের জামা-কাপড় প্রভৃতির ভিতরে তিনি তাঁর যৌগিক বিভূতিগুলিকে সযত্নে লুকিয়ে রাখ্‌তেন।

মহাত্মা অচলানন্দ ব্রহ্মচারীর যৌগিক বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুনেছি অসামান্য যৌগিক বিভূতি ছিল মহাপুরুষ অচলানন্দ ব্রহ্মচারীর। কোথায় এই মহাত্মার জন্ম, কে কে এই মহাত্মার শিষ্য,

কোথায় তাঁর দেহের শেষ সমাধি, জগতে আজ পর্য্যন্ত কেউ তা জানতে পার্ল্ল না। এত বড় আত্মগোপনের শক্তি তাঁর ছিল যে তুলনা মেলা কঠিন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসী, পাতঞ্জলোক্ত যোগ-দর্শনের প্রতি অনাস্থাবান, তখন ঠাকুর অচলানন্দ কামাখ্যাতে একদিনের জন্য গোঁসাইজীকে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। গোঁসাইজী তাঁর কাছে যাওয়া মাত্র অচলানন্দ মাটির উপরে কতকগুলি ধান ছিটিয়ে দিলেন, সেই ধান তখনি অঙ্কুরিত হ'ল, সেই গাছে তখনি ধান ফলল, হাতের তালুতে তখনি ধান থেকে তুষ ছাড়িয়ে ভাত রেঁধে তিনি গোঁসাইজীকে অন্ন পরিবেশন কর্ল্লেন, গোঁসাইজী ত' দেখে অবাক্। অচলানন্দ একটা তুড়ি দিতেই বনের সব হিংস্র প্রাণী এসে তাঁর পা চাট্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল, আর এক তুড়িতে সবাই বনের দিকে প্রস্থান কর্ল্ল। গোঁসাইজীর মত একজন মহান্ পুরুষকে যোগশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন মনে ক'রেই তিনি তাঁর এই যৌগিক বিভূতি প্রদর্শন কর্ল্লেন। কিন্তু তারপরেই তিনি অন্য দেশে চলে গেলেন লোক-পরিচয়ের ভয়ে। তাঁর কয়েক-জন শিষ্য একবার তাঁকে ধর্‌লেন যে নিত্যদেহ জিনিষটা কি, তা বুঝিয়ে দিতে হবে। গুরু বল্লেন,—"আমার পা দুটো একটু টিপে দে দেখি বাপ-ধনেরা।" শিষ্যেরা পা টিপ্‌তে সুরু কর্ল্লেন, হঠাৎ দেখেন, পা-দুখানা কাচের মত স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে, পায়ের আকৃতি চখে বেশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু হাত কোথাও ঠেকে না, যেন এক ছায়ামূর্ত্তি। শিষ্যেরা বল্লেন,—"একি রঙ্গ! পা টিপ্‌তে বল্লেন, চ'খেও দেখ্‌তে পাচ্ছি চরণদ্বয় ঠিক্ আগের মতনই রয়েছে, অথচ হাতে ঠেক্‌ছে না।" অচলানন্দ বল্লেন,—"বাছাধনেরা না নিত্যদেহ কেমন তা' বুঝ্‌তে চেয়েছিলে?" এই মহাপুরুষের বহু লক্ষ শিষ্য সমগ্র ভারতের নানাস্থানে আছেন, অথচ গুরুর একখানা ফটো পর্য্যন্ত কেউ রাখ্‌তে পারেন নি, ফটো তুল্‌তে গিয়ে দেখা গেছে অন্য চেহারা উঠেছে। অসংখ্য শিষ্য তাঁর দৈবী বিভূতির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে পাদপদ্মে শরণ নিয়েছেন, অথচ গুরুর নাম-ধাম কিছুই জান্‌তে পারেন নি। দেহাবসানের পূর্ব্বে তিনি একটী মাত্র শিষ্যকে নিয়ে

মানস-সরোবরে গেলেন, একটী গহ্বরের মধ্যে দেহরক্ষা কর্ল্লেন, শিষ্য তাঁর আদেশমত আর একখানা পাথর চাপা দিয়ে চলে এলেন, গুরুবাক্য ছিল কারো কাছে এই স্থানটীর বিবরণ প্রকাশ না করা, ফলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণারাধ্য পুরুষের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুকে ভক্তোচিত সম্মান সহকারে অর্চ্চনা করার অধিকার পর্য্যন্ত কোনও শিষ্যের রইল না। এমন ভাবে আত্মগোপন করার ক্ষমতা যাঁদের, দৈবী বিভূতি তাদের কোনো অনিষ্ট কত্তে পারে না।

বাল্যকালের আরেক সাধুর যৌগিক বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার বাল্যকালের আর একজন সাধুর যৌগিক বিভূতির কথা বল্‌ছি। একটী আট বছর বয়সের ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে তিনি বল্‌লেন,—"তুই সমস্ত জগতের মা।" মেয়েটী চোখ বুঝে একথা ভাব্‌তেই তার দুই স্তন বেয়ে দুগ্ধক্ষরণ হ'তে লাগ্‌ল। আর একটী মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন,—"তোর ইষ্টদর্শন হচ্ছে।" অমনি মেয়েটীর চখের সাম্‌নে মহা-মেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি জেগে উঠ্‌ল, মেয়েটী ভয়ে আর্ত্তনাদ কত্তে লাগ্‌ল। আর একটী মেয়ের চখে হাত দিয়ে বল্লেন,—"তুই অন্ধ হয়ে গেলি," তৎক্ষণাৎ মেয়েটীর দৃষ্টিশক্তি চ'লে গেল। দু-তিন ঘণ্টা পরে যখন বল্লেন,—"তোর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল", তখন তখনি সে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সব জিনিষ স্পষ্ট দেখ্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। একটী ছেলেকে কোলে নিয়ে বল্লেন,—"সমগ্র জগৎ তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্," অমনি সে নর্থ সাইবেরিয়ার পারদের খনির সব খবর বল্‌তে আরম্ভ কল্ল, যে খবর একমাস পরে খবরের কাগজে বেরুল। এ রকম অল্প-বিস্তর যৌগিক বিভূতির বিকাশ প্রায় সব সাধকের মধ্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যিনি হজম কত্তে পারেন, তিনি ভগবানকে পান, যিনি পারেন না, তিনি সংসার-মোহে ডুবে মরেন।

অজ্ঞাত-পরিচয় ফকীরের যৌগিক বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার বাল্যকালে একজন ফকীরের আশ্চর্য্য দৈবী বিভূতির কথাও শুনেছি, যার গল্প শুন্‌লে সাধারণ লোকের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন। ইনি লেংটা থাক্‌তেন, কাপড় পরতেন না, কৌপীনও ধারণ করতেন

না, গায়ে কখনো কখনো একটা কাঁথা জড়িয়ে রাখ্‌তেন, কখনো গোময় বা মনুষ্য-মল সমগ্র শরীরে মেখে থাক্‌তেন। এর পূর্ব্ব-পরিচয় কেউ জান্‌ত না, কিন্তু লেংটা থাক্‌তেন ব'লে লোকে "লেংটা ফকীর" ব'লে ডাক্‌ত। আমি তাঁকে "লেংটা ফকীর" বলে ডাক্‌ব না, কারণ এই নামে আরও কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ নানাস্থানে ছিলেন। এঁকে আমি শুধু "ফকীর" ব'লেই গল্পটা ব'লে যাব। ফকীরের গায়ে বিষ্ঠা দেখে যারা ঘৃণা ক'রে দূরে চ'লে যেত, সারা দিন তাদের নাক থেকে আর বিষ্ঠার গন্ধ দূর হ'ত না; যারা বিষ্ঠাকে গ্রাহ্য না ক'রে কাছে এসে বস্‌ত, তারা সারাদিন নাকের কাছে সুগন্ধ টের পেত; যারা ফকীরকে গিয়ে আলিঙ্গন ক'রে ধর্‌ত, তাদের গায়ে চন্দন লাগ্‌ত, বিষ্ঠা লাগ্‌ত না। হাতে একটা মাটীর ঢেলা নিয়ে সমাগত লোকদের ফকীর বল্‌তেন,—"খা, খা।" যারা হাত পেতে নিত, তারা কেউ পেত সন্দেশ, কেউ পেত একটা বেলফুলের মালা, কেউ পেত কতকগুলি তুলসী পাতা। আমার এক ভ্রাতার উপনয়ন, হাজার দুই ব্রাহ্মণ আহারে বসেছেন, এমন সময় প্রবল ঝড় এল, ব্রাহ্মণদের ভোজন পণ্ড হবার জোগাড়। আমার পিতামহ ত' অধীর হয়ে পড়্‌লেন। সৌভাগ্যক্রমে ফকীরও এসে হাজির। ঠাকুরর্দ্দা তাঁকে ধ'রে পড়্‌লেন। ফকীর বল্লেন,—"কাঠ আন্‌।" পুঞ্জীকৃত কাঠ এল। লাউ ঝাঁকার নীচে কাঠ সজ্জিত হ'ল। ফকীর হাতে তালি দিতেই বিনা দেশালাইতে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, ধূমরাশি আকাশ স্পর্শ কর্ল্ল, ঝড় থেমে গেল, বৃষ্টি থেমে গেল, সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে রইল,—এইমাত্র। লাউঝাঁকার উপরে মস্তবড় লাউ-এর লতাগুলি ছড়িয়ে আছে, সেগুলি ভেদ ক'রে আগুন উঠ্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লাউ গাছের একটী পাতাও পুড়্‌ল না বা বিবর্ণ হ'ল না! রাত বারোটার সময়ে সকলের আহারাদি শেষ হ'য়ে গেলে লাউ-ঝাঁকার নীচে কাঠ দেওয়াও বন্ধ হ'ল, ঝর্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টিও চল্‌ল তিন দিন পর্য্যন্ত। এই রকম ক্ষমতা ছিল এই ফকীরের। কিন্তু এসব বিভূতি মহা-তপস্বীরও বিপদের কারণ হয়। লোকমান বাড়্‌তে বাড়্‌তে শেষে এই ফকীরের মনে শয়তান এসে বাসা কর্ল্ল, নানা আসক্তি ও লালসা তাঁকে

পেয়ে বস্‌ল, এক জায়গায় শেষে তাঁর পরম ভক্তেরাই তাঁকে ধ'রে দারুণ প্রহার ক'রে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষ, কাঠের মালা, হাড়ের মালা, হাতের নরকপাল এসব কেড়ে নিয়ে পায়খানার মধ্যে ফেলে দিল। যৌগিক বিভূতি আর তার কোনও সাহায্যে এল না, ফকীর চম্পট দিলেন। ভেবে দেখ, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

শুদ্ধা ভক্তি চাই

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই, এসব দৈবী বিভূতি যেন অন্তর কখনো না চায়, তার জন্যই প্রত্যেক সাধকের সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। যাতে যশ হ'তে পারে, লৌকিক প্রতিপত্তি হ'তে পারে, তার জন্য চিত্ত যেন তিল মাত্রও ব্যগ্র না হয়, এই বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই। প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞানে বর্জ্জন না কল্লে জীবের বন্ধন-দশা ঘুচ্‌তে পারে না। তাই চাই শুধু শুদ্ধা ভক্তি, চাই শুধু নিষ্কাম প্রেম। প্রেমরূপ মহারত্ন যিনি লাভ করেছেন, প্রতিষ্ঠারূপ তামার পয়সায় তার লোভ থাকে না। লোক-সমাজে কাজ কত্তে গেলে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, একথা সত্য। কিন্তু লোক-সমাজে কাজ করাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় কথা নয়। লোক-সেবাকে নিরন্তর ভগবৎ-সেবার অনুগত রাখা চাই। আত্ম-স্বার্থপর ব্যক্তি যে পশুতুল্য, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির যে দাস, সে পশুরও অধম ব'লে নিন্দিত হয়েছে। মানুষের জীবনের সার্থকতা ভক্তিলাভে, লোকমানলাভে নয়।

রাত্রি বারোটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবা নয়ানপুর হইয়া রহিমপুর রওনা হইলেন।

রহিমপুর,

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

বৃহস্পতি-সম্মিলনীর সার্থকতা

প্রায় বেলা বারোটায় শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর পৌছিলেন। প্রতি বৃহস্পতি-বারেই শ্রীশ্রীবাবার আশ্রিত সন্তানেরা একত্র মিলিয়া উপাসনা করেন এবং উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করেন। শ্রীশ্রীবাবা যখন

অনুপস্থিত থাকেন, তখন উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবার উপদেশাবলি আলোচিত হয়। শুধু রহিমপুর গ্রামেই নয়, যে সব গ্রামে দুই-চারিটী করিয়া যথার্থ ভক্ত আছেন, সেই সব গ্রামেই এই নিয়মটী পালনের চেষ্টা হইয়া থাকে। বলিতে গেলে প্রায় আপনা আপনিই এই সুনিয়মটী প্রচলিত হইয়াছে। এ জন্য শ্রীশ্রীবাবা প্রায়শঃই বৃহস্পতিবার দিন আশ্রমের বাহিরে থাকেন না।

আজ সন্ধ্যায় সকলে সমবেত হইলে উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু। দেবতা মানে জ্ঞানের শক্তি, লোক-কল্যাণের শক্তি। বৃহস্পতি এই শক্তির উৎস-স্বরূপ। বৃহস্পতিকে একটা ব্যক্তিবিশেষ ব'লে মনে ক'রো না, পরমাত্মার জ্ঞান-বিতরণী প্রতিভাকেই বৃহস্পতি নাম দিয়ে উপলক্ষিত করা হয়েছে। দেবতা বল্‌তে দৈত্যদের সহিত সংগ্রামরত কতকগুলি ব্যক্তি বুঝ্‌তে যেয়ো না, জ্ঞানের দীপ্তিতে যারা দীব্যমান হয়, তাঁরাই দেবতা। বিশ্বাস কর, তোমরা দেবতা, জ্ঞানই তোমাদের উপজীব্য বস্তু, জ্ঞানার্জ্জনই তোমাদের জীবনের পরম সার্থকতা, যে জ্ঞান জন্ম-মরণ-রহিত করে, জরা-ব্যাধিকে ব্যর্থতা দেয়, সংশয়-সন্দেহকে নির্ব্বাসিত করে, পরদুঃখ নিবারণ করে, সর্ব্ববন্ধন মোচন করে, ত্রিলোককে সৌভাগ্য-পূর্ণ করে, সেই জ্ঞান। এই সম্মেলন তোমাদের এই জ্ঞানাহরণ-প্রবৃত্তিকে নিয়ত প্রবর্দ্ধিত করুক, এজন্যই বৃহস্পতিবারে এর অধিবেশন।*

ধ্যান হইতেই জ্ঞান আসে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু জ্ঞান আসে কোথা থেকে? পরমাত্মার অবিচ্ছেদ ধ্যান থেকেই জ্ঞানের স্ফূরণ হয়, ধ্যান থেকেই সে রামধনুর মত অপরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে ওঠে।

---

*পরবর্ত্তী সময়ে কোথাও কোথাও সপ্তাহে দুইবার সমবেত উপাসনার প্রচলন হইয়াছে। বিশ্বমঙ্গলার্থে এই অনুষ্ঠান বলিয়া মঙ্গলবারেও সমবেত উপাসনা হইতেছে। মঙ্গলবারেই শ্রীশ্রীবাবার পার্থিব দেহ ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া মঙ্গলবারটী তাঁহার সন্তানগণের নিকট সমধিক আদরের হইয়াছে। যে সব গ্রামে কোনও বিশেষ অসুবিধাজনক কারণ বশতঃ বৃহস্পতিবারে সমবেত উপাসনা সম্ভব হয় না, সে সব গ্রামে আজকাল মঙ্গলবারেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইতেছে।

রহিমপুর
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

আশ্রমে শেষ রাত্রে উঠিবারই বিধি। বিশেষ জরুরী কারণ না হইলে, এই বিধি সকলেই প্রতিপালন করে এবং স্নান-ধ্যান সমাপন করিয়া বিদ্যার চর্চ্চা করে। কারণ সূর্য্যোদয়ের পরেই প্রত্যেককে কৃষিকর্ম্মে যোগ দিতে হয়। অদ্যও সেই বিধি প্রতিপালিত হইয়াছে।

আশ্রমীর জীবন গঠন

তৎপর আশ্রমীরা কৃষি-কর্ম্মে যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কৃষি-ক্ষেত্রে গিয়ে কাজ নেই, সব চুপ ক'রে ঘরে বস গিয়ে। ভগবানকে লাভই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। অন্তরে বিচার কর, এতদিন যে কত কোদালই মার্‌লে, ভগবানের দিকে এগুলে কতখানি। যা কর্‌লে ভগবানকে মিলে, তাই তোমাদের লক্ষ্য হোক্। বাইরের লোকের করতালি যেন তোমাদিগকে পথচ্যুত না করে, সহস্র জনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যেন তোমাদিগকে ব্রতচ্যুত না করে, প্রতিষ্ঠা ও যশঃসম্বর্দ্ধনা যেন তোমাদিগকে লক্ষ্যচ্যুত না করে। কোদাল ত' ঢেরই মেরেছ, এখন কিছুকাল আত্ম-অনাত্ম বিচার ক'রে দেখ, নিত্য-অনিত্য হিসাব ক'রে দেখ, দেহ ও আত্মার পার্থক্যের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ এবং সেই বিচারের, সেই হিসাবের, সেই নিরীক্ষণের ফলাফলকে ওজন ক'রে বুঝে নাও। আশ্রম যখন অযাচকের, তখন একদিকে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এবং যুগটা যখন নিতান্ত তামসিক, তখন অপর দিকে লোক মধ্যে সদ্দৃষ্টান্তের স্থাপনোদ্দেশ্যে তোমাদের পরিশ্রম স্বীকার কত্তেই হবে, কিন্তু সেই শ্রম যেন নিরর্থক শ্রম না হয়। পশ্চাতে যদি না থাকে উচ্চ উপলব্ধির সমর্থন, তা'হলে জগতের সকল শ্রমই পণ্ডশ্রম। শ্রমবিরহিত অলস জীবন যাপনের নাম আশ্রম-জীবন নয়, কিন্তু কি শ্রমে, কি বিরামে, কি সুদীর্ঘ বিশ্রামে সর্ব্বসময় অন্তরের অন্তঃস্থলে উচ্চতম, শ্রেষ্ঠতম, মঙ্গলতম, সুন্দরতম, স্থায়িতম উপলব্ধিকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে আশ্রমীর জীবন-গঠন।

সম্প্রদায় গড়িতে চাহি না কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী

এই সময়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া প্রবল বারিপাত আরম্ভ হইল। সুতরাং কৃষি-কর্ম্মে আর কাহারও যাইবার উপায়ও রহিল না। প্রত্যেক আশ্রমী নিজ নিজ আধ্যাত্মিক কার্য্যে রত হইলে একজন আশ্রম-সেবক শ্রীশ্রীবাবার পত্রাদি লিখায় সাহায্য করিতে লাগিলেন।

পত্র লিখার মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সম্প্রদায় গড়্‌বার মতলব আমার কখনো ছিল না বা আজও নেই। ভবিষ্যতেও কখনো যে সম্প্রদায় গড়্‌তে আমি চেষ্টা কর্ব্ব, এমন আমার মনে হচ্ছে না। কিন্তু তবু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, তোমাদের একটা সম্প্রদায় আপনিই গ'ড়ে উঠ্‌বে। আমি নিষেধ ক'রেও হয়ত তার গড়নকে প্রতিরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারব না। কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ের গড়নই জগতকে লাভবান্ করে না, যদি সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ মানব-মানবী তপস্বী না হয়, সাধক না হয়, সহিষ্ণু না হয়, সংযমী না হয়, সৎ না হয়। ষড়যন্ত্র-পরায়ণ, কলহ-রত, অনুদার ও কুটিল ব্যক্তিদের সম্প্রদায় জগতের দুঃখভারই বর্দ্ধন করে। শক্ত একটা সম্প্রদায় খুব শক্ত শক্ত লোকদের আত্মত্যাগের দ্বারাই গঠিত হতে পারে।

অখণ্ডদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সবর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহ, কোনটাই পূর্ণমঙ্গলের কারণ নয়, যদি ভগবানকে লাভের জন্য তা না ঘটে। ভগবানকে লাভের যদি অনুকূল হয়, তবে আমি অসবর্ণ বিবাহের একটুকুও বিরোধী নই। মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে মুমুক্ষু পত্নীই প্রয়োজন। যার সঙ্গে বিবাহের চল নেই, এমন বংশে যদি তেমন পাত্রী মিলে, তবে তাকে উপেক্ষা করা আর ভগবানকে উপেক্ষা করা এক কথা। বিবাহ যার প্রয়োজন এবং যোগ্যা পাত্রী যার প্রয়োজন, সে যোগ্যতাই সর্ব্বাগ্রে খুঁজে দেখ্‌বে। ভবিষ্যতের অখণ্ডদের মধ্যে এই কারণে যদি অসবর্ণ বিবাহের বিপুল প্রচলন ঘটে, তবে তাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হব না।

ত্যাগেচ্ছুকা কুমারীদের আশ্রম ও আশ্রম-বাসান্তে বিবাহ

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক ত্যাগেচ্ছুকা কুমারী মেয়ে

তাদের উপযোগী আশ্রমের মধ্যে জীবন-গঠন কত্তে ছুটে আস্‌বে। এদের মধ্যে অনেকেই আমৃত্যু ত্যাগেরই তপস্যা কর্ব্বে। অনেকের পক্ষে জীবনটাকে বেশ শক্ত-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার পরে উপযুক্ত সহযাত্রী খুঁজে নিয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হবে। এই কারণেও অনেকস্থলে অসবর্ণ বিবাহ অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়্‌বে। প্রত্যেক অখণ্ড পুরুষ ও নারীকে এই বিষয়ে আমি তাদের বিবেকানুযায়ী চল্‌বার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিচ্ছি। অসবর্ণ বিবাহের আমি বিরোধী নই, যদি তার প্রাণ থাকে ভগবৎ-সাধনে।

নির্ভরই যথার্থ শক্তি

কলিকাতা প্রবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নিজ কাজ নিরুদ্বেগ-চিত্তে করিয়া যাও। পরমেশ্বর-প্রদত্ত সুখ-দুঃখে নিজের দায়িত্ব সংযোগ করিয়া চঞ্চল অধীর হইও না। তোমাকে তিনি যতটুকু কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার সবটুকু দিয়া তাঁর অভিপ্রায়ের সেবা কর। ঘটনার সংঘাত যখন যে সমস্যারই সৃজন করুক, আত্মহারা না হইয়া যোগস্থ চিত্তে তাহার সমাধান কর। প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে নিত্যচৈতন্যময় পরমাত্মার পরমসুখপ্রদ সঙ্গ করিয়া দুঃখ, দৈন্য ও দুর্গতির চিরাবসান কর। নিয়ত প্রার্থনা কর,—

"নামে ঘিরে রাখ প্রভো
জীবন আমার,
নয়নে বহাও ঝরঝর
শত ধার ॥
যত কিছু মলিনতা,
কপটতা, মনোব্যথা,
প্রেমের অনলে পুড়ে
কর ছারখার ॥
কাটিয়া ফেলহ মোর
কঠিন বাঁধন-ডোর,

আঘাতে করহ চূর
মোহ-কারাগার।
সকরুণ আঁখিপাত
করহ করহ নাথ,
প্রাণে প্রাণে দিবারাত
রহ আপনার

"তোমার নির্ভরের ভাব আমাকে আনন্দ দিয়াছে। নির্ভরই যথার্থ শক্তি, নিশ্চিন্ততাই যথার্থ শান্তি, বিশ্বাসই বুকের সাহস।

"আমার প্রভুর দয়া সে যে
সকল জনার চিত্তহরা,
মন-ভুলান, প্রাণ-জুড়ান,
সকল ভুবন পাগল-করা।
পাও যদি সেই দয়ার লেশ
ভুল্‌বে সকল দুঃখ ক্লেশ,
ভুল্‌বে ব্যথা, শোকের কথা,
ভুল্‌বে মরণ, ভুলবে জরা।
পাপী ব'লে ঠেলবে নারে,
ডাক্‌বে কাছে বারে বারে,
এক পা যদি যাও পিছিয়ে
সাম্‌নে এসে দেবে ধরা ;
তাই ত' তাঁরে প্রভু বলি,
তাই ত' সে মোর জীবন-ভরা।
পতিত-পাবন প্রভু আমার,
নিত্য-শরণ অনাথ জনার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ আদি
তাইতে যে তাঁর চরণ-ধরা ;
ত্রিশ কোটি দেব তারা জানে
প্রভু আমার সবার সেরা।"

শ্রেষ্ঠের দায়িত্ব

শ্রীহট্ট-ছাতক নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ছোটকে বড় করিয়াই বড়র বড়ত্ব। ছোটকে চিরকাল ছোট রাখিতে গিয়া বড়ও ছোটই হইয়া যায়। এই কথার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য তোমাকে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে হইবে না। তুমি যে দেশে, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উন্মীলিত চক্ষে সেই দেশ ও সেই সমাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কথাটী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। বড়রা কেবলই ছোট হইয়াছে, ছোটরা বড় হইবার পথ না পাইয়া আরও ছোট হইয়াছে, এইভাবে এই দেশের ও এই সমাজের দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, জীবত্ব ক্রমশঃ শূন্যাভিযাত্রী হইয়াছে। যিনি বৃহতেরও বৃহৎ, মহতেরও মহৎ, শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, উচ্চেরও উচ্চ, সেই পরমমহান্ শ্রীভগবানের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আজ সকল ছোটকে সকল বড়কে অপর বড়'র বা অপর ছোট'র প্রতি দৃষ্টিপাতহীন হইয়া অগ্রসর হইতে প্রেরণা দাও। ইহাই তোমার এই সময়ে জীবনের পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। তুমি যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াছ, এযুগে তাহা বড়াই করার বিষয় নহে, এযুগে তাহা অতি বিষম, অতি দারুণ, অতি ভীষণ এক দায়িত্ব। শ্রেষ্ঠের ঘরে জন্মিয়াছ বলিয়াই আজ সকলকে শ্রেষ্ঠতমের পথে চলিবার প্রেরণা যোগাইতে তুমি বাধ্য, তুমি দায়ী। তোমার এ দায়িত্ব যদি তুমি যথোচিত তৎপরতার সহিত স্বীকার করিয়া না লও, তাহা হইলে তোমার সমূল উচ্ছেদকে এ জগতে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।"

প্রভুর আদেশের পায়ে নিজেকে বিলুপ্ত কর

কিশোরগঞ্জ-নিবাসিনী জনৈকা ভক্তিমতী মহিলার নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নামের সমুদ্রে নিয়ত ডুবিয়া থাক। তাঁর মধুময় নাম তোমার সুখ-দুঃখের চেতনা ভুলাইয়া দিক। পরমপ্রভুর মহান্ আদেশের পায়ে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে সংসারের অজস্র দুঃখ-বর্ষণ নীরবে

নির্ভয়ে সহিয়া যাও। দুঃখ, বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা সবই মা তাঁর অফুরন্ত কৃপার দান।"

দুঃখ-দুশ্চিন্তা জয়ের কৌশল

কলিকাতা নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নির্ভর করিয়া নিজেকে পরমপ্রভুর পায়ে ফেলিয়া দেওয়াই জগতের সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা জয়ের প্রকৃষ্টতম কৌশল।"

শক্তিশালী সঙ্ঘের জন্ম কোথায়

উক্ত ভক্তের পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"দেহ-মন-প্রাণ ইষ্টদেবতার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়াই সাধক সর্ব্বজয়ী হয়। একই ইষ্টকে লক্ষ্য করিয়া বহুজন যখন আত্ম-সমর্পণের সাধনা আরম্ভ করে, তখনই জগতে শক্তিশালী সঙ্ঘের সূচনা হয়। নীরবে নিভৃতে আত্মোৎসর্গের সাধনা আরও অনেকে করিতেছেন। সকলের একত্র সম্মেলন সাধনার গভীরতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আত্মহারা ধ্যান দূর-দুরান্তরকে নিকট করিবে, সহস্র বিভিন্নতাকে ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া এক অখণ্ড জীবন-স্পন্দনে রূপান্তরিত করিবে। তপস্যা যতক্ষণ তরল ও অগভীর, ততক্ষণ ইহা সমসাধকের হৃৎস্পন্দনের সহিত সমতালে চলিতে অক্ষম। তপস্যা যখন গভীর ও প্রগাঢ়, অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগাযোগে সহস্র প্রাণ তখন একপ্রাণ হইবে, সহস্র চিত্ত একচিত্ত হইবে, সহস্র দেহ একদেহ হইয়া ধ্যানগম্য আদর্শকে মূর্ত্তি দানে নিয়োজিত হইবে, সহস্র আত্মা এক আত্মায় পরিণত হইবে। অত্যাশ্চর্য্য সুবিশাল সঙ্ঘ অদূর ভবিষ্যতে আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্ম হইবে, এখন হইতেই ইষ্টের জন্য সর্ব্বকামনার সাহ্লাদ বিসর্জ্জনের একাগ্র তপস্যায়।"

শ্রদ্ধার দান ও চুক্তি

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা বেড়াইতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার পোদ্দারের সহিত দান-বিষয়ে আলোচনা উঠিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শ্রদ্ধা বস্তুটা যুক্তি-তর্কের বাইরে। শ্রদ্ধার দান চুক্তিহীন দান। চুক্তির দান আমি গ্রহণ করি না।

অতিথি-সেবা

আশ্রমে আসিয়া অপর একজনের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতিথিকে অন্নদানের মত পুণ্য নেই। কি গার্হস্থ্যাশ্রম, কি অপর আশ্রম, সর্ব্বত্রই অতিথি-সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করা উচিত। শাস্ত্রে আছে, যে গৃহস্থের গৃহ থেকে অভুক্ত অবস্থায় অতিথি ফিরে যায়, নিজের পাপটুকু তার ঘরে রেখে তার পুণ্যটুকু সে নিয়ে যায়। অভুক্ত, নিরাশ্রয়, আর্ত্ত অতিথিকে যে ফিরিয়ে দিতে পারে, তাকে আর একটা হৃদয়হীন পশুকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

দয়া কখন পাপ

সান্ধ্য ধ্যানে বসিবার আগে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের এক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন,—দয়া যদি তোমার আজীবন-ব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ কত্তে চায়, তবে দয়াকেও পাপ ব'লে জান্‌বে। পরদারলোভী লম্পট মৃত্যুকালে ব্যাকুলভাবে শুশ্রূষারতা পতিব্রতা পরনারীকে বল্‌ছে,—"দেখ, একটী চুমো পেতে দাও, তা হ'লে আমি সুখে মরতে পারি।" সতী নারী এমন স্থলেও দয়া কত্তে পারে না, মুমূর্ষুর অনুরোধ রক্ষা কত্তে পারে না। তুমি বল্‌বে,—"মৃত্যুকালে শান্তিদান এক মহৎ পুণ্য", আমি বল্‌ব,—"নিজের জীবনব্যাপী সাধনার সাথে চিত্তের সহস্র বিরুদ্ধ আবেগ সত্ত্বেও লগ্ন হ'য়ে থাকা তার চেয়ে বড় পুণ্য।" কামাতুরা রমণী কিছুতেই নিজেকে দমন কত্তে না পেরে তোমার কাছে প্রেম-যাচ্ঞা নিয়ে উপস্থিত হ'ল, একটীবার তার মুখপানে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালে সে ধন্য হয়ে যায়, কিন্তু যদি ব্রহ্মচর্য্যই তোমার জীবনের ব্রত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তার প্রতি তুমি নিষ্কাম চিত্তেও দয়া প্রদর্শন কত্তে পার না। শাস্ত্রে আছে, কামার্থিনী নারীর প্রার্থনা পূরণে পুণ্য এবং অপূরণে অধর্ম্ম হয়, কিন্তু এ প্রার্থনা পূরণে যা পুণ্য হয়, ব্রত-পরিহারে তার চেয়ে বেশী পাপ হয়। আর এ প্রার্থনা অপূরণে যে অধর্ম্ম হয়, ব্রতরক্ষায় তার চেয়ে বেশী ধর্ম্ম হয়। দয়া পরম ধর্ম্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার জীবনের চরম সাধনার অবিরোধীভাবে তার অনুশীলন করা চাই, তবেই তুমি যথার্থ দয়ালু।

সেবক বলিলেন,—মৃত্যুকালে কারো প্রার্থনা পূরণ না করা কিন্তু বড়ই

নির্দ্দয়তা ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নির্দ্দয়তা নিশ্চয়ই। কিন্তু নির্দ্দয় না হয়েই বা উপায় কি? রোগের যন্ত্রণা সহ্য কত্তে না পেরে যদি কোনও রোগী তাড়াতাড়ি শান্তি পাবার জন্য শুশ্রূষাকারিণীকে বলে "বিষ দাও", মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কি সে দয়া ক'রে বিষ দিতে পারে?

মোচাগড়া,
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

অদ্য দ্বিপ্রহরের কিছু পর শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর আশ্রম হইতে মোচাগড়া শ্রীযুক্ত গদাধর দেব মহাশয়ের গৃহে আসিয়াছেন। সকলের মধ্যে একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

আনন্দই ভগবানের স্বরূপ

কয়েকটী মহিলার প্রতি চাহিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁকে দেখ্‌লে আনন্দ হয়, যাঁর কথা শুন্‌লে আনন্দ হয়, যাঁর বিষয় ভাব্‌লে আনন্দ হয়, জান্‌বে তিনিই ভগবান্। কারণ, ভগবান্ আনন্দস্বরূপ, আনন্দই তাঁর চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। যাঁকে দেখ্‌লে আংশিক আনন্দ হয়, জান্‌বে তাঁর ভিতরে অংশ-রূপে ভগবান রয়েছেন; যাঁকে দেখ্‌লে অফুরন্ত আনন্দ হয়, জান্‌বে, তাঁর ভিতরে ভগবান্ অফুরন্তরূপে রয়েছেন। তোমাদের দেখ্‌লে আমার আনন্দ হয়, তাই জানি, তোমরা আমার ভগবান্; আমাকে দেখ্‌লে তোমাদের আনন্দ হয়, তাই বলা চলে, আমি তোমাদের ভগবান্। কিন্তু মা, যাঁকে দেখ্‌লে পূর্ণ আনন্দ জন্মে, তিনিই পূর্ণ ভগবান। পূর্ণ ভগবানেই তোমাদের লক্ষ্য হোক্, তাঁকে নিয়েই জন্মকর্ম্ম সার্থক কর।

গ্রাম্য দলাদলি দূর করিবার উপায়

গ্রামের যুবকেরা সব আসিয়া জুটিলে মহিলারা প্রস্থান করিলেন।

একটী যুবক প্রশ্ন করিল,—রহিমপুর আশ্রমের উৎসব উপলক্ষে আপনি নিজ হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন, "গ্রামের শত্রু দলাদলি।" গ্রাম থেকে দলাদলি দূর করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্‌লে আর মানুষের দলাদলির

রুচি থাকে না। পরমেশ্বরের মুখপানে তাকিয়ে পথ চল্‌তে শিখ, আত্মাভিমান আর কর্ত্তৃত্বলোভ তোমার কাছও ঘেঁষতে সাহস পাবে না। দলাদলির মূলই ত' হচ্ছে এই দুইটী চীজ।

সস্ত্রীকের প্রতি উপদেশ

একটী যুবক তাহার দাম্পত্য জীবনের কয়েকটী সমস্যা নিবেদন করিয়া উপদেশ চাহিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন মাঝে মাঝে ত' বিপথে যেতে চাইবেই। তখন ভাব্‌বে, এই রমণীর মধ্যে সমগ্র জগতের মাতা বিরাজমানা।

সহস্র কর্ম্মের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ পাইবার উপায়

অপর একটী জিজ্ঞাসুকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সহস্র কর্ম্মের মাঝে মাঝে মনটাকে একেবারে অবসর ক'রে নেবে, সকল কর্ম্ম থেকে, কর্ম্মের আসক্তি থেকে, কর্ম্মের উদ্বেগ থেকে একেবারে নির্লিপ্ত ক'রে নেবে। তাতে অনন্তের স্পর্শ পাবে। বড় বড় সহরে চৌতালা পাঁচতালা দালান, বায়ু খেল্‌তে পায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে যে পার্কগুলি আছে, একেবারে ফাঁকা, তাতে অনন্ত আকাশের স্পর্শ আছে, তাই বায়ুহিল্লোল জীবনপ্রদ স্নিগ্ধতা বিতরণ ক'রে নিয়ত প্রবাহিত হয়।

মোচাগড়া
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

সাধন-সঙ্কেত

মেদিনীপুর নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"মনকে জোর করিয়া নামে বসাইবার অভ্যাস অর্জ্জন কর। অভ্যাস হইতেই সিদ্ধি সঞ্জাত হয়। প্রতিদিন একই সময়ে একই নাম সমান উৎসাহ সহকারে জপিতে জপিতে অন্তরের আনন্দ-উৎস আপনিই খুলিয়া যাইবে, জ্ঞানের বিমল জ্যোৎস্না তাহাতে পতিত হইবে এবং প্রেমের বন্যা বহিবে। নামে বিশ্বাস কর এবং প্রত্যেকটী নিশ্বাস-প্রশ্বাস নামের ক্রোড়ে সমর্পণ কর।

"নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে নামে আত্মনিবেদনই যথার্থ যজ্ঞ। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভাগবতী চেতনার সঞ্চারণা সাধনই যথার্থ আত্মাহুতি। নামের মধ্যে নিজেকে

বিলীন করিয়া দাও, আমিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাও, পরমাত্মার পরমকৃপাকেই চিরজাগ্রত করিয়া তোল।

"সর্ব্বদা যে শ্বাস-প্রশ্বাস টান ও ছাড়, তার মধ্যে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে, স্বভাবতঃই একটা বিরাম আছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপিতে জপিতে এই স্বাভাবিক বিরাম-মুহূর্ত্তের পরিমাণ আপনিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এই বিরাম-মুহূর্ত্তটুকুই প্রকৃত কুম্ভক এবং কুম্ভক-কালে স্বভাবতই মন ধীর, স্থির ও অচঞ্চল থাকে। মনের এই অচঞ্চল ধীর ভাবকে নিজের প্রত্যেক নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজিও। খুঁজিতে খুঁজিতে সর্ব্বজীবের চির-আকাঙ্ক্ষিত অমৃতত্ব একদিন হঠাৎ পাইয়া ফেলিবে।"

দাম্পত্য-প্রেম বজায় রাখিয়াই সংযম

মেদিনীপুর জেলার অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বিবাহিত জীবনে পরিমিত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিজ সহধর্ম্মিণীকে বিশদ উপদেশ প্রদান করিয়া তাহার মনকে সংযমের প্রতি অনুরক্ত ও তদ্বিষয়ে সুদৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ় করিতে হইবে। ইহা তোমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিয়াও এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা বজায় রাখিয়াও সম্পূর্ণরূপে ভোগ-লালসাহীন হইবার কৌশল শিখান তোমার এক গুরুতর কর্ত্তব্য। মনে লালসা বর্ত্তমান, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সেবা করিলে না, ইহা লালসাতুর সম্ভোগশীল ব্যক্তির অবস্থার চেয়ে ভাল অবস্থা। কিন্তু সম্ভোগ-লালসা উদ্দীপিত হইবার সহস্র কারণ বর্ত্তমান, স্ত্রীর মধ্যে বশ্যতা বর্ত্তমান, অফুরন্ত প্রীতি, বিনয়-বচন, মৃদুতা ও মধুরতা বর্ত্তমান, তবু অন্তরে এক কণা লালসার চিহ্নমাত্র থাকিবে না, এইরূপ শ্লাঘনীয় অবস্থা লাভ করিতে হইবে। একের প্রতি অপরের স্নেহ-কোমল ব্যবহার সম্পূর্ণ অটুট রহিবে, অথচ সংযমের ব্রতও অক্ষুন্ন থাকিবে, ইহাই দাম্পত্য-জীবনের পরম বাঞ্ছনীয় অবস্থা। এই অবস্থা লাভের জন্য যে সাধনা আবশ্যক, যে তপস্যা আবশ্যক, যে কৃচ্ছ্রবরণ আবশ্যক, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে।"

দাম্পত্য-জীবনে ইন্দ্রিয়-ব্যবহার

"দাম্পত্য-জীবন হইতে ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের প্রয়োজনকে কখনও নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নহে। যেখানে এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে, সেখানে জীবের সন্ন্যাস-জীবনের আরম্ভ। সন্ন্যাস-জীবনের সহিত দাম্পত্য-জীবনের বিবর্ত্তনগত পার্থক্য রহিয়াছে। অতএব দাম্পত্য জীবনের সহিত নরনারীর মৈথুন-মিলনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু মানব-মানবীর দাম্পত্য ব্যবহার প্রয়োজনের দাবীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিমাণের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাইতে পারে। এ জন্যই বিবাহের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত উভয়ের পক্ষে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য ব্রতাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কাহারও পক্ষে এক বৎসর, কাহারও পক্ষে তিন বৎসর, কাহারও পক্ষে দ্বাদশবর্ষকাল একত্রে অবস্থান পূর্ব্বক দৈহিক ও মানসিক ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা প্রয়োজনীয়। তোমরাও নিজ রুচির তীব্রতা বুঝিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতে পার।

সম্ভোগাস্বাদ-প্রাপ্ত দম্পতির সংযম-ব্রত গ্রহণ ও ব্রতচ্যুতির সম্ভাবনা

"যাহাদের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বেই অল্পবিস্তর দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণের পরেও দুই চারিবার উহা লঙ্ঘিত হইবার গুরুতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, মানুষ অভ্যাসের দাস এবং একবার ইন্দ্রিয়-পরিচালনার অভ্যাস সৃষ্ট হইয়া যাইবার পরে বিরুদ্ধ অভ্যাসকে অধিকরূপে দৃঢ় করিয়া লইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রথমার্জ্জিত অভ্যাসই বারংবার মানুষকে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিতে চাহে। সেই সময়ে নিদ্রিতা-বস্থাতেই মৈথুনাসক্ত হইয়া বা এক শয্যা হইতে অপর শয্যা পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে গমন করিয়া মৈথুনোদ্যমের প্রথম সময়ে চৈতন্য হয়,—'হায়! কি করিতেছি!' এজন্য, সম্ভোগাভ্যস্ত নরনারীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণের পরে কিছুকাল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দৈহিক দূরত্বটাকে একটু পাকা করিয়া লওয়া আবশ্যক। তারপরে একত্র অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন সহজতর হইয়া পড়ে।

"শুধু ব্রত গ্রহণ করিলেই হইবে না, ব্রতের প্রতি নিষ্ঠাকে অবিচলিত রাখিবার জন্য দিনের পর দিন এই ব্রতের অনুকূলে এবং ব্রতভঙ্গের প্রতিকূলে অভিমতকে দৃঢ় করিতে হয় ; সদ্গ্রন্থ, সৎপুরুষের উপদেশ এবং নিজ বিচারোত্থ মীমাংসাসমূহের আলোচনার দ্বারা ভিতরের শ্রদ্ধা বাড়াইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অটুট শ্রদ্ধাই অটুট ব্রহ্মচর্য্য লাভের পথ।

স্বামীর অন্যায় কামোদ্যমে সংযম-ব্রতাবদ্ধা স্ত্রীর আচরণ

"অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা পরিমিত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ বিষয়ে স্ত্রীদিগকে উপদেশ দিবার পরে পুরুষের অপরিসীম সম্ভোগ-ব্যাকুলতার মুহূর্ত্তেও স্ত্রী নিজ দৃঢ়তা হইতে বিচ্যুতা হইতেছে না। ইহা অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়-সংযমের ক্ষমতার পরিচায়ক সত্য, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতারই দৃষ্টান্ত। প্রাণান্তেও স্ত্রীজাতি নিজ ভোগ-লিপ্সার কথা মুখ ফুটিয়া পুরুষের নিকট নিবেদন করে না, ইহা তাহাদের এক সাধারণী প্রকৃতি। যে ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে সংযমের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় নিজেই সংযমচ্যুত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, সে ক্ষেত্রে নারী যদি পুরুষকে অবাধে তাহার অভিপ্রায় পূরণ করিতে দেয়, তবে কার্য্যশেষে অনুতাপ-কালীন পুরুষ অবশ্যই টের পাইয়া ফেলিবে যে, নারীর ভিতরেও নিশ্চিত কামভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল, নতুবা সে পুরুষের উদ্যমের বিরুদ্ধে বাধা-সৃষ্টি করিল না কেন? অনেকস্থলে এই অপবাদ-ভীতি বা কামুকী বলিয়া গৃহীতা হইবার লজ্জা নারীকে নিতান্ত অভিলষিত হইলেও কামক্রিয়া হইতে দূরে রাখে। সুতরাং শুধু বাধাদানে সমর্থাই নহে, স্ত্রীকে সত্যি সত্যি সম্ভোগ-লিপ্সা-বিহীনা করিবার জন্য স্বামীকে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতে হইবে। স্বামীর অন্যায় কামোদ্যমে সে যেন লজ্জার খাতিরে বা প্রতিজ্ঞার অনুরোধেই বাধা না দেয়, পরন্তু যেন নিজের অন্তরের তীব্র সংযম-প্রতিষ্ঠার বলেই পতনোন্মুখ স্বামীকে ব্রতপথে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়।

দাম্পত্য সংযম রক্ষার উপায়

"লিখিতেছে, আকুমার ব্রহ্মচর্য্যব্রতী সন্ন্যাসী, আর বিষয়টী হইতেছে, কামকলা। তোমাদের মত জীবন-গঠন-কামী ছেলেমেয়েরা যদি না জানিতে দিত, এত গুপ্ত রহস্য আমার জানিবার পথ ছিল না। তোমাদের কাছে যাহা জানিয়াছি, তাহাই পুনরায় তোমাদের হিতার্থে তোমাদিগকে জানাইতেছি। মনে রাখিও,—

"১। সুদৃঢ় সঙ্কল্প, বিরুদ্ধ অভ্যাস, ঐকান্তিক অনুরাগ এবং প্রয়োজনানুরূপ অবস্থানের দূরত্ব সৃষ্টি দ্বারা সম্ভোগ-লালসাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াই দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সম্যক্ উদ্‌যাপন সম্ভব হইবে।

"২। স্বামীর কামোদ্যমে স্ত্রীর বাধা প্রদান বা স্ত্রীর কামার্থিতায় স্বামীর উদাসীনতাই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণের চরম সহায় নহে; যাহাতে একের বাক্য, চিন্তা ও ব্যবহার অপরের বাক্য, চিন্তা ও ব্যবহারকে অসুন্দরতার অপবাদটুকু হইতে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য নিয়ত শ্বাসে ও প্রশ্বাসে নিত্য পবিত্রতা-স্বরূপ পরমাত্মার শুভপ্রদ নাম স্মরণ করা অত্যাবশ্যক।"

কর্ম্মফল খণ্ডনের উপায়

পত্রখানা লেখা মাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে গ্রামান্তর হইতে দুইটী যুবক সমাগত হইলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কর্ম্মফল কি খণ্ডন করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয় যায়!

প্রশ্ন।—কি ভাবে?

শ্রীশ্রীবাবা।—কিছু খণ্ডন হয় ভোগ ক'রে, কিছু খণ্ডন হয় কর্ম্মের দ্বারা। কর্ম্মের ফল কর্ম্ম দ্বারাই কাটাতে হয়।

প্রশ্ন।—যদি কর্ম্মেই কর্ম্মফল কাটে, তবে আবার ভোগ করার কথা বল্‌ছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—ভোগের জন্য তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল পুঞ্জীকৃত হ'য়ে রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলি ভোগের জন্য একেবারে আসন্ন, কোনো কর্ম্ম

দিয়েই তাদের ভোগ এড়ানো যায় না। কিন্তু যেগুলির ভোগ-কাল একটু দূরে, উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা তা তুমি অনায়াসে এড়াতে পার। অবশ্য জানবে, সকল কর্ম্মের সেরা হচ্ছে ভগবানের নাম করা।

অক্রোধ চিত্তই ভগবানের নিবাসভূমি

একটী মহিলাকে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন মেজাজ চাই, যেন কোনও অবস্থাতেই ক্রোধ না জন্মে। ক্রোধকে যে জয় করেছে, অন্যের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ যে পরিত্যাগ করেছে, তার প্রশান্ত চিত্তই শ্রীভগবানের পরমপ্রিয় নিবাস-ভূমি। যখন মনের মধ্যে ক্রোধ জন্মাবার মত কোন কারণ দেখ্‌তে পাবি, তখন ভাব্‌বি, তুই ভগবানের কোলে ব'সে আছিস, জগতের কোনো অত্যাচার, কোনো অপবাদ, কোনো মিথ্যা-প্রচার তোকে স্পর্শমাত্রও কত্তে পারে না।

কিছুই অজ্ঞেয় নহে

অপরাহ্নে ধামতী হইতে একজন সাধুপুরুষ গদাধর বাবুর বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বদাই তাঁর অর্দ্ধবাহ্য ভাব। বাহিরে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, আবার হঠাৎ মাঝে মাঝে কি যেন এক আনন্দময় ভাবে ডুবিয়া যাইতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, জগতের সব রহস্যই কি জানা যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তিনি জানালে সবই জানা যায়, এ জগতে কিছুই অজ্ঞেয় নয়।

অনিন্দিত মানুষ নাই

রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত গদাধর বাবু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠাত্মজ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীবাবার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ জগতে অনিন্দিত মানুষ নেই। এমন কোনো মানুষ, অতিমানুষ বা দেবমানুষ আজ পর্য্যন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন নি, যাঁকে কেউ নিন্দা করে নি। ভালই হও, আর মন্দই হও, নিন্দকের রসনা কিছুতেই বিশ্রাম নেবে না, বিশ্রাম সে ভালই বাসে না। দাতাই হও, আর চোরই হও, নিন্দকের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তোমাকে ছেড়ে দেবে না। এই

রকমই যখন দুনিয়ার হাল, তখন আর চোর হ'য়ে গাল খাওয়া কেন, সাধু হ'য়েই গাল খাওয়া উচিত।

সৎকাজ করিয়াই মরণ উচিত

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—এ জগতে এমন মানুষ নেই, যে মর্‌বে না। বহুদেশজয়ী সম্রাটই হও, আর পর্ণকুটীরবাসী ছিন্নকন্থাশায়ী ভিক্ষুকই হও, মৃত্যু কাউকে ছাড়্‌বে না। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই হও আর একেবারে নিরেট মূর্খ-ই হও, মৃত্যু সবারই আছে। মৃত্যু যখন অমোঘ, অব্যর্থ, অনতিক্রমনীয়, তখন যা-তা ক'রে ম'রে না গিয়ে কাজের মত কাজ ক'রে মরাই উচিত। মরণ যখন ধ্রুব, তখন মহদুদ্দেশ্যেই প্রাণত্যাগ কর্ত্তব্য।

মোচাগড়া
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

দুই নৌকাতে পা দেওয়ার বিপদ

একটী মহিলা দুইজন গুরুর নিকট ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—দুই নৌকায় পা দেওয়া বড় বিপজ্জনক রে বেটি, এমন বিপদে কি কখনো নিজে ইচ্ছা ক'রে ঝাঁপ দিতে আছে? একটার মধ্যে বিশ্বাস রাখ, একটার সেবায় তনুমন সব দিয়ে দাও, একটার স্রোতে ভেসে চল, তাতেই সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারণ হবে।

মহিলাটী বলিলেন,—দশ জনে মিলে নানা উপদেশ, পরামর্শ, যুক্তি দেখিয়ে আমাকে ফিরে একটা দীক্ষা নেওয়াল। আমি পরের ইচ্ছায় দীক্ষা নিলাম। যেখানে আমার প্রাণের তৃপ্তি, প্রাণ যেখানে দীক্ষা চায়, সেখানে কেউ যেতে দিলে না। করি কি? অগত্যা তাঁদের ইচ্ছারই অনুমোদন আমাকে কত্তে হল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষার মত বস্তু পরের ইচ্ছায় গ্রহণ কত্তে নেই। এই ব্যাপারে পরের বুদ্ধি গ্রহণ কত্তে নেই, নিজের প্রাণের বুদ্ধিকেই এ ব্যাপারে মান্‌তে হয়। তবে, একটা কথা হচ্ছে এই যে, পরের বুদ্ধিতে যা নিয়েছ,

তাত আর কোনো মন্দ বস্তু নয়! এতকাল তার সাধন ক'রে তোমার মঙ্গলই হয়েছে। তার প্রতি অনাদর, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন তুমি কত্তে পার না।

মহিলা।—তাহ'লে কি আমার কর্ত্তব্য দুইমন্ত্রই জপ করা, দুই দেবতার ধ্যান করা, দুই গুরুর পূজা করা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অগত্যা তাই। কিন্তু যাই দেখ্‌বে একটীতে রুচি বেড়ে যাচ্ছে, তখন অপরটী ছেড়ে এক নামেই ডুব দেবে। একটা লোক সমুদ্রের দুই জায়গায় ডুব্‌তে পারে না।

মহিলাটী বলিলেন,—আমি এই উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে বড় বিপন্ন হয়েছি, আপনি আমাকে কৃপা করে দীক্ষাদান ক'রে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আপনার কৃপা পেলে আমি দু'টীকেই ভুল্‌তে পার্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা হয় না মা। পূর্ব্ব-দীক্ষিতকে আমি দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক নই। কারণ, তাতে তার সংশয় আরো বেড়ে যেতে পারে।

অপর একটী মহিলা রহস্যচ্ছলে শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নিকটে দীক্ষিত কোনও ব্যক্তি যদি অপরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কত্তে যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাতে তারও মনের সংশয় বেড়ে যেতে পারে। এজন্য তার পক্ষেও এরূপ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনকই মনে করি। কিন্তু আমার কোনো শিষ্যের আমি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কত্তে ইচ্ছুক নই। কেউ যদি শ্রেষ্ঠতর পথ পায়, শ্রেষ্ঠতর আশ্রয় পায়, তবে তাকে সমগ্র প্রাণ দিয়ে আশীর্ব্বাদ কত্তে আমি কখনো কুণ্ঠিত নই।

দীক্ষা কোনও পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়

ভবানীপুর-নিবাসিনী জনৈকা মহিলা দীক্ষা-প্রার্থিনী হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য দীক্ষা তোমরা প্রার্থনা ক'রো না। আমি যাকে তাকে সাধন দেই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ করি না, আর্য্য-অনার্য্য বিচার করি না, হিন্দু কি ম্লেচ্ছ প্রশ্ন তুলি না, কিন্তু দীক্ষা কেন চাও, সেটির বিচার

করি। তোমার ধনবৃদ্ধি হোক্, প্রদরের ব্যারাম সেরে যাক্, পুত্রলাভ হোক্, এসব প্রার্থনার সঙ্গে দীক্ষাকে যুক্ত ক'রো না। দীক্ষার ফলে, দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনে একাগ্র মনে লেগে থাকার ফলে, জীবের প্রভূত পার্থিব কল্যাণ আপনি হয়, কিন্তু সে প্রার্থনা নিয়ে কারো কখনো দীক্ষার্থী হওয়া উচিত নয়।

দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নবজন্ম লাভ, পূর্ব্বসংস্কারের পাশ-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নবীন উদ্যমে পথ চলার শক্তি লাভ, দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে পাওয়া। তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাকে ভগবন্ময় ক'রে তোলা এবং সমগ্র দেহ-মনে ভগবানকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে তোমার দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য। এর চেয়ে এক চুল ছোটও যদি হয়, তবে সে উদ্দেশ্য নিয়েও তুমি গুরু-কৃপাপ্রার্থিনী হ'তে অধিকারিণী নও।

প্রত্যেক নারীই দেবী-প্রতিমা

শ্রীযুক্ত গদাধর বাবুর কন্যা শ্রীমতী গায়ত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেক নারী নিজেকে দেবী-প্রতিমা ব'লে মনে কর্ব্বেন, তবে তাঁর মধ্যে তাঁর সব অন্তর্নিহিত গুণাবলি ফুটে উঠবে। অফুরন্ত ধ্যানের দ্বারা প্রত্যেক রমণীরই খুঁজে বের করা কর্ত্তব্য যে, জগতে তাঁর কি করবার আছে, জগৎকে তাঁর কি দেবার আছে। তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত, তাঁরা নারী ব'লে হেয় নন, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর তাঁদেরই গর্ভে জন্মেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাম তাঁদের বুকের পীযূষ পান ক'রে জগতে অবতাররূপে পূজা পেয়ে গেলেন, জগৎকে দেবার মত, জগৎকে বিলাবার মত পরম ধন কিছু তাঁদেরও আছে। এই বিশ্বাসকে অন্তরে জাগ্রত কর যে পরমধন দেবার জন্যই তোমরা জগতে এসেছ, অন্তর খুঁজে বের কর কি দিতে এসেছ, তারপর সেই মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপূরণার্থ অবহেলে আত্মজীবন বলি দাও। তবে না জগৎ তোমাদিগকে সত্যি সত্যি দেবী-প্রতিমা ব'লে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়ে পূজা কর্ব্বে, অন্তরের কৃতজ্ঞতা-মাখান অভিনন্দন-মাল্য পুষ্পাঞ্জলির মত তোমাদের চরণে ঢালবে!

অহর্নিশ শ্রীভগবানের সাথে আলাপন

গদাধর বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে অনেক দূরের লোক ব'লে কেন মা মনে কত্তে যাও? তিনি যে তোমার কাছে কাছেই আছেন, সর্ব্বদা যে তোমার সাথে সাথেই থাকেন, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি নিয়ত তাঁর সাথে প্রাণের ভাষায় কথা কও, তিনি তোমার সাথে তাঁর প্রাণের ভাষায় কথা কন। একটু লক্ষ্য করলেই ত' তাঁর এই সুমধুর আলাপন তুমি শুন্‌তে পাবে। তবে কেন লক্ষ্য ক'রেই দেখ না মা? সুদীর্ঘ জীবন ভ'রে কত কথাই কয়েছ, আর কত লোকের কত অনাবশ্যক কথাই কাণ পেতে শুনেছ, এখন কাণ পেতে তাঁর কথা শোন, এখন প্রাণ খুলে তাঁকে কথা শুনাও।

(অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত)

উপসংহারে নিবেদন

লিমিটেড কোম্পানী চালাইবার কতকগুলি জটিলতা আছে। এজন্য "অখণ্ড-সংহিতার" নবম খণ্ড হইতে প্রকাশ সম্ভব হইবে কিনা, ইহা অনিশ্চিত রহিল। "স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেডের" যাহারা ছয় অংশের কম নিয়াছেন, তাঁহারা আরও তিনটী করিয়া অংশ গ্রহণ করিলে নবম হইতে ষোড়শ খণ্ড প্রকাশ অসম্ভব হইবেনা।

এই গ্রন্থ সম্পাদন কালে প্রতি খণ্ডেই তাড়াতাড়িতে এমন কিছু কিছু ছাপিয়াছি যাহা হয়ত পরবর্ত্তী সংস্করণে বাদ দিয়া দিব, কিম্বা ছোট হরফে ছাপাইয়া সাধারণ অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দিব। আবার ঠিক ছাপার মুহূর্ত্তে নানা স্থান হইতে এমন উপাদান আসিয়া জুটিয়াছে, সময়ের অসঙ্কুলানে যাহা প্রথম মুদ্রণে ছাপা হইল না। সম্ভব হইলে এই সব ত্রুটী দ্বিতীয় মুদ্রণে সংশোধিত হইবে।

এই মহাগ্রন্থের প্রত্যেকটী উপদেশ শ্রীশ্রীবাবার। সম্পাদক দ্বয়ের নিজস্ব কিছুই নাই। গ্রন্থের অধিকাংশ উপদেশই শ্রীশ্রীবাবার স্বরক্ষিত ডাইরি হইতে সংগৃহীত এবং অপরাপর অংশ তাঁহারই আদেশে গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীদের দ্বারা রক্ষিত এবং শ্রীশ্রীবাবা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘোষণা করিতেছি যে, এই মহাগ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের উপরে সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকার একমাত্র শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে এই বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের ত্রুটী এবং ভ্রম আছে। ইতি—সম্পাদক-দ্বয়।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র